মাসুদ রানা

ট্রেজার হাণ্টার

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনা

মাসুদ রানা ৪২১

ট্রেজার হান্টার

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

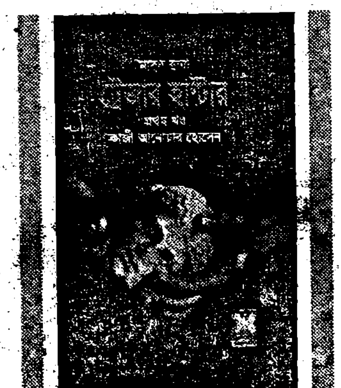

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7421-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৩

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-421
TREASURE HUNTER
Part-I
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

তিরাশি টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

ছেলেটির বয়স বারো; মেয়েটি ওর এক বছরের ছোট। সম্পর্কে দু'জনে খালাতো ভাই-বোন। হাত ধরাধরি করে অন্ধকার এক সুড়ঙ্গ ধরে হাঁটছে। আলো বলতে ছোট্ট একটা টর্চ, ছেলেটির হাতে—সেটার মৃদু আলোয় দেখা যাচ্ছে প্রাচীন এক টানেল নেটওয়ার্ক। মাটির নীচে জালের মত ছড়িয়ে রয়েছে সুড়ঙ্গগুলো, তারই একটাতে ঢুকেছে ওরা।

'অ্যাই,' হঠাৎ ভাইয়ের হাত চেপে ধরল কিশোরী, 'চলো ফিরে যাই। আমার আর ভাল্লাগছে না।'

'ভয় পাচ্ছ?' খেপানোর ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'যদি পথ হারাই?' কাঁপা গলায় বলল কিশোরী।

'অসম্ভব!' জোর গলায় বলল কিশোর। পকেট থেকে একটা চক বের করে দেয়ালে তীরচিহ্ন আঁকল। 'এই দেখো চিহ্ন দিয়ে দিলাম। পথ হারাবার ভয় নেই আর...'

কথা শেষ হবার আগেই মাথার উপর কিচকিচ আওয়াজ শোনা গেল। সেদিকে তাকিয়ে গোঙানির মত আওয়াজ বেরুল মেয়েটির গলা দিয়ে। গায়ের রোম খাড়া করে দেবার মত দৃশ্য—শত শত বাদুড় ছাত আঁকড়ে ধরে ঝুলছে উল্টো হয়ে। যতদূর চোখ যায়, কেবল বাদুড় আর বাদুড়, গোটা ছাত ঢেকে রেখেছে বীভৎস প্রাণীগুলো। ডানা ঝাপটানোর সাঁই সাঁই শব্দ

উঠল—আলো আর মানুষের আচমকা উপস্থিতি ঘাবড়ে দিয়েছে ওগুলোকে। ডানা ঝাপটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বাচ্চাদুটোর গায়ের উপর দিয়ে বয়ে গেল বাদুড়ের স্রোত। উন্মুক্ত চামড়ায় ঘষা খেল প্রাণীগুলোর রোমশ দেহ, নখের আঁচড় লাগল এখানে-সেখানে। বোটকা গন্ধে আটকে এল দম।

চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি। ছেলেটিও ভয় পাচ্ছে। রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তার। বোনের এক হাত চেপে ধরেই দিল দৌড়।

কতক্ষণ দৌড়াল ওরা, বলতে পারবে না। হঠাৎ খেয়াল করল, মাথার উপর ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ আর নেই। থেমে দাঁড়াল দু'জনে, হাঁপাচ্ছে। ধপ করে ওখানেই বসে পড়ল মেয়েটি। ইতস্তত করে ছেলেটাও বসল।

ভীষণ নীরব সুড়ঙ্গ। ভীতিকর। 'আ... আমি বাড়ি যাব!' ভয়ার্ত গলায় একসময় বলল কিশোরী।

'নিশ্চয়ই,' বলল তার ভাই। 'চলো।' কিন্তু গলায় আগের জোর নেই। বাদুড়ের ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে গিয়ে কোন্ দিক দিয়ে কোথায় চলে এসেছে, তা নিজেও জানে না। আশপাশে নজর বোলাল। কয়েকটা সুড়ঙ্গের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ডানদিকের একটা সুড়ঙ্গ থেকে আসছে আবছা আলোর আভা। কীসের আলো?

টর্চ নিভিয়ে দিল ও। হ্যাঁ, এবার পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—সত্যি সত্যি আলো জ্বলছে ওখানে। বোনের হাত ধরল ও, এগিয়ে চলল আলোর উৎসের দিকে। কাছাকাছি যেতেই শোনা গেল মানুষের গলা। ডাকতে গিয়েও ডাকল না ছেলেটি। সাহায্য চাইবার আগে মানুষটাকে দেখে নেয়া দরকার।

মিনিট পাঁচেক পরেই বড় একটা প্রকোষ্ঠের মুখে পৌঁছাল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াল। দুটো লণ্ঠন জ্বলছে প্রকোষ্ঠের

ভিতর। সেই আলোয় অচেনা দু'জন মানুষকে দেখতে পেল—এক কোনায় সাজিয়ে রাখা কতগুলো কাঠের ক্রেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকদুটোকে দেখামাত্র সতর্ক হবার প্রয়োজন অনুভব করল কিশোর, বোনকে টান দিয়ে নিয়ে এল বড় একটা পাথরের আড়ালে। ওখান থেকে উঁকি দিল... লোকদুটো কী করে দেখতে চায়।

'...একটা একটা করে বের করতে গেলে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে, লুসিয়ো,' কথা বলছে একজন। 'তারচেয়ে কয়েকজন লোক নিয়ে এসে সবগুলো একবারে বের করে নিয়ে গেলে হয় না?'

ঢাকনা খোলা একটা ক্রেটের উপর ঝুঁকে আছে লুসিয়ো নামের লোকটা। সঙ্গীর কথা শুনে মুখ তুলে বলল, 'এই জায়গার খবর যত কম লোকে জানে, ততই মঙ্গল। সময় লাগুক, আস্তে-ধীরেই নাহয় জিনিসগুলো বেচব, টিটো।'

ক্রেটের ভিতর থেকে প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট বের করল টিটো। ওটা এক ধরনের সাদা গুঁড়োয় ভরা। বলল, 'প্যাকিং ভাল হয়নি। বেশিদিন ফেলে রাখলে ড্যাম্প হয়ে যেতে পারে।'

'শুকিয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে,' আশ্বাস দিল লুসিয়ো। 'তা ছাড়া... জিনিস হাতে পেলেই খুশি হবে কাস্টোমার। কোয়ালিটি নিয়ে মাথা ঘামাবে না।'

ভাইকে খোঁচা দিল কিশোরী। ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী নিয়ে কথা বলছে ওরা?'

'ড্রাগস্!' রুদ্ধশ্বাসে বলল কিশোর। 'নিশ্চয়ই ওরা ড্রাগসের চোরাকারবারি। পুলিশের চোখ এড়াবার জন্য মাটির তলায় গুদাম বানিয়েছে!'

'সর্বনাশ! এখন তা হলে আমরা কী করব?'

'পালিয়ে যেতে হবে। ওরা আমাদেরকে দেখে ফেললে যেতে

দেবে না। এসো।'

পা টিপে টিপে প্রবেশপথের কাছে চলে গেল দু'জনে। বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে ঘটল বিপত্তি। মেঝেতে পড়ে থাকা নুড়িপাথরের উপর বেকায়দাভাবে পা পড়ল কিশোরীর, কাতরে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

ঝট্ করে মাথা ঘোরাল লুসিয়ো আর টিটো। দেখে ফেলল ওদের। টিটো চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই! থামো!'

কে শোনে তার কথা! বোনের হাত ধরে ছুট লাগাল কিশোর। কয়েক মুহূর্ত পরেই হৈ হৈ করে ওদেরকে তাড়া করে এল দুই দুর্বৃত্ত। একজনের হাতে শাবল, অন্যজন কোটের ভিতর থেকে বের করে এনেছে একটা পিস্তল। ট্রিগার চাপতেই বদ্ধ টানেলে কান ফাটানো আওয়াজ হলো। তবে তাড়াহুড়োয় নিশানা মিস করেছে সে। এক পাশের দেয়ালে মাথা কুটল ব্যর্থ বুলেট।

পাগলের মত ছুটছে দুই কিশোর-কিশোরী। টর্চ জ্বেলে ফেলেছে ইতিমধ্যে, ডানে-বাঁয়ে সুড়ঙ্গমুখ দেখলেই ঢুকে পড়ছে তাতে। পিছন পিছন ধাওয়া করছে দুর্বৃত্তরা। চলে যাচ্ছে অচেনা টানেল নেটওয়ার্কের গভীর থেকে গভীরতর অংশে।

ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এল পিছনের পদশব্দ আর হাঁকডাক। অল্পবয়েসী দুজনের সঙ্গে দৌড়ে পেরে ওঠেনি দুর্বৃত্তরা। ওদের আওয়াজ পুরোপুরি মিলিয়ে গেলে থামল কিশোর-কিশোরী। হাঁপিয়ে গেছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে দম ফিরে পাবার চেষ্টা করল। টর্চও নিভিয়ে দিল, যাতে আলো দেখে ওদেরকে খুঁজে না পায় লোকদুটো।

চোখে অন্ধকার সয়ে আসতেই ডানে তাকাল কিশোর। খোলা একটা সুড়ঙ্গমুখে হলদে আভা দেখতে পাচ্ছে। আলো নয়, অন্য কিছু। ভয় কেটে গিয়ে মনের ভিতর জেগে উঠল কৌতূহল। বোনের কাঁধে টোকা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ওই দেখো!'

'কী ওটা?' বিস্ময় ফুটল কিশোরীর কণ্ঠে।

'জানি না। চলো দেখি।'

সুড়ঙ্গমুখ পেরিয়ে ধীরে ধীরে এগোল ওরা। ঢালু হয়ে গেছে মেঝে। কিছুক্ষণ হাঁটার পরে মাঝারি আকারের একটা কামরায় পৌঁছুল। কামরার মাঝ দিয়ে গেছে একটা পাথরের তৈরি ফুটব্রিজ, তলায় হাঁ করে আছে অন্ধকার এক গর্ত। ব্রিজের ওপাশে রয়েছে চারকোনা একটা ওপেনিং, সেখান দিয়েই আসছে হলদে আভা।

আলো জ্বেলে ব্রিজ পেরুল কিশোর-কিশোরী। চওড়া একটা পাথুরে চাতালে বেরিয়ে এল। ব্যালকনির মত ওটা ঝুলে আছে অতিকায় এক গুহার উপর। ওখানে পা রেখেই চমকে উঠল ওরা। গুহাটা প্রাকৃতিক নয়... কিংবা প্রাকৃতিক হলেও মানুষের হাতের স্পর্শ পেয়েছে নিঃসন্দেহে। ভিতরটা এখন নিখুঁত কিউবের মত—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা সমান। বিস্ময়টা সেখানে নয়।

আসল বিস্ময় হলো, পুরো চেম্বারটা সোনায় গড়া! দেয়াল, ছাত, মেঝে—যেখানেই টর্চের আলো পড়ছে, সেখানেই ঝলমল করে উঠছে সোনালি রঙ। প্রতিফলিত হয়ে রাঙিয়ে তুলছে গোটা চেম্বারকে।

'ইয়াল্লা!' ফিসফিসিয়ে উঠল কিশোরী। তারপরেই চুপ হয়ে গেল।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে কেটে গেল দীর্ঘ কয়েক মিনিট। এরপর নড়ল কিশোর। বোনকে বলল, 'নীচে চলো। দেখি কী আছে এখানে।'

ব্যালকনির একপাশ দিয়ে নেমে গেছে পাথর কুঁদে বানানো সিঁড়ি। সেটা ধরে চেম্বারের তলায় নেমে এল দু'জন। পা রাখল সোনালি মেঝেতে। চেম্বারের ভিতরটা বেশ গরম, কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না—দেয়ালের কাছে, একটা অংশের মেঝে অদৃশ্য; সেখানে টগবগ করে ফুটছে মাটির নীচ থেকে উঠে আসা উষ্ণ পানি... ঠিক যেন একটা হট পুল। বাষ্প ভেসে বেড়াচ্ছে

বাতাসে।

টর্চের আলো ঘোরাল কিশোর। চেম্বারের ঠিক মাঝখানে, চারকোনা একটা ভিত বা পেডেস্টালের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটি কিশোরীর অপূর্ব সুন্দর মূর্তি—চেহারা এবং শরীরের সমস্ত খুঁটিনাটি আশ্চর্য রকমের নিখুঁত। কামরার মত মূর্তি আর পেডেস্টাল, দুটোই সোনায় গড়া। আরেকটা জিনিস আছে চেম্বারে—প্রাচীন এক সোনালি কফিন, গায়ে হরেক রকমের কারুকাজ। জিনিসটা রাখা হয়েছে উঁচু এক মঞ্চে। হট পুলের পাশ দিয়ে আরেকটা সিঁড়ি উঠে গেছে সেই মঞ্চে।

মূর্তিটার দিকে এগোল কিশোর-কিশোরী। চারপাশ থেকে ঘুরে-ফিরে দেখল। এতক্ষণে চোখে পড়ল একটা খুঁত। মূর্তিটার একটা হাত নেই—কবজির ইঞ্চিদু'য়েক উপর পর্যন্ত গায়েব। মনে হলো ভেঙে গেছে। আশপাশে চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল দু'জনে... কিন্তু না, মেঝেতে পড়ে নেই ভাঙা হাতটা।

কফিনটা দেখার জন্য পা বাড়াতে যাচ্ছিল ওরা, থমকে গেল দূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠ শুনে। আতঙ্ক ফুটল কিশোরীর চোখে। ভাইকে বলল, 'হায় হায়! আমাদের খোঁজ পেয়ে গেছে গুণ্ডাদুটো!'

তাড়াতাড়ি টর্চ নিভিয়ে দিল কিশোর। 'জলদি এসো। লুকাতে হবে আমাদের।'

বোনকে নিয়ে সিঁড়ির তলায় চলে গেল ও। লুকানোর জন্য আদর্শ জায়গা বলা যাবে না, কিন্তু এ-মুহূর্তে আর কোনও বিকল্পও নেই। ছায়ায় শরীর মিশিয়ে দিল দু'জনে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। তিন মিনিটের মাথায় ব্যালকনিতে উদয় হলো দুই দুর্বৃত্ত। ভিতরের দৃশ্য দেখে মুখের ভাষা হারাল ওরাও। মন্ত্রমুগ্ধের মত নেমে এল সিঁড়ি ধরে। দুই কিশোর-কিশোরীর কথা ভুলেই গেছে।

'মাই গড!' রুদ্ধশ্বাসে বলল টিটো। 'সোনা, লুসিয়ো! সোনা!'

'হ্যাঁ,' খুশি খুশি গলায় বলল লুসিয়ো। 'নিশ্চয়ই পুরনো আমলের কোনও রাজা-বাদশার সোনা! মূর্তি আর কফিনটা দেখেছ? বড়লোক হয়ে গেছি আমরা!'

ভুরু কোঁচকাল টিটো। 'সরকার আমাদেরকে এসব ভোগ করতে দেবে? আর্কিয়োলজিকাল ফাইণ্ডের ব্যাপারে কী সব যেন নিয়ম কানুন আছে বলে শুনেছি।'

'কে রিপোর্ট করতে যাচ্ছে? চুপচাপ সব বের করে নিয়ে যাব আমরা। কাউকে কিছু জানতে দেব না। কাউকে না!' লোভে চকচক করে উঠল লুসিয়োর চোখ।

'কীভাবে বের করবে? কী-ই বা বের করবে? মূর্তি আর কফিন ছাড়া তো আলগা সোনা কিছুই দেখছি না। দেয়াল, মেঝে আর ছাত ভাঙতে হবে। দু'জনের পক্ষে কি সেটা সম্ভব?'

'কথাটা ভুল বলোনি,' একমত হলো লুসিয়ো। 'চলো, কফিনটা খুলে দেখি। ওর ভিতর সোনার মোহর-টোহর বা গয়না পাওয়া যেতে পারে। আপাতত ওগুলোই নিয়ে যাব।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মঞ্চের দিকে পা বাড়াল টিটো। সে দু'কদম এগিয়ে যেতেই আচমকা নড়ে উঠল লুসিয়ো, হাতের শাবল ঘুরিয়ে সজোরে আঘাত হানল সঙ্গীর মাথার পিছনে। হাড় ভাঙার মড়মড় আওয়াজ হলো, ছিটকে উঠল রক্ত। অস্ফুট আর্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল টিটো। সোনালি মেঝে ভিজে যেতে শুরু করল তার রক্তে। কয়েক দফা কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল দেহটা।

'দুঃখিত, বন্ধু,' ক্রূর হাসি হেসে বলল লুসিয়ো, 'সোনা-দানায় ভাগীদার পছন্দ নয় আমার। তা ছাড়া আগেই তো বলেছি, গোপন খবর যত কম লোক জানে, ততই মঙ্গল।'

আঁতকে উঠল কিশোর-কিশোরী—চিৎকার করতে যাচ্ছিল,

কোনোমতে সামলাল নিজেদের। ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে দুজনেরই, এক্ষুণি ওদেরকে খুঁজতে আসবে লুসিয়ো। কিন্তু দেখা গেল সোনার নেশায় অন্ধ হয়ে গেছে সে, অন্য কোনোদিকে মনোযোগ নেই। চেম্বারের ভিতরে তল্লাশি চালানোর বদলে এগিয়ে গেল মঞ্চের দিকে। সিঁড়ি ধরে উঠে গেল উপরে। লোভে চকচক করছে দু'চোখ।

ঠেলে কফিনের ডালাটা সরাতে শুরু করল সে। বেশ ভারী ওটা, পুরোপুরি সরাবার ধৈর্য হলো না বোধহয়, কিছুটা ফাঁকা হতেই হাত ঢুকিয়ে দিল ভিতরে। হাতড়াতে শুরু করল সোনার খোঁজে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। এক ঝটকায় বের করে আনল হাত। বিস্ফারিত হয়ে গেল দৃষ্টি।

লাল হয়ে গেছে লুসিয়োর ডান হাতের উন্মুক্ত চামড়া... এমনকী তালুও! অসহ্য জ্বলুনি সেখানটায়। চুলকাতে গেল... কিন্তু জায়গাটা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বাম হাতের আঙুলের ডগাতেও শুরু হলো জ্বলুনি। আঙুলগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে। আতঙ্ক ফুটল তার চোখে। ইনফেকশনের মত ছড়িয়ে যাচ্ছে রঙটা—অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে। দুই হাত গ্রাস করল চোখের পলকে। এবার কাপড়ের তলায় বুকে-পিঠেও শুরু হয়েছে জ্বলুনি।

কাতরাতে কাতরাতে পিছাতে থাকল লুসিয়ো, খেয়াল করল না সিঁড়ির কাছে চলে গেছে। তাল হারাল আচমকা, পড়ে গেল সিঁড়িতে। গড়াতে গড়াতে চলে এল মেঝেতে, সেখান থেকে সোজা আছড়ে পড়ল গরম পানিতে ভরা পুলে। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল সে। ডুবে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই অবশ্য হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ভেসে উঠল, তবে সেটা ক্ষণিকের জন্য।

হতভম্ব চোখে তার দিকে তাকাল দুই কিশোর-কিশোরী। ফোস্কা পড়া অবস্থায় তাকে দেখবে বলে ভেবেছিল ওরা, কিন্তু

বাস্তবে তা হয়নি। দৃশ্যটা অকল্পনীয়—পানির উপরে উঠে থাকা হাতদুটো সোনায় পরিণত হয়েছে! গলার কাছ দিয়েও দ্রুত উঠে আসছে সোনালি রঙ... রক্তমাংসের শরীরটা সোনা হয়ে যাচ্ছে! লুসিয়োর আতঙ্কিত চেহারাটা আচমকা স্থির হয়ে গেল, যেন ক্যামেরায় তোলা ছবি। ওই অবস্থাতে ভারী পাথরের মত ফুটন্ত পানিতে ডুবে গেল সে। আর উঠল না।

অনেকক্ষণ পর সিঁড়ির তলা থেকে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল দুই কিশোর-কিশোরী। বাকশক্তি হারিয়েছে ওরা, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে শুরু করল। কীভাবে বাড়ি ফিরবে জানে না। বাতাসে ভেসে বেড়ানো বাষ্প জমতে শুরু করল সোনায় গড়া কিশোরীর মূর্তিটার মুখে, ফোঁটায় ফোঁটায় নামছে গাল বেয়ে। যেন কাঁদছে ওটা ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে!

দুই

আলতোভাবে ডিটোনেটরের বাটন স্পর্শ করল অ্যান্থনি গ্যারেট, তার পায়ের কাছে পড়ে আছে দু'জন মৃত সিকিউরিটি গার্ড। শেষবারের মত দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল—সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল তারা। সন্তুষ্ট হয়ে বাটনে চাপ দিল গ্যারেট, সঙ্গে সঙ্গে তিন মাইল দূরে পিকাডিলি সার্কাসে পার্ক করা একটা মার্সিডিজ গাড়ি বিস্ফোরিত হলো।

কতজন আহত বা নিহত হয়েছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাল না সে। রাত তিনটায় খুব বেশি ক্যাজুয়ালটির সম্ভাবনা নেই। সে শুধু

ায়, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে টেরোরিস্ট অ্যাটাক বলে ভাবুক। এ-ধরনের ঘটনায় লণ্ডন পুলিশের রেসপন্স সম্পর্কে জানা আছে তার, তল্লাটের সবগুলো ইউনিট পড়িমরি করে ছুটবে বিস্ফোরণের অকুস্থলে। ফলে অকশন হাউসের বিশাল স্টোরেজ ভল্ট খালি করতে পারবে সে নির্বিঘ্নে।

স্কি-মাস্কে মুখ ঢাকল গ্যারেট। পিণ্টো আর মাযিনিও একই কাজ করল ওর দেখাদেখি। ভল্টের ভিতরের ক্যামেরা অকেজো করবার মত বাড়তি সময় নেই ওদের হাতে। দরজা খোলামাত্র বেজে উঠবে সাইলেণ্ট অ্যালার্ম। পুলিশ আসতে হয়তো দেরি হবে, তবে খুব বেশি নয়।

নিরেট স্টিলে তৈরি দরজাটা খুলতে অ্যাক্সেস কার্ড এবং পাস কোড দরকার। কার্ডটা এ-মুহূর্তে গ্যারেটের হাতে—মৃত এক গার্ডের কাছ থেকে পেয়েছে। ইলেকট্রনিক লকের স্লটে ঢুকিয়ে দিল ওটা। কি-প্যাডের উপরে ছ'ইঞ্চি এলসিডি স্ক্রিন জ্যান্ত হয়ে উঠল, কোড চাইছে। সেটাও গ্যারেটের জানা। গতকাল কেউকেটা এক ক্লায়েণ্ট সেজে অকশন হাউসে এসেছিল সে, ভল্টের ভিতরটা তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখিয়েছে ম্যানেজার। ভিতরে ঢোকার সময় লোকটা যখন কোড টাইপ করছিল, কোটের বোতামে লুকানো অত্যাধুনিক একটা ক্যামেরার সাহায্যে ভিডিও করে নিয়েছে গ্যারেট। পরে সেটা জুম করে দেখে রপ্ত করে নিয়েছে কোড।

দ্রুত আটটা ডিজিট টাইপ করল সে। সবুজ একটা বাতি জ্বলে উঠল কি-প্যাডের উপরে। স্ক্রিনে লেখা উঠল: *অ্যাক্সেস গ্র্যাণ্টেড।* নেতার ইশারা পেয়ে হাতল ধরে টানল মাযিনি, ভোঁতা আওয়াজ তুলে খুলে গেল ভল্টের দরজা। দেরি করল না গ্যারেট, সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ল দরজা গলে। সিকিউরিটি ফার্মের হেডকোয়ার্টারে নিঃসন্দেহে বেজে উঠেছে সাইলেণ্ট অ্যালার্ম।

যতবার ভল্টের দরজা খোলা হয়, ততবারই সঙ্কেত পায় ওরা—হোক তা বৈধ বা অবৈধ উপায়ে। আর এ-মুহূর্তে ওরা যে সন্দিহান হয়ে উঠবে, তা নিশ্চিত। রাত তিনটায় তো ভল্ট খোলার কথা নয় কারও!

এরপর কী ঘটবে, আন্দাজ করল গ্যারেট। সিকিউরিটি গার্ডদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইবে ওরা। তাতে ব্যর্থ হলে খবর দেবে পুলিশে। কিন্তু ওদের সমস্যাটা হবে লো-প্রায়োরিটি। টেরোরিস্ট অ্যাটাকের সময় অন্য কোনও অপরাধ নিয়ে মাথা ঘামায় না পুলিশ। মুচকি হাসল গ্যারেট—সেটাই তো চাই!

ভল্টটা বেশি বড় নয়—পনেরো ফুট বাই পনেরো ফুট আকারের। স্থায়ীভাবে কিছু রাখা হয় না ভিতরে; শুধুমাত্র পরের দিনের নিলামে যে-জিনিসগুলো উঠবে, সেগুলোই এক রাতের জন্য ঠাঁই পায় এখানে। খোঁজখবর নিয়ে ভাল একটা দিন বেছেছে গ্যারেট—আজ ভল্টে শোভা পাচ্ছে নানা ধরনের অ্যান্টিক জুয়েলারি, দুর্লভ বইপত্র, প্রাচীন মুদ্রা ও ছোটবড় বিভিন্ন আকারের কয়েকটা ভাস্কর্য আর অয়েল পেইন্টিং। কাঁচের ডিসপ্লে কেইসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সব। বহু বছর ধরে ইংরেজ এক লর্ডের ম্যানরে পড়ে ছিল এগুলো; তিনি মারা যাওয়ায় পরিবারের সদস্যরা সবকিছু বিক্রি করে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, নিলামে ত্রিশ মিলিয়ন পাউণ্ড দাম উঠবে লর্ডের কালেকশনের। সেই টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবে তাঁর উত্তরাধিকারীরা।

কালেকশনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আইটেমটা শোভা পাচ্ছে ভল্টের কোনায়। নিখুঁত একটা হাত—কবজির দু'ইঞ্চি উপর থেকে আঙুলের নখ পর্যন্ত খাঁটি সোনায় গড়া। ভল্টের ভিতর জ্বলে ওঠা আলোয় ঝলমল করছে হাতটা। মুগ্ধ চোখে ওটার দিকে তাকাল গ্যারেট।

গায়ে-গতরে ছোটখাট হলেও প্রচণ্ড শক্তি ধরে মাযিনি, বেল্টের সঙ্গে ঝোলানো স্লেজহ্যামারটা তুলে নিল হাতে। 'শুরু করা যাক,' বলেই সজোরে আঘাত হানল ডিসপ্লে কেইসের গায়ে। এক বাড়িতেই চুরমার হয়ে গেল পুরু কাঁচের আবরণ। স্ট্যাণ্ডে সাজানো সোনার হাতটা বের করে নিল সে। বাবল র‍্যাপে পেঁচিয়ে ভরে ফেলল নিজের ব্যাগে।

পিন্টো একেবারে শুকনো-পটকা। হ্যামারের বদলে তাই সে নিয়ে এসেছে একটা ক্রো-বার। সেটার সাহায্যে আরেকটা ডিসপ্লে কেইস ভেঙে নিজের ব্যাগে অ্যান্টিক জুয়েলারি ভরতে শুরু করল সে। মাযিনি ব্যস্ত হয়ে পড়ল অন্যান্য ভাস্কর্য আর পেইন্টিং সরাবার কাজে।

ভল্টের পিছনদিকে চলে গেল গ্যারেট। ডিসপ্লে কেইস ভেঙে বের করে আনল প্রাচীন তিনটা পাণ্ডুলিপি, ঝটপট ঢুকিয়ে ফেলল নিজের ডাফল ব্যাগে। এরপর খালি করল পুরনো মুদ্রার কেইস।

মাত্র পাঁচ মিনিটে ভল্টের সমস্ত কালেকশন চলে এল তিন দুর্বৃত্তের ব্যাগে। এরপর পকেট থেকে সেলফোন বের করে নির্দিষ্ট একটা নাম্বারে ডায়াল করল গ্যারেট। একবার রিং হতেই রিসিভ করা হলো কলটা।

'বলো।'

'আমরা বেরুচ্ছি,' সংক্ষেপে জানাল গ্যারেট। তারপর কেটে দিল লাইন।

ভল্ট থেকে বেরিয়ে এল তিনজনে। গার্ডদের লাশ টপকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল এন্ট্রান্সের দিকে. পেভমেন্টে পা রাখল ত্রিশ সেকেণ্ড পর। দূরে সাইরেনের আওয়াজ শুনল ওরা, তবে অকশন হাউসের দিকে আসছে না, পিকাডিলি-র দিকে যাচ্ছে পুলিশের গাড়িগুলো । দূর থেকে হেডলাইটের আলো পড়ল ওদের গায়ে. কয়েক সেকেণ্ড পর ব্রেক কষে একটা ট্যাক্সি ক্যাব এসে থামল

ওদের পাশে। ড্রাইভারের নাম জেরি—মাথায় সাদা টুপি পরেছে, মুখে নকল গোঁফ-দাড়ি।

দরজা খুলে দ্রুত ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল তিন দুর্বৃত্ত। জেরি জিজ্ঞেস করল, 'আনতে পেরেছ সব?'

'অবশ্যই!' খুশি খুশি গলায় বলল পিন্টো। 'পুরো ত্রিশ মিলিয়ন পাউণ্ডের মাল।'

'ব্ল্যাক মার্কেটে ওয়ান-থার্ড দাম পাব,' মনে করিয়ে দিল মাযিনি। 'গ্যারেটের কাস্টোমার মাত্র দশ মিলিয়ন দেবে বলেছে।'

'তারপরেও... কম টাকা না,' বলল জেরি।

'ফালতু কথা বাড়িয়ো না,' অধৈর্য গলায় বলল গ্যারেট। 'বিপদ এখনও কাটেনি। মুভ!'

মাথা ঝাঁকিয়ে অ্যাকসেলারেটর চাপল জেরি। টায়ার পুড়িয়ে সবেগে সামনে বাড়ল ট্যাক্সি। লণ্ডন শহরের রাস্তাঘাটে সার্ভেইল্যান্স ক্যামেরার অভাব নেই, তাই স্কি-মাস্ক খুলল না কেউ। লুটের ঘটনার তদন্ত যখন শুরু হবে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড তখন সমস্ত ভিডিও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। ক্যামেরায় ওদের চেহারা ধরা পড়লে বড় ধরনের ঝামেলা দেখা দেবে।

আগে থেকেই এস্কেপ প্ল্যানের মহড়া দেয়া ছিল, তাই পাঁচ মিনিটের মাথায় টেমস নদীর নৌকাঘাটে পৌঁছে গেল ট্যাক্সি। কার পার্কে গাড়িটা ফেলে রেখে দ্রুত ডকে চলে গেল চারজনে, ভুয়া নামে ভাড়া করা একটা কেবিন ক্রুজারে চড়ে বসল। সারেং হিসেবে দক্ষ জেরি, ইঞ্জিন চালু করে কয়েক মিনিটের ভিতর সরে এল ডকের পাশ থেকে। টেমস নদীর মোহনার উদ্দেশে উদ্দাম বেগে ছুটল কেবিন ক্রুজার। ডোভার স্ট্রেইটে পৌঁছুনোর আগে আর থামবে না। জলপথে কেণ্ট পর্যন্ত যাবার পরিকল্পনা করেছে ওরা। ওখান থেকে গাড়ি ভাড়া করবে, তারপর ফেরিতে চেপে পাড়ি দেবে ইংলিশ চ্যানেল। চলে যাবে ফ্রান্সের ক্যালে-তে।

ক্রুজারের নেভিগেশনে রইল জেরি, বাকিরা চলে এল ফরোয়ার্ড কেবিনে। সবগুলো ব্যাগ খালি করে পরীক্ষা করতে বসল লুটের মাল। পিন্টো আর মাযিনি আনন্দে আটখানা হয়ে আছে, ক্রমাগত কথা বলে চলেছে ইটালিয়ান ভাষায়। ভাষাটায় ভাল দখল নেই গ্যারেটের, জাতে সে আমেরিকান; ওদের কথাবার্তার মধ্য থেকে শুধু *নাপোলি*... মানে নেপলস্ শহরের নামটা ধরতে পারল। তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই, ওখান থেকেই এসেছে ওর দুই ইটালিয়ান সহচর।

ওদেরকে অগ্রাহ্য করে ডাফল ব্যাগ থেকে পাণ্ডুলিপিগুলো বের করল গ্যারেট। এর মধ্যে একটা ওর কাজে লাগবে, অন্যদুটো ফাও। দরকারিটা কোলের উপর খুলে বসল। মনোযোগ দিয়ে উল্টাতে থাকল একের পর এক পাতা।

ক্রুজার ইংলিশ চ্যানেলে পৌঁছুনোর পর উঠে দাঁড়াল গ্যারেট। কেন্ট এখনও অনেক দূর, তবে তার নিজস্ব প্ল্যানের পরবর্তী অংশ কাজে পরিণত করবার সময় হয়ে গেছে। সবগুলো পাণ্ডুলিপি ব্যাগে ভরে ফেলেছে সে ইতিমধ্যে। সাবধানে, দুই সঙ্গীর চোখ ফাঁকি দিয়ে বের করে আনল নিজের পিস্তল—ওটার গুলিতেই অকশন হাউসের দুই গার্ডকে খুন করেছে।

'অ্যাই, গ্যারেট!' ডাকল পিন্টো। 'তোমার কণ্ট্যাক্টের সঙ্গে কখন দেখা করব আমরা? আমার যে আর তর সইছে না! টাকাটা তাড়াতাড়ি হাতে পেতে চাই। বুঝেছ?'

'অবশ্যই!' হাসিমুখে বলল গ্যারেট। 'তোমাদের পাওনা এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

পরমুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার হাতে। পিস্তল তুলেই নির্বিকার ভঙ্গিতে গুলি করল সে—প্রথমে পিন্টো... তারপর মাযিনিকে। হুড়মুড় করে কেবিনের মেঝেতে পড়ে গেল দু'জনের লাশ। লুটের মালের পাশে।

একটু অপেক্ষা করল গ্যারেট, কান পাতল জেরির তরফ থেকে প্রতিক্রিয়ার আশায়। কিন্তু শুনতে পেল না কিছু। বাতাস, ঢেউ আর ইঞ্জিনের গর্জনের তলায় চাপা পড়ে গেছে পিস্তলের আওয়াজ। ব্রিটিশ সারেং কিছুই টের পায়নি।

পিস্তলটা কোমরে গুঁজে হুইলহাউসে উঠে এল গ্যারেট। ওর পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফেরাল জেরি। বলল, 'হুইলটা একটু ধরবে? আমার ভাগটা একটু দেখে আসতে চাইছিলাম।'

'কোনও অসুবিধে নেই, যাও।' এক হাতে হুইল ধরে বলল গ্যারেট। জেরির পিঠ ওর দিকে ঘুরে যেতেই পিস্তল তুলে নির্দ্বিধায় ট্রিগার চাপল। পিঠে রক্তাক্ত দুটো ক্ষত নিয়ে হোঁচট খেলো জেরি, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সিঁড়ির ফাঁক গলে। ধুমধাম আওয়াজ তুলে নীচের ডেকে গিয়ে আছড়ে পড়ল তার প্রাণহীন দেহ।

ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে জিপিএস চেক করল গ্যারেট, তারপর হুইল ঘুরিয়ে হেডিং পাল্টাল। লেইসডন নামে উপকূলীয় একটা ছোট্ট শহরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কেবিন ক্রুজারকে। ওখানে ওর নিজের ভাড়া করা একটা গাড়ি লুকানো আছে। জেরি, পিন্টো বা মাযিনি জানত না ওটার কথা। কেন্ট হয়ে ফ্রান্সে যাবার ইচ্ছে আসলে কখনোই ছিল না গ্যারেটের, সঙ্গীদেরকে স্রেফ ধোঁকা দিয়েছে ভুয়া ওই পরিকল্পনার কথা বলে। তিনজনের কাউকেই বিশ্বাস করেনি সে।

তীরের মাইলতিনেক দূরে পৌঁছুনোর পর ইঞ্জিন বন্ধ করল গ্যারেট। পানি এখানে বেশ গভীর, ওর উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট। হুইলহাউস থেকে বিলো ডেকে নেমে এল ও। ওয়াটারলাইনের তলায় বসাল দুটো মাঝারি আকারের এক্সপ্লোসিভ চার্জ। ট্রিগার চাপলেই ক্রুজারের খোলে বিশাল দুটো ফুটো তৈরি হবে, চোখের পলকে জলযানটা ডুবে যাবে সাগরে।

খানিক পরে ফরোয়ার্ড কেবিনে ফিরল গ্যারেট। দুই ইটালিয়ানের লাশ সরিয়ে রাখল, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল লুটের মাল নিয়ে। ভাস্কর্য বা পেইন্টিঙে হাত দিল না, ওগুলো বেনামে বিক্রি করা কঠিন। নিজের ডাফল ব্যাগে ভরল শুধু অ্যান্টিক জুয়েলারি আর প্রাচীন মুদ্রাগুলো—ওগুলো গলিয়ে নিখাদ সোনা হিসেবে বেচতে পারবে সহজে। অলঙ্কারের গায়ে বসানো দামি পাথরগুলোও আলাদাভাবে বিক্রি করা যাবে। সব মিলিয়ে দু'মিলিয়ন পাউণ্ড আয় হবে বলে ধারণা ওর। ধার-দেনা মিটিয়েও তার সত্যিকার লক্ষ্য পূরণের জন্য যথেষ্ট টাকা থাকবে হাতে।

দুটো জিনিস শুধু বিক্রি করবে না গ্যারেট—সোনার হাত আর প্রাচীন পাণ্ডুলিপিটা। ওর সঙ্গীরা জানত না, কালেকশনের সবচেয়ে মূল্যবান আইটেম আসলে এ-দুটোই। ব্যাপারটা পরলোকগত লর্ডের পরিবারও নিঃসন্দেহে জানে না; জানলে কিছুতেই জিনিসদুটো নিলামে তুলবার চেষ্টা করত না।

এ-মুহূর্তে একমাত্র গ্যারেটই জানে সোনার হাত আর পাণ্ডুলিপির সত্যিকার তাৎপর্য। পাণ্ডুলিপিটা আসলে পুরনো আমলের একটা কোডেক্স... অর্থাৎ ডায়েরি। ওটা লেখা হয়েছে যিশুখ্রিস্টের জন্মের অন্তত দুই শ' বছর আগে; লিখেছেন সে-আমলের এক প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত। গ্রিসের সাইরাকিউজে তাঁর জন্ম, নাম আর্কিমিডিস!

প্রাচীন দুর্বোধ্য গ্রিক ভাষায় লেখা হয়েছে কোডেক্সটা, কেবিনে বসে তখন পড়তে গিয়ে টের পেয়েছে গ্যারেট—ওটার অর্থ উদ্ধার করা তার পক্ষে অসম্ভব। তবে প্রথম পাতায় লেখা একটা বাক্য পড়তে পেরেছ সে—লেখাটা আগেও কয়েক জায়গায় দেখেছে কিনা! আর ওই বাক্যটাই তার মনে বদ্ধমূল বিশ্বাস এনে দিয়েছে যে, সঠিক জিনিস হাতে পেয়েছে সে। আর্কিমিডিসের এই কোডেক্স তাকে সন্ধান দেবে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্যের।

ডাফল ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে আপার ডেকে চলে এল গ্যারেট। পানিতে নামাল ক্রুজারের ইনফ্লেটেবল লাইফ র‍্যাফট। বৈঠা চালিয়ে দ্রুত সরে গেল দূরে। তারপর, সে-রাতে দ্বিতীয়বারের মত ডিটোনেটরের বাটন চাপল সে। কান-ফাটানো আওয়াজের সঙ্গে আকাশের পটভূমিতে উঠে এল দুটো আগুনের গোলা। কয়েক মিনিট পরেই কাত হয়ে ডুবে যেতে থাকল ফেলে আসা কেবিন ক্রুজার।

তীরের দিকে বৈঠা চালাতে চালাতে আশ্চর্য এক পুলক অনুভব করল গ্যারেট। পরিকল্পনার সূচনা-পর্ব চমৎকারভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এবার মূল কাজে হাত দেবার পালা। ব্যর্থতার কোনও আশঙ্কা করছে না সে, কারণ তার হাতে রয়েছে গুপ্তধন উদ্ধারের চাবিকাঠি—আর্কিমিডিসের কোডেক্স।

প্রথম পাতায় সে-কথাই বলা হয়েছে। প্রাচীন গ্রিকে লেখা বাক্যটার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: *যার হাতে এই নকশা থাকবে, সে-ই পাবে মাইডাসের ঐশ্বর্য!*

তিন

রোজ সকালে টানা ছ'মাইল দৌড়ায় র‍্যাচেল হ্যাডলি। আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দৌড় শেষে একটা এনার্জি ড্রিঙ্কের বোতল কিনে ফিরে আসছে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। ঘামে চপচপ করছে পুরো শরীর। গ্রীষ্মকালের বিচ্ছিরি আর্দ্রতার জন্য ওয়াশিংটনের কুখ্যাতি আছে, তবে র‍্যাচেলের জন্য এই অভিজ্ঞতা নতুন।

এ-বছরই জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে গ্র্যাজুয়েট লেভেলে ভর্তি হয়েছে ও, এর আগে কখনও ওয়াশিংটনে আসেনি।

ডায়েট করে র‍্যাচেল, সকালে নাশতা খায় না। এনার্জি ড্রিঙ্কে চুমুক দিতে দিতে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে এসি চালু করল, টিভি অন করে সকালের খবর শুনল... তার ফাঁকে সেরে নিল স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ। ব্যায়াম শেষে নগ্ন দেহে ঢুকে পড়ল শাওয়ারে, হিমশীতল পানিতে ধুয়ে ফেলল সমস্ত অবসাদ। ঝরঝরে শরীর নিয়ে খানিক পর বেরিয়ে এল, ট্যাঙ্ক টপ আর শর্টস পরে বসে গেল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। হেয়ার ড্রায়ারে শুকাতে শুরু করল চুল। ক্লাসে যাবার জন্য বেরুতে হবে।

জামাকাপড় পরে পায়ে জুতো গলাচ্ছে, এমন সময় টোকা পড়ল সদর দরজায়। ঘড়ি দেখল র‍্যাচেল, ভুরু কোঁচকাল। সকাল সাড়ে সাতটা... এ-সময়ে কারও তো আসার কথা নয়। জুতো পরে দরজায় চলে গেল ও, চোখ রাখল পিপহোলে।

সুট পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে ওপাশে। বয়স চল্লিশের মত, একটু মোটাসোটা, লম্বায় র‍্যাচেলের চেয়ে দু'ইঞ্চির বেশি হবে না।

দরজা খুলল না র‍্যাচেল। গলা চড়িয়ে জানতে চাইল, 'কী চাই?'

'মিস হ্যাডলি, আমি ডিটেকটিভ কাটনার... আর্লিংটন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট,' জানাল লোকটা। 'জরুরি কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনার আইডেন্টিফিকেশন দেখতে পারি?' সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল র‍্যাচেল।

'নিশ্চয়ই।' কোটের ভিতর থেকে ওয়ালেট বের করল লোকটা। ভাঁজ খুলে পিপহোলের সামনে ধরল।

আর্লিংটন পিডি-র ব্যাজ আর আই.ডি. দেখতে পেল

র‍্যাচেল—ভুয়া বলে মনে হচ্ছে না। দরজা খুলল ও। চিন্তিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, অফিসার? কোনও সমস্যা?' সাতসকালে পুলিশ ওর কাছে কী চায়, ভেবে পাচ্ছে না। অন্যায় করা দূরের কথা, আজ পর্যন্ত একটা পার্কিং টিকেটও পায়নি ও।

'আপনার বোন... ড. রেমি হ্যাডলির ব্যাপারে এসেছি,' বলল কাটনার। 'ভিতরে আসি?'

'হ্যাঁ, প্লিজ। কী হয়েছে রেমির?' উৎকণ্ঠা অনুভব করছে র‍্যাচেল। কাল বিকেলেও কথা হয়েছে বোনের সঙ্গে, তখন পর্যন্ত সব ঠিক ছিল। পরে কি কিছু ঘটেছে?

দরজা পেরিয়ে র‍্যাচেলের দিকে ফিরল কাটনার। বলল, 'একটা দুঃসংবাদ আছে আপনার জন্য। বসুন একটু...'

'বসতে হবে না,' মুখ ঝামটা দিল র‍্যাচেল। 'কী হয়েছে জলদি বলুন।'

কাঁধ ঝাঁকাল কাটনার। 'আজ সকালে সিয়াটল থেকে ওয়াশিংটনে আসছিলেন ড. হ্যাডলি। পথে রোড অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। ট্রাকের সঙ্গে হেড-অন কলিশন।'

দম আটকে এল র‍্যাচেলের। 'মাই গড! রেমি! ও কি...'

'বেঁচে আছেন, তবে অবস্থা আশঙ্কাজনক। বেলভিউ হসপিটালে অস্ত্রোপচার হচ্ছে তাঁর। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আ... আমার পার্সটা নিয়ে আসি।'

ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে ফিরল র‍্যাচেল। অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল কাটনারের সঙ্গে। এলিভেটরে চেপে দু'জনে নেমে এল আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারাজে। জায়গাটা নির্জন, এখনও অফিসে যাবার জন্য ঘর থেকে বের হয়নি লোকজন। এলিভেটর থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কাটনার, হাত তুলে বিশেষ ভঙ্গিতে নাড়ল।

'দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন?' অধৈর্য গলায় জিজ্ঞেস করল র‍্যাচেল। 'আপনার গাড়ি কোথায়?'

'আমার পার্টনার এক্ষুণি নিয়ে আসবে,' আশ্বাস দিল কাটনার।

ইঞ্জিনের ভারী আওয়াজ শোনা গেল, সাদা রঙের একটা ভ্যান এগিয়ে এল ওদের দিকে। বিস্ময় ফুটল র‍্যাচেলের চোখে—পুলিশ ডিটেকটিভ ভ্যান নিয়ে আসবে কেন! তবে কি লোকটা আসলে পুলিশ নয়? কথাটা মুখ ফুটে বলার সুযোগ পেল না, তার আগেই হাতের পেশিতে সুচ ফোটার মত ব্যথা অনুভব করল। ঝট্ করে কাটনারের দিকে তাকাল ও, হাইপোডারমিক একটা সিরিঞ্জ শোভা পাচ্ছে তার হাতে।

'হোয়াট দ্য...'

মাথা ঘুরে উঠল র‍্যাচেলের, পায়ে কোনও শক্তি পাচ্ছে না, পড়ে যেতে শুরু করল। চট করে ওকে ধরে ফেলল কাটনার। ভ্যানটা পাশে এসে থামতেই সাইডডোর খুলে র‍্যাচেলকে তুলে ফেলল পিছনে। লাল ক্যাপ পরা এক যুবক বসে আছে ড্রাইভারের সিটে। তার উদ্দেশে বলল, 'কাজ হয়ে গেছে, বেনসন। চলো, যাওয়া যাক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্রেক রিলিজ করল বেনসন নামের যুবকটি। ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে এল আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যারাজ থেকে। রাস্তায় উঠে স্পিড বাড়িয়ে দিল।

পুরোপুরি অজ্ঞান হয়নি র‍্যাচেল, কিন্তু অবশ হয়ে গেছে শরীরটা। জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমরা? কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?'

'কয়েকদিনের জন্য আমাদের অতিথি হবে তুমি, ডিয়ার,' মুচকি হেসে বলল কাটনার। 'রিল্যাক্স। এনজয় দ্য ট্রিপ। রোহিপ্‌নল ইনজেক্ট করেছি তোমাকে—ওতে নেশা হবার কথা।'

রোহিপ্‌নল সম্পর্কে জানে র‍্যাচেল—ডেট-রেপ ড্রাগ। ডেটের

সময় অনিচ্ছুক মেয়েদেরকে অবশ বানিয়ে ধর্ষণ করবার জন্য এই ড্রাগ ব্যবহার করে মন্দ ছেলেরা। আতঙ্ক ফুটল র‍্যাচেলের চোখে, ওকে কি ধর্ষণ করতে চাইছে এরা?

ওর মনের কথা বোধহয় পড়তে পারল কাটনার। হাসিমুখে বলল, 'ভয় পেয়ো না। তোমার ব্যাপারে আমাদের কোনও আগ্রহ নেই। আগ্রহটা স্রেফ তোমার বোনের ব্যাপারে।'

'রেমি? কী করবে তোমরা ওকে নিয়ে?'

'নাথিং। ওকেই বরং একটা কাজ করে দিতে হবে আমাদের হয়ে। কাজটা যেন ঠিকমত করে, সেজন্যে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। ইউ সি... বোনকে সুস্থ দেহে উদ্ধার করাটাই হবে ওর জন্য সবচেয়ে বড় প্রেরণা। প্ল্যানটা ভাল না?'

জবাব দিতে পারল না র‍্যাচেল, চোখের পাতা ভারী হয়ে এসেছে ওর। তলিয়ে গেল অতল আঁধারে।

চার

ফোন ধরুন, মি. রানা... নইলে পস্তাবেন।

সেলফোনের ডিসপ্লে-তে ভেসে ওঠা এসএমএস-টার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মাসুদ রানা, বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাপারটা ঠাট্টা, নাকি সিরিয়াস কিছু। নতুন কোনও মার্কেটিং টেকনিকও হতে পারে—ইদানীং এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রচারণা চালাবার নানা রকম অভিনব কায়দা বের হয়েছে। এটাও হয়তো তেমনই কিছু। দশ মিনিট হলো সিয়াটল থেকে ব্রেমারটন-গামী

ফেরিতে উঠেছে ও, গাড়ি পার্ক করে উপরের ডেকে উঠে এসেছে পিউজেট প্রণালীর তাজা হাওয়া উপভোগ করবার জন্য... এরই মধ্যে তিনবার এসেছে ফোন। অচেনা নাম্বারের কল রিসিভ করে না রানা, আজও করেনি। খানিক পরেই এসেছে মেসেজটা। মানে কী?

নানা দিক ভেবে বার্তাটা অগ্রাহ্য করবার সিদ্ধান্ত নিল ও। ছুটি কাটাতে এসেছে আমেরিকায়, সিয়াটলে রানা এজেন্সির গেস্ট-হাউসে উঠেছে ওখানকার শাখার বাৎসরিক পরিদর্শন সেরে নেবে বলে। এ ছাড়া হাতে এমন কোনও কাজ নেই যেটায় জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দিতে পারে। অপ্রত্যাশিত কোনও কারণে যদি ওর ডাক পড়েও, সেটা জানাবার জন্য পরিচিত লোকেরা ফোন করবে—ওদের নম্বর সেভ করা আছে ফোনবুকে। রিং দিলেই স্ক্রিনে ভেসে উঠবে নাম। এই লোক তাদের কেউ নয়। এ-মুহূর্তে রানা সিয়াটল থেকে ব্রেমারটনে যাচ্ছে নুমার একটা নতুন বিল্ডিঙের কনস্ট্রাকশন দেখবার জন্য। বন্ধু ববি মুরল্যাণ্ড প্রজেক্টটার দেখাশোনা করছে, ওখানেই রানার অপেক্ষায় রয়েছে সে। কনস্ট্রাকশনের কাজ দেখবার পর দু'জনে একসঙ্গে লাঞ্চ করবে বলে ঠিক করেছে। ওখানকার কোনও ব্যাপার হলে মুরল্যাণ্ডই ফোন করত।

পকেটে সেলফোনটা ঢোকাতে গেল রানা, আর তখুনি মৃদু ভাইব্রেশনের সঙ্গে চতুর্থবারের মত বাজল ওটা। আবার সেই অচেনা নাম্বার। বিরক্ত ভঙ্গিতে কলটা রিজেক্ট করল ও। ভারি যন্ত্রণা তো! কে এভাবে জ্বালাতন করছে বার বার? মুরল্যাণ্ড নাকি? প্র্যাকটিকাল জোক করবার অভ্যেস আছে তার, হয়তো অচেনা কোনও নাম্বার জোগাড় করে খোঁচাচ্ছে ওকে।

নিশ্চিত হবার জন্য মুরল্যাণ্ডের নাম্বারে ডায়াল করল রানা। কয়েক মুহূর্ত পরেই শুনল বন্ধুর কৌতুক-মাখা গলা।

'কী হে, দোস্ত... রওনা কি দিয়েছ, নাকি এখনও বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছ কোনও সুন্দরীকে কোলবালিশ বানিয়ে?'

'কোলবালিশ ব্যবহার করি না আমি,' কাঠখোট্টা গলায় বলল রানা। 'ঘুমাচ্ছিও না। ফেরিতে উঠেছি। এ-খবর জানার জন্যই বুঝি ফোন করছ বার বার?'

'আমি আবার কখন ফোন করলাম? সকাল থেকে তো সাইটের নকশায় নাক ডুবিয়ে বসে আছি! ফোরম্যানটা একটা গাড়ল... যেখানে কাঁচের পার্টিশান হবার কথা, সেখানে ইঁটের দেয়াল তুলে ফেলেছে। নকশার দিকে একবারও যদি তাকাত...'

'সত্যি বলছ? তুমি ফোন করোনি?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'কীসের ফোন? ব্রেকফাস্ট পর্যন্ত করিনি! তাড়াতাড়ি এসো তো। খিদেয় পেটের ভিতর ছুঁচো নাচছে। তুমি এলেই লাঞ্চে যাব।'

'এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাচ্ছি।'

লাইন কেটে দিয়ে সিয়াটলের বিলীয়মান স্কাইলাইনের দিকে তাকাল রানা। জুন মাসের মাঝামাঝি, ঘড়িতে বেলা এগারোটা, অথচ এখনও সূর্যের দেখা নেই। কালো মেঘ আর গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে বিষণ্ন রূপ নিয়েছে প্রকৃতি। এটাই সিয়াটলের স্বাভাবিক আবহাওয়া। জুলাই মাসের আগ পর্যন্ত নিয়মিত ঝড়বাদল হবে, সূর্য মুখ দেখাতে পারবে না ঠিকমত।

অচেনা নাম্বারটার কথা ভাবল রানা। মুরল্যাণ্ড নয়, তা হলে কে? এসএমএস-এ ওকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়েছে, তার মানে লোকটা জেনেশুনেই কল করছে ওকে। উল্টোপাল্টা নাম্বারে ডায়াল করে বসেনি। সবচেয়ে বড় কথা, রানার ব্যক্তিগত নাম্বার খুব বেশি লোকে জানে না। নিঃসন্দেহে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ওটা জোগাড় করেছে লোকটা। কেন? পাল্টা রিং দেবে কি না

ভাবতে ভাবতেই টুং টাং জলতরঙ্গের আওয়াজ হলো ফোনে। নতুন এসএমএস।

মি. রানা, এক্ষুণি যদি আমার কল রিসিভ না করেন, আটাশ মিনিটের ভিতর আপনি-সহ ফেরির প্রতিটা মানুষ মারা পড়বে!

স্থির হয়ে গেল রানা। ও যে ফেরিতে উঠেছে, তা এই লোকটা জানে! কীভাবে? দেখতে পাচ্ছে ওকে? তা হলে কি লোকটাও এই ফেরিতেই উঠেছে? রেলিঙের পাশ থেকে সরে এসে উল্টো ঘুরল ও। চোখ বোলাল আশপাশের সমস্ত প্যাসেঞ্জারের উপর। কিন্তু কাউকে ওর প্রতি আগ্রহী বলে মনে হলো না।

আবার বাজল ফোন। একই নাম্বার।

অ্যান্সার বাটন টিপে সেটটা কানে ঠেকাল রানা। রুক্ষ গলায় বলল, 'কে তুমি? কেন বিরক্ত করছ আমাকে?'

'আমার পরিচয় নিয়ে আপাতত আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না, মি. রানা,' কর্কশ একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'কিন্তু জেনে রাখুন, আপনি যদি আমার কথামত কাজ না করেন, ওই ফেরি থেকে জীবন নিয়ে নামতে পারবে না কেউ।'

আঞ্চলিক কোনও টান নেই লোকটার গলায়। শুদ্ধ ইংরেজিতে পরিষ্কার ভাবে কথা বলছে। খারাপ লক্ষণ। তাও একটু বাজিয়ে দেখবে বলে ঠিক করল রানা। হালকা গলায় বলল, 'হুমকিটা যদি সত্যি হয়, তা হলে তো পুলিশে খবর দেয়া দরকার। ওদের লাঠির বাড়ি খেয়েছ কখনও? মাথা থেকে পাগলামি দূর করবার মহৌষধ ওটা!'

হাসল লোকটা। 'স্বীকার করছি, আপনি রসিক লোক।'

'রসিকতা না, সত্যি সত্যি পুলিশে রিপোর্ট করব বলে ভাবছি।'

'কী রিপোর্ট করবেন? আমার নাম্বার? এটা একটা প্রি-পেইড ডিসপোজেবল ফোন, মি. রানা। কিনেছি নগদ টাকা দিয়ে,

কোনও পেপার ট্রেইল নেই। এই নাম্বার দিয়ে আমাকে ট্র্যাক করা অসম্ভব, বিলিভ মি!'

বোঝা গেল, লোকটা অ্যামেচার নয়। অগত্যা শ্রাগ করে রানা বলল, 'বেশ, শোনা যাক, কী চাও তুমি?'

'আপনাকে, মি. রানা! আপনাকেই চাই আমার। বাই দ্য ওয়ে, বার বার *মিস্টার* বলতে ভাল লাগছে না। তোমাকে নাম ধরে ডাকলে অসুবিধে আছে?'

'যা খুশি ডাকো। পাগলামিটা বন্ধ হলেই আমি খুশি।'

'পাগলামি করছি না, রানা। আ'য়্যাম ড্যাম সিরিয়াস। এক্ষুণি সেটা টের পাবে।'

সতর্ক হয়ে উঠল রানা। 'কী টের পাব?'

'তোমার ই-মেইল চেক করো। আমি দুটো ছবি পাঠিয়েছি। তারপর আবার কথা হবে।'

সেলফোনের ইন্টারনেট ব্রাউজার অন করল রানা। লগ অন করল নিজের ই-মেইল অ্যাকাউন্টে। অচেনা এক অ্যাড্রেস থেকে এসেছে দুটো ছবি। ওপেন করল ওগুলো।

প্রথমটায় পার্ক করা একটা নীল রঙের ট্রাক দেখা গেল—আকারে বেশি বড় নয়... মাঝারি সাইজের একটা কাভার্ড ভ্যান ওটা... গায়ে *সিলভারলেক ট্রান্সপোর্ট* লেখা। পরের ছবিটা তোলা হয়েছে ট্রাকের পিছনের দরজা খুলে। ডালা খোলা অবস্থায় একটা রিফ্রিজারেটর দেখা যাচ্ছে—তাতে রয়েছে পিপের আকৃতির স্বচ্ছ এক প্লাস্টিক কন্টেইনার, ভিতরটা ধূসর রঙের পাউডারে ভরা। কন্টেইনারের গায়ে লাগানো আছে একটা ডিজিটাল টাইমার, আর উপরে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে কী যেন।

প্রণালীর শান্ত পানি কেটে তরতর করে এগোচ্ছে ফেরি, কোনও দুলুনি নেই; তারপরেও পেটের ভিতরটা পাক দিয়ে উঠল

রানার—যেন সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হয়েছে।

ফোন আসার অপেক্ষায় আর থাকল না ও, নিজেই কল করল অচেনা লোকটাকে। শীতল কণ্ঠে জানতে চাইল, 'এসবের মানে কী?'

'মানেটা নিশ্চয়ই তুমি ধরতে পেরেছ, রানা,' বলল লোকটা। 'সেজন্যেই নিজে কল করেছ আমাকে। তারপরেও যদি সন্দেহ থাকে তো ক্লিয়ার করে দিচ্ছি—হ্যাঁ, ওটা একটা বোমা। বোমাসহ ট্রাকটা রাখা হয়েছে ফেরির ভেহিক্‌ল ডেকে। খবরদার, কাউকে সতর্ক করতে যেয়ো না। কিছু করতে গেলেই আমি টের পাব।'

দমে গেল রানা। কণ্ঠ যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, 'আমার ধারণা, বেহুদা ধাপ্পা দিচ্ছ তুমি। ফেরিতে অত বড় বোমা তোলা সম্ভব নয় কারও পক্ষে, নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে।'

'তা-ই? বাইনারি এক্সপ্লোসিভ সম্পর্কে কিছু জানো না তুমি, রানা?'

'জানলে কী?'

'অর্থাৎ, জানো। যথেষ্ট যাচাই-বাছাইয়ের পরই তোমাকে এই কাজের জন্য মনোনীত করেছি আমি। মাসুদ রানা... বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন মেজর, বর্তমানে স্বনামধন্য একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, নুমার অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর, শৌখিন আর্কিয়োলজিস্ট ও ট্রেজার হাণ্টার... সেইসঙ্গে বোমা বিশেষজ্ঞ তো বটেই! বুঝতেই পারছ, তোমার সম্পর্কে সবই জানা আছে আমার। কথা বাড়িয়ো না। বাইনারি এক্সপ্লোসিভ সম্পর্কে জানো তুমি, তাই না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। বাইনারি এক্সপ্লোসিভ হলো নির্দোষ দুটো কেমিক্যালের মিশ্রণ। এমনিতে কেমিক্যালদুটো নিরাপদ, কিন্তু মেশানো হলে অতিমাত্রায় বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে ওঠে। সাধারণত শুটিং ক্লাবের টার্গেট প্র্যাকটিসে এ-ধরনের এক্সপ্লোসিভ

ব্যবহার করা হয়। হাই পাওয়ারের রাইফেল রাউণ্ড বা ডিটোনেটরের সাহায্যে ফাটাতে হয় জিনিসটা। কেমিক্যালগুলো সহজেই কিনতে পাওয়া যায়।

'দেখলে?' রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল লোকটা, 'সবই জানো তুমি। এখন শোনো, ফ্রিজের ভিতরে একশো পাউণ্ড বাইনারি এক্সপ্লোসিভ রেখেছি আমি। ফেরির খোলে ত্রিশ ফুট ডায়ামিটারের একটা গর্ত তৈরি করবার জন্য যথেষ্ট। ওটা ফাটিয়ে দিলে আগুন ধরে যাবে পুরো কাঠামোয়। মনে হয় না খুব বেশি সার্ভাইভার পাওয়া যাবে।'

'সিয়াটল ডকে পুলিশের ট্রেইণ্ড কুকুর ছিল। ওরা তোমার এক্সপ্লোসিভের গন্ধ পায়নি কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কারণ আমি অত্যন্ত সতর্ক মানুষ, রানা। কণ্টেইনারটা এয়ারটাইট—গন্ধ বেরুবার উপায় নেই। তা ছাড়া বেকার এক ছোকরাকে তিনশো ডলার দিয়েছি ট্রাকটা ড্রাইভ করে ফেরিতে ওঠানোর জন্য। অর্থনৈতিক মন্দার সময় অতগুলো টাকা পেয়ে বেশ উপকারই হয়েছে ওর, ছোকরা কোনও প্রশ্ন করেনি। হাহ্ হাহ্ হাহ্!'

'বোমা ফাটিয়ে ফেরিটা যদি উড়িয়েই দিতে চাও, আমাকে ফোন করেছ কেন?'

'খানিক পরেই জানতে পারবে সব। আর কথা নয়। ট্রাকের কাছে চলে যাও তুমি। দরজায় তালা দেয়া আছে, তবে চাবিটা পিছনের বাম চাকার ভিতরদিকে টেপ দিয়ে আটকানো অবস্থায় পাবে। তাড়াতাড়ি যাও! নইলে ওই ফেরি কোনোদিন ব্রেমারটনে পৌঁছুবে না।'

ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে রানার মাথায়—কী করাতে চাইছে লোকটা ওকে দিয়ে? হঠাৎ মনে পড়ল, ব্রেমারটনে মার্কিন নৌবাহিনীর একটা ঘাঁটি আছে। তবে কি ট্রাকটা ওখানে পাঠাতে

চাইছে? ওকে বাছাই করা হয়েছে গাড়ি-বোমার চালক হিসেবে?

'আমাকে যদি সুইসাইড বম্বার বানাবার প্ল্যান করে থাকো, তা হলে মস্ত ভুল করছ,' শান্ত গলায় বলল ও।

'সুইসাইড বম্বার?' হাসল লোকটা। 'উঁহুঁ, ভুল ভাবছ তুমি।'

'তা হলে?'

'আমি তোমাকে হিরো বনবার সুযোগ দিচ্ছি, রানা। চব্বিশ মিনিট পর ফাটবে বোমাটা। আমি চাই... তার আগেই তুমি ওটাকে ডিজআর্ম করো।'

পাঁচ

কেউকেটা বললে কম বলা হয়, আসলে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন নিঃসন্দেহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। সত্তরের কাছাকাছি বয়স, কিন্তু প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর দুর্ধর্ষ কাউবয়ের মত চেহারা তাঁর। ঝাড়া ছয় ফুট লম্বা, ক্লিনশেভড়, দু'চোখে ক্ষুরধার বুদ্ধির ঝিলিক, চলাফেরায় ঋজু ভঙ্গি, গম্ভীর, তীক্ষ্ণ এক ব্যক্তিত্ব। ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি, সংক্ষেপে নুমা একটি আধা-সরকারি সামুদ্রিক গবেষণা সংস্থা, শুরু থেকেই তিনি এই সংস্থার চিফ। সবাই জানে, সিসমোলজিকাল এক্সপেরিমেন্ট আর ওশনোগ্রাফি নিয়ে গবেষণা করে নুমা। কিন্তু সংস্থাটি যে আসলে গোপনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করে যাচ্ছে তা কেউ জানে না, কারও

জানার কথাও নয়। এই সংস্থার সমস্ত তৎপরতা সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হয়, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন একমাত্র প্রেসিডেন্টকেই এই সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে রিপোর্ট করেন। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত গভীর বন্ধুত্ব রয়েছে দু'জনের মধ্যে। এ-কারণে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন ইস্যুতে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, অ্যাডমিরালকে দেখে এমন ক্ষমতাবান মানুষ বলে মনে হয় না। সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছুনোর পরেও তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করেন। ক্ষমতা জাহির করবার বিন্দুমাত্র প্রবণতা নেই তাঁর মাঝে। প্রাণখোলা স্বভাবের মানুষ, সহজেই যে-কাউকে আপন করে নিতে পারেন। কিন্তু প্রয়োজনে যথেষ্ট নির্মমও হতে জানেন তিনি। এমন কাউকে টার্গেট বানাবার চিন্তা শুধু পাগল বা জিনিয়াসের মাথায় আসতে পারে। ওদের বস যে কোন্‌টা, তা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি ডেরিক বেনসন।

এ-মুহূর্তে ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে... টাইসনস্‌ কর্নার, ভার্জিনিয়ায়... হোটেল শেরাটন প্রিমিয়ারের লবিতে এলিভেটরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে সে, চোখ বোলাচ্ছে চারপাশে। পেন্টাগনের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক একটা সেমিনার শুরু হয়েছে হোটেলে, তবে সে-উপলক্ষে নিরাপত্তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়নি দেখে স্বস্তি অনুভব করল। বোধহয় কেউ ভাবতেই পারছে না, সামরিক লোকজনে ভরা এমন একটা পরিবেশে কোনও ধরনের অপরাধ ঘটতে পারে। তাতে সুবিধাই বেনসনের। কাজের প্রস্তুতি হিসেবে গত সপ্তাহে একবার জায়গাটা রেকি করে গেছে সে, সেই অনুসারে সাজিয়েছে গোটা পরিকল্পনা। এখন তাতে বড় ধরনের রদবদল করতে হলে ঝামেলা হয়ে যেত।

সেলফোন তুলে কাটনারের সঙ্গে যোগাযোগ করল সে।

'সবকিছু ঠিকঠাক আছে। প্ল্যান মোতাবেক এগোনো যাবে।'

'গুড,' সংক্ষেপে বলল কাটনার। তারপর লাইন কেটে দিল।

আর্মির দু'জন মেজরকে এগিয়ে আসতে দেখল বেনসন, ওদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মৃদু মাথা ঝোঁকাল সে। ওরাও একই ভঙ্গিতে প্রত্যুত্তর দিল। হোটেলের ভিতরে টুপি খোলা অবস্থায় রয়েছে সবাই, কাজেই হাত তুলে স্যালিউট না দিলেও চলে। পুরোদস্তুর আর্মি ইউনিফর্ম পরে আছে বেনসন, কাঁধে ক্যাপ্টেনের র‍্যাঙ্ক, নেমট্যাগে ভুয়া নাম—স্কট। ইউনিফর্ম, ব্যাজ আর বুকের রিবনগুলো আর্মি সারপ্লাস স্টোর থেকে কেনা হয়েছে। কোনোটাই নকল নয়।

কুশল বিনিময়ের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হলো বেনসন। গল্প সাজানোই আছে—উইভার সলিউশন্স নামের একটা বেসরকারি কোম্পানির মিলিটারি লিয়াজোঁ সে; এমন একটা কোম্পানি সত্যি সত্যিই আছে, ইউ.এস. আর্মির বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ করে ওরা। সেমিনারে এসেছে ওদেরকে মিলিটারির নিত্যনতুন চাহিদার সঙ্গে পরিচিত করে দেবার জন্য। বলা বাহুল্য, গল্পটায় খুঁত নেই কোনও। ওয়াশিংটনে এ-ধরনের সেমিনার প্রায় প্রতি সপ্তাহেই হচ্ছে, তাতে সিভিল কণ্ট্রাক্টররা নিয়মিত অংশ নেয়। ব্যাপারটা এমনই ডাল-ভাত হয়ে গেছে যে, সিকিউরিটি নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। আমন্ত্রণপত্র বা ক্লিয়ারেন্সেরও বালাই নেই।

দুই মেজর অবশ্য বেনসনের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাল না। নিজেদের মধ্যে আলাপে ব্যস্ত তারা, এলিভেটরের দরজা খুলে গেলে কথা বলতে বলতেই উঠল তাতে। ওদের পিছু নিয়ে বেনসনও চড়ল এলিভেটরে। প্রথম স্টপেজে দরজা খুলতেই দেখা গেল মানুষের ভিড়। এগারোটা বেজে গেছে, তারমানে শেষ হয়েছে সেমিনারের মর্নিং সেশন... সেইসঙ্গে তার টার্গেটের কি-নোট স্পিচ। হলরুম থেকে সবাই এখন বেরিয়ে এসেছে

লাঞ্চে যাবার জন্য।

দুই মেজর নেমে গেল, তাদের জায়গায় উঠল দু'জন সিভিলিয়ান। একজন শ্বেতাঙ্গ, অন্যজন নিগ্রো। শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক মাঝবয়েসী, পরনে টিপটপ সুট। বুকের ভিজিটরস্ আই.ডি.-তে নাম লেখা—জর্জ রেডক্লিফ। নিগ্রো যুবকের চেহারা-সুরত ঠিক তাঁর বিপরীত। সুট পরার ঝামেলায় যায়নি, জিন্স আর টি-শার্ট পরে এসেছে, পায়ে পুরনো কেডস্। গলায় ঝোলানো পাস বলছে, তার নাম ল্যারি কিং। নামদুটো চেনা চেনা লাগল বেনসনের। দু'জনে আলাপ জুড়তেই মনে পড়ে গেল—রেডক্লিফ হচ্ছেন নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর, আর ল্যারি কিং ওখানকার আই.টি. ডিপার্টমেন্টের হেড।

'অ্যাডমিরালের বক্তৃতা কিন্তু চমৎকার হয়েছে, কী বলো?' ল্যারিকে বললেন রেডক্লিফ। 'খুবই জ্ঞানগর্ভ।'

'তা তো বটেই,' একমত হলো ল্যারি। 'বক্তৃতা শোনার লোভেই তো অফিসের জরুরি কাজ ফেলে চলে এসেছি।'

'রানা মিস করল,' আফসোসের সুরে বললেন রেডক্লিফ। 'সময় আর পেল না, আজই ব্রেমারটনের প্রজেক্ট দেখতে গেছে।'

'ও আসলে কিছুই মিস করেনি,' হাসল ল্যারি। 'অ্যাডমিরালের স্পিচের মূল অংশ তো ও-ই ডিকটেশন দিয়েছে, জানেন না? আফটার অল, ইম্প্রোভাইযড় ওয়েপন আর টেরোরিস্ট থ্রেট সম্পর্কে ওর চাইতে ভাল আর কে জানে? সেমিনারে অন্যদের কাছ থেকেও জানার মত বিশেষ কিছু ছিল না ওর। এসব হচ্ছে আপনার-আমার মত লেম্যানদের জন্যে।'

দশতলায় পৌঁছে থামল এলিভেটর। এই ফ্লোরেই হোটেলের ক্লাব-রেস্টুরেন্ট, গেমিং রুম আর ব্যাঙ্কোয়েট হলগুলোর অবস্থান।

'ক্যাপিটাল ক্লাবটা কোনদিকে?' এলিভেটর থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'যদ্দূর মনে পড়ছে, বাঁয়ে,' বলল ল্যারি।

'চলো, একটা টেবিল রিজার্ভ করে ফেলি। নইলে পরে জায়গা পাওয়া যাবে না। অ্যাডমিরালের জন্যও একটা সিট রাখব।'

ওদের পিছু পিছু রেস্টুরেণ্টের দরজা পর্যন্ত গেল বেনসন, তবে ভিতরে ঢুকল না। বাইরেই ঘুর ঘুর করতে থাকল। হাতে একটা ব্রোশিয়ার ধরে রেখেছে, ভাব করছে মনোযোগ দিয়ে ওটা পড়বার। তার ফাঁকে চোখ রাখছে রেস্টুরেণ্টের প্রবেশপথের দিকে। খানিক পরেই এলিভেটর আর সিঁড়ি ধরে দলে দলে হাজির হলো সেমিনারে অংশগ্রহণকারী সামরিক ও বেসামরিক লোকজন। তাদের ভিড়ে মিশে যেতে কষ্ট হলো না বেনসনের।

ক্যাপিটাল ক্লাবের কাঁচের দরজার সামনে দিয়ে কয়েকবার ঘুরে এল সে। তবে দেখা পেল না টার্গেটের। জর্জ রেডক্লিফ আর ল্যারি কিং একটা গোলটেবিলে বসে গল্পে মগ্ন। মাঝে একটা খালি চেয়ার দেখল—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন এখনও আসেননি। এলিভেটরের কাছাকাছি একটা জায়গা বেছে দাঁড়িয়ে পড়ল বেনসন। দেয়ালে হেলান দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে সংযত করল নিজেকে। মনে পড়ে গেছে—শৃঙ্খলাপরায়ণ কোনও আর্মি অফিসার দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় না। ওটা সামরিক শিষ্টাচার-বহির্ভূত একটা কাজ।

পকেটে সেলফোনের গুঞ্জন অনুভব করল বেনসন। বের করে কানে ঠেকাল। বলল, 'ইয়েস?'

'আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে,' ভূমিকা না করে ওপাশ থেকে বলল লিডার। 'তোমার কী খবর?'

বেনসন বলল, 'পজিশন নিয়ে ফেলেছি।'

'টার্গেট?'

'এখনও দেখিনি তাকে। তবে হোটেলেই আছে সে। লাঞ্চে আসবে বলে কনফার্মড খবর পেয়েছি। দু'জন স্টাফ টেবিল

রিজার্ভ করে অপেক্ষা করছে তার জন্য।'

'খুব ভাল। তুমিও অপেক্ষা করো। কাজটা করবে কি করবে না, সেটা বিশ মিনিটের মধ্যে জানতে পারবে।'

'ওকে, বস্।'

সেলফোন আবার পকেটে ভরে ব্রোশিয়ারে চোখ নামাল বেনসন। হাসি পেয়ে গেল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের বক্তৃতার বিষয়বস্তু দেখে। *'দ্য ডেঞ্জার অভ অ্যাসিমেট্রিক থ্রেট অ্যাণ্ড রেসপন্স: হাউ টু কমব্যাট ইম্প্রোভাইযড় ওয়েপনস্ অভ মাস ডেসট্রাকশন।'* লোকটা তো জানে না, খুব শীঘ্রি থিয়োরির বাস্তব চেহারা দেখবে সে!

তিন দফা খুলল আর বন্ধ হলো এলিভেটরের দরজা। চতুর্থবারে কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে দেখতে পেল বেনসন। গটমট করে বেরিয়ে এসেছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, ঋজু ভঙ্গিতে উঁচু করে রেখেছেন মাথা। মনের অজান্তেই সবার চোখ আটকে গেল তাঁর দিকে—এমনই ভদ্রলোকের আকর্ষণী ক্ষমতা!

সঙ্গে আসা একজন আর্মি কর্নেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লেন তিনি। সেলফোন বের করে লিডারের কাছে টেক্সট মেসেজ পাঠিয়ে দিল বেনসন—টার্গেট অ্যাকোয়্যার্ড। লিডার নির্দেশ দিলেই কাজ শুরু করবে সে।

ছয়

মেজাজ খিঁচড়ে আছে রানার। কষ্টার্জিত ছুটিটা এবারও পণ্ড হতে

চলেছে। নিজেকে অপয়া বলে মনে হচ্ছে। ছুটিছাটায় যখনই কোথাও যায়, তখনই একটা না একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। কোনও মানে হয়? দুনিয়ার সমস্ত পাগল-ছাগল আর ক্রিমিনাল কেন যে ওকেই টার্গেট করে সবসময়!

রিং হলে হাঁটতে হাঁটতেই কানে ফোন ঠেকাল ও। ইচ্ছে থাকলেও দৌড়াতে পারছে না। চায় না ওকে দেখে কোনও কারণে কৌতূহলী হয়ে উঠুক বাকি যাত্রীরা। বোমার খবর ফাঁস হলে প্যানিক দেখা দেবে। তখন সামলানো যাবে না পরিস্থিতি।

'আ'য়্যাম ব্যাক,' বলল ওপাশের লোকটা। 'দুঃখিত, জরুরি আরেকটা কল করতে হয়েছিল। এনিওয়ে... জায়গামত পৌঁছেছ?'

'দু'মিনিটের মধ্যে পৌঁছাব।' সিঁড়ি ধরে ভেহিকল ডেকে নামতে শুরু করেছে রানা। 'একটা প্রশ্ন করব? নিজে বোমা পেতে সেটা আবার আমাকে দিয়ে ডিজআর্ম করাতে চাইছ কেন?'

'ভিন্ন একটা কাজ করাতে চাই তোমাকে দিয়ে। কিন্তু কাজটা দেবার আগে নিশ্চিত হয়ে নিতে চাই, ওটা সামলাবার মত যোগ্যতা সত্যিই তোমার আছে কি না।'

'যোগ্যতা যাচাইয়ের আর কোনও রাস্তা ছিল না? সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তো পারতে!'

'চেষ্টা করিনি ভেবেছ?' তিক্ত গলায় বলল লোকটা। 'আকাশের চাঁদ তুমি, মাসুদ রানা। নাগাল পাওয়াই যায় না। কাজ গছাব কীভাবে? তার ওপর যদি বলতাম তোমার যোগ্যতার পরীক্ষা নিতে চাই... রাজি হতে?'

'বোধহয় না।'

'সত্য কথা বলায় ধন্যবাদ। বুঝতেই পারছ, তোমার যোগ্যতা যাচাই করে দেখবার জন্য এই অভিনব কায়দা ব্যবহার না করে উপায় ছিল না আমার। বাই দ্য ওয়ে, ট্রাকের কাছে যাবার আগে নিজের গাড়ির কাছে যাও। চাবিটা গাড়ির গ্লাভবক্সে রেখে দেবে...

দরজাও যেন খোলা থাকে।'

'কেন?'

'কারণ এটাই আমার নির্দেশ... এবং আমার হাতে বোমার রিমোট আছে,' কড়া গলায় বলল অপরপক্ষ। 'কথা বাড়িয়ো না। যা বলছি করো।'

'ঠিক আছে। যাচ্ছি।' ঝড়ের বেগে চিন্তা করছে রানা। গলাটা চেনা চেনা ঠেকছে, কিন্তু মনে করতে পারছে না কোথায় শুনেছে। কে এই লোক? একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, একসঙ্গে কাজ করতে হলে তোমার নামটা জানা থাকা দরকার না আমার?'

'ভবিষ্যৎ নিয়ে একটু বেশিই ভাবছ তুমি,' বাঁকা সুরে বলল লোকটা। 'তোমার-আমার পার্টনারশিপ বাইশ মিনিট পরেই খতম হয়ে যেতে পারে। মানে... তুমি যদি বোমাটা অকেজো করতে না পারো আর কী।'

ঘড়ির টাইমারে সময়টা সেট করে নিল রানা। 'আমি আশাবাদী মানুষ, আশা করি পারব।' হালকা গলায় বলল ও। 'তবে যদি মরেই যাই... কার কারণে মরছি, সেটা জেনে যাওয়া খুবই দরকার... নইলে ওপারে কেউ প্রশ্ন করলে কী উত্তর দেব?' কথা বলে যতটা সম্ভব প্রতিপক্ষের ব্যাপারে তথ্য জোগাড় করতে চাইছে।

'এত ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। ট্রাকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার পরিচয় জেনে যাবে তুমি।' হেঁয়ালি করল লোকটা।

কীভাবে? জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না রানা। বেশি আগ্রহ দেখাবার দরকার নেই। তারচেয়ে হাতের সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামানো যাক। লোকটা আর যা-ই হোক, বোকা নয়। বোমার ছবি দেখেই বুঝতে পেরেছে, ওটা যথেষ্ট জটিল। যার-তার পক্ষে অমন বোমা তৈরি করা সম্ভব নয়। কী করে ওটাকে নিষ্ক্রিয় করবে, সেটাই বুঝতে পারছে না। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বা পরিবেশ...

কোনোটাই নেই।

ভেহিকল ডেকে পৌঁছে গেছে রানা। রেন্টাল এজেন্সি থেকে একটা লাল রঙের ডজ ভাইপার স্পোর্টস কার নিয়ে এসেছে ও, প্রতিপক্ষের কথামত ওটার গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে চাবি রেখে চোখ বোলাল সার বেঁধে পার্ক করা ভেহিকল ডেকের অন্যান্য গাড়িগুলোর উপর। মালবাহী গাড়ি আছে মাত্র তিনটে, তার মধ্য থেকে সিলভারলেক ট্রান্সপোর্টের নীল রঙা ট্রাকটাকে খুঁজে পেতে কষ্ট হলো না। ওটার দিকে দ্রুত এগোল ও।

ফোনে জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে হবে আমাকে?'

'ফ্রিজের গায়ে সমস্ত ইন্সট্রাকশন পাবে। তোমার জন্যেই লিখে রেখেছি সব। ইয়ে... ঠিক তোমার জন্যে না... দেখলেই বুঝতে পারবে। আর হ্যাঁ, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, পুলিশে খবর দিতে যেয়ো না। তোমার প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ করছি আমি। একটু এদিক-ওদিক দেখলেই রিমোট কন্ট্রোল টিপে ফাটিয়ে দেব বোমা। কাজেই ফেরির দিকে যেন বম্ব স্কোয়াডকে যেতে না দেখি। লাইফবোটও নামানো চলবে না। ক্লিয়ার? বেস্ট অভ লাক।'

'এক মিনিট। যদি ডিজআর্ম করতে পারি, তারপর কী ঘটবে?'

'সেটা সময় হলেই দেখবে। অপেক্ষায় থেকো আমার ফোন পাবার। আর যদি ব্যর্থ হও, তা হলে তো ফোন-টোনের ঝামেলাই থাকে না। তাই না?'

নীরব হয়ে গেল সেলফোন। ওটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল রানা। ট্রাকের পাশে পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে, নিচু হয়ে বাম চাকার পিছনটা হাতড়াল। মিথ্যে বলেনি লোকটা, সত্যিই টেপ দিয়ে একটা চাবি আটকে রাখা হয়েছে চাকার পিছন দিকে। ওটা বের করে আনল।

চারপাশে তাকাল ও। বয়স্কা এক ভদ্রমহিলা ছাড়া আর কাউকে দেখল না। গাড়ি থেকে কিছু বোধহয় নিতে এসেছিলেন, সিঁড়ি ধরে উঠে গেলেন উপরে। নিশ্চিন্ত হয়ে তালায় চাবি ঢোকাল রানা।

মোচড় দিতেই ক্লিক শব্দে খুলে গেল তালা। হাতল ধরে টান দেবার আগে কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা, দরজার সব জয়েন্টে আঙুল ঢুকিয়ে পরীক্ষা করল। কোনও বুবি ট্র্যাপ বসানো থাকলে বুঝতে পারবে। কিন্তু ট্রিপ-ওয়ায়্যারের স্পর্শ পেল না আঙুলে। ভিতরে ঢোকা যেতে পারে।

দরজা প্রয়োজনমত ফাঁক করল রানা, ফাঁক গলে ঝটপট উঠে পড়ল ট্রাকের পিছনে। তারপর আবার টেনে দিল দরজা, লক করে দিল ভিতর থেকে। চায় না কাজ করবার সময় বাইরের কেউ বোমাটা দেখে ফেলে চেঁচামেচি জুড়ুক।

দরজা বন্ধ করে দেয়ায় অন্ধকার হয়ে গেছে ভিতরটা, তবে বাল্কহেডের সঙ্গে ঝোলানো দুটো ইলেকট্রিকের লণ্ঠন পাওয়া গেল—ব্যাটারি লাগানো আছে। সুইচ টিপে দুটোই জ্বালল রানা, তারপর নজর বোলাল ট্রাকের অভ্যন্তরে। খুব বেশি কিছু নেই—পুরনো আমলের দাগপড়া একটা কাউচ, কয়েকটা ভাঙাচোরা চেয়ার, আর মাঝারি আকারের একটা রিডিং টেবিল। এ ছাড়া রয়েছে কিছু খালি কাগজের কার্টন আর পুরনো পেপারের স্তূপ। স্রেফ জঞ্জাল। বোধহয় জাঙ্কইয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবার জন্যই তোলা হয়েছে ট্রাকে।

সবকিছু ছাড়িয়ে টেবিলটার দিকে নজর চলে গেল রানার। ওটার উপরেই রয়েছে ফ্রিজটা। বহু আগের মডেল, ল্যাচের সাহায্যে দরজা আটকাতে হয়। এ-মুহূর্তে আটকানোই আছে... দরজার উপরে টেপমারা অবস্থায় ঝুলছে একটা ম্যানিলা খাম, সাবধানে ওটা খুলে নিল রানা।

খামের ভিতর থেকে এক পাতার একটা কাগজ বেরুল, ইংরেজি হরফে হাবিজাবি অনেক কিছু লেখা... কিন্তু তার একবর্ণও বুঝতে পারল না ও। ভাল করে দেখতেই পরিষ্কার হয়ে গেল, ইংরেজি নয়... ওগুলো আসলে গ্রিক হরফ। পুরো পাতাটাই গ্রিক ভাষায় লেখা!

বিড় বিড় করে অচেনা লোকটাকে গালি দিল রানা। ইন্সট্রাকশনের নামে গ্রিক ভাষায় লেখা একটা ধাঁধা তুলে দেয়া হয়েছে ওর হাতে। ইচ্ছাকৃত? নাকি কোনও ভুল করেছে প্রতিপক্ষ? স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান আর আরবি-সহ বেশ কয়েকটা ভাষায় দখল আছে রানার, লোকটা হয়তো ভেবেছে ও গ্রিক-ও জানে।

নাহ্, ব্যাটা এত বড় ভুল করবে বলে মনে হয় না। অন্তত তার মত প্রফেশনালের কাছ থেকে সেটা আশা করা যায় না। রানার ব্যাপারে ভালমত খোঁজখবর নিয়ে মাঠে নেমেছে সে; ও যে গ্রিক ভাষা পড়তে পারে না, তা না-জানার কোনও কারণ নেই। তা হলে?

হাল ছাড়তে রাজি নয় রানা। পড়তে না পারলেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল কাগজটা। বাক্যগুলো বুঝতে না পারুক, কোনও ধরনের ডিজিট বা সমীকরণ বের করতে পারলেও হয়—বোমার প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুটা আইডিয়া পাওয়া যাবে। কিন্তু পণ্ডশ্রমই করল কেবল, কাজে লাগাবার মত কিচ্ছু পেল না।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, লোকটা বলছিল, ইন্সট্রাকশন লেখা কাগজটা রানার জন্য নয়... তা হলে কার জন্য?

ঘড়ি দেখল রানা। বিশ মিনিট বাকি বিস্ফোরণের। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বের করল সেলফোন। লেখার মর্মোদ্ধারের জন্য কাকে ফোন করা যায় ভাবছে, এমন সময় ধুমধাম শব্দে ট্রাকের পিছনের দরজায় থাবড়া দিল কেউ। জমে গেল রানা।

'ভিতরে কেউ আছেন?' শোনা গেল নারীকণ্ঠ। সম্ভবত ফেরির কোনও স্টাফ, ওকে চোরের মত ট্রাকে উঠতে দেখে খোঁজ নিতে এসেছে।

'হ্যাঁ,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আমি এই ট্রাকেরই লোক। ঝাঁকুনিতে মালসামানের বাঁধন ঢিলে হয়ে গেছে... ঠিক করতে এসেছি।'

'প্লিজ, দরজা খুলুন।'

একবার ভাবল মানা করে দেবে, কিন্তু পরক্ষণে মত পাল্টাল রানা। মেয়েটার সন্দেহ বেড়ে যাবে তাতে। লোক ডেকে এনে অযাচিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। তারচেয়ে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বিদায় করাই ভাল।

ট্রাকের দরজা সামান্য ফাঁক করে মাথা বের করল রানা। বিস্মিত হলো। ফেরির কোনও কর্মচারী নয়; বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কালো জ্যাকেট, জিন্স আর দামি বুট পরা অপূর্বসুন্দরী এক যুবতী। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা দারুণ, মেয়েলি সৌন্দর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পাচ্ছে। শরীরের কোথাও ঢিলে-ঢালা ভাব বা অসামঞ্জস্য নেই। একহারা লম্বা সে, রোদে পুড়ে গায়ের চামড়া তামাটে-সোনালি রঙ পেয়েছে। দীঘল সোনালি চুল, খোঁপা করে বাঁধা। চোখ জোড়া নীল, মুখে কোনও দাগ নেই, চিকবোন সামান্য উঁচু। বয়েস যাই হোক, কেউ তাকে পঁচিশের বেশি বলবে না। পুরুষেরা যে-ধরনের মেয়ে দেখে আকর্ষণ বোধ করে, তাদের দলেই পড়ে সে।

তবে রূপ দেখে বিস্মিত হয়নি রানা, হয়েছে মেয়েটিকে চিনতে পেরে। ড. রেমি হ্যাডলি... মার্কিন টেলিভিশনের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান *চেজিং দ্য পাস্ট*-এর উপস্থাপিকা। পরস্পরের পূর্ব-পরিচিত ওরা, তবে সখ্যতা নেই। কয়েক মাস আগে নিজের অনুষ্ঠানে রানাকে হাজির করাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল রেমি,

চেয়েছিল টিভিতে ওর সাক্ষাৎকার নিতে। আগ্রহটা অযৌক্তিক বলা চলে না—রানার আর্কিয়োলজিকাল অ্যাচিভমেন্ট এক হিসেবে তাক লাগিয়ে দেবার মত; *চেজিং দ্য পাস্ট*-ও আর্কিয়োলজি এবং ইতিহাস বিষয়ক অনুষ্ঠান। কিন্তু পেশাগত গোপনীয়তা বজায় রাখার স্বার্থে ভদ্রভাবে প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেয় রানা। রেমি তবু হাল ছাড়েনি, প্রায় মাসখানেক ঘুরঘুর করেছে ওর পিছনে; বিরক্ত করে মেরেছে। শেষ পর্যন্ত তাকে কয়েকটা কটু কথা শোনাতে বাধ্য হয় রানা। অপমানে লাল হয়ে গিয়েছিল মেয়েটা, রেগে-মেগে রানার অফিস থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। তার পর থেকে আর যোগাযোগ হয়নি দু'জনের।

এমন একটা পরিস্থিতিতে রেমিকে আবার দেখবে বলে আশা করেনি ও। বিস্ময়ের ধাক্কায় সাধারণ ভদ্রতা ভুলে গেল, হাই-হ্যালো করবার বদলে ট্রাক থেকে নেমে সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আপনি এখানে কী করছেন?'

রেমিও রানাকে দেখে চমকে গেছে। হতভম্ব গলায় বলল, 'একই প্রশ্ন তো আমারও!'

'প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন না করলে হয় না?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। 'আপনি কি আবারও আমার পিছু নিয়েছেন?'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল রেমি। 'আমাকে এক লোক ফোন করে এখানে আসতে বলেছে। ট্রাকের ভিতরে কে নাকি আমার অপেক্ষায় বসে আছে। সেই লোক যে আপনি হতে পারেন, মি. রানা, তা আমি কল্পনাও করিনি।'

তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটার মুখভঙ্গি লক্ষ করল রানা, তবে তাতে কোন ছল-চাতুরী দেখল না। সত্যি কথাই বলছে বোধহয়। ও জিজ্ঞেস করল, 'ফোনটা কে করেছিল? তাকে চেনেন?'

মাথা নাড়ল রেমি। 'নাহ্।'

'গলাটা কি ভারী? একটু খসখসে?'

'হ্যাঁ। আপনাকেও করেছিল?'

'হুঁ,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু আপনাকে পাঠাল কেন?' দৃষ্টি হঠাৎ উজ্জ্বল হলো ওর। 'আপনি গ্রিক পড়তে পারেন?'

এমনভাবে মুখ বাঁকাল রেমি, যেন প্রশ্নটা বোকার মত করে ফেলেছে রানা। একটু উষ্মার সঙ্গে বলল, 'প্রাচীন ইয়োরোপিয়ান সভ্যতার উপর থিসিস করেছি আমি। গ্রিক জানব না কেন?'

'তা হলে এটা আপনার জন্য,' বলে কাগজটা রেমির হাতে তুলে দিল রানা।

পড়তে পড়তে মেয়েটার মুখ থেকে রক্ত সরে যেতে দেখল ও। শঙ্কিত হয়ে পড়ল, ভয় পেয়ে রেমি এখন চেঁচামেচি জুড়ে দিলে সর্বনাশ হবে! কিন্তু রানাকে অবাক করে দিয়ে আশ্চর্য দক্ষতায় নিজেকে সামলাল মেয়েটা। পড়া শেষ করে যখন মাথা তুলল, তখন চেহারা থমথমে হয়ে গেছে।

'বোমাটা কোথায়?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল ও।

সাত

ঝটপট ট্রাকের পিছনে উঠে পড়ল দু'জনে। রানা যখন দরজা বন্ধ করছে, কাগজে লেখা প্রথম তিন লাইন আবার পড়ল রেমি। আধুনিক গ্রিকে টাইপ করা হয়েছে লাইনগুলো, তবে ব্যাকরণের অবস্থা যাচ্ছেতাই। মনে হলো ইন্টারনেটের কোনও ফ্রি ট্রান্সলেটর সফটওয়্যারের সাহায্যে ইংরেজি থেকে গ্রিকে ভাষান্তর করা

হয়েছে। তবে লেখার মান খারাপ হলেও অর্থ বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার।

ট্রাকে একটা বোমা রাখা আছে। সামনের লোকটিকে ওটা নিষ্ক্রিয় করতে সাহায্য করো। যদি ব্যর্থ হও, তা হলে তুমি আর তোমার বোন... দু'জনেই মারা যাবে।

দুঃস্বপ্নটার সূচনা হয়েছে ঘণ্টাখানেক আগে। নিউ ইয়র্কের ফ্লাইট ধরবার জন্য সিয়াটলের হোটেল-কক্ষে ব্যাগ গোছাচ্ছিল রেমি, এমন সময় অচেনা এক লোক ফোন করে জানাল—সে নাকি ওর ছোট বোন র‍্যাচেলকে কিডন্যাপ করেছে। প্রমাণস্বরূপ ই-মেইলে একটা ভিডিও পাঠায় লোকটা, তাতে বোনকে হাত-পা বাঁধা ও অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ও। আতঙ্ক আর বোনের অমঙ্গল আশঙ্কায় হাত-পা হিম হয়ে এসেছিল রেমির, বাধ্য হয়েছিল চুপচাপ অপহরণকারীর নির্দেশ মেনে নিতে।

প্রথম নির্দেশটা গতানুগতিক—পুলিশে খবর দেয়া যাবে না। আর দ্বিতীয় নির্দেশটা ছিল, ব্রেমারটনগামী বেলা পৌনে এগারোটার ফেরিতে চড়তে হবে ওকে। অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী নির্দেশ পাবার জন্য।

ফোন রাখার পরে বেশ কিছুক্ষণ থম মেরে বসে ছিল রেমি। কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু কাঁদতে পারেনি। বাস্তববাদী মেয়ে ও; বুঝতে পারছিল, ভেঙে পড়লে লাভ হবে না... বাঁচাতে পারবে না প্রিয় বোনকে। আইওয়া-র এক খামারে কঠিন পরিবেশে বড় হয়েছে ও আর র‍্যাচেল, বাবা-মা'কে হারিয়েছে বয়স পনেরো হবার আগেই। তারপর থেকে জীবন কেটেছে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। নিজের যোগ্যতা আর কঠোর পরিশ্রমের ফলে বর্তমান অবস্থানে উঠে এসেছে ও। নারীসুলভ কুসুম-কোমল-পেলব ভাব এখন আর নেই ওর মাঝে। তাই মন শক্ত করে বেরিয়ে পড়েছে হোটেল থেকে।

দৃঢ় স্বভাবের মেয়ে হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজের অসহায়ত্ব সম্পর্কে সচেতন রেমি। বুঝতে পারছিল কতটা নাজুক অবস্থায় আছে ও, অপহরণকারীর নির্দেশ মেনে নিলেও বোনকে সুস্থ দেহে ফিরে পাবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু হঠাৎ করে মাসুদ রানার দেখা পেয়ে বুকে সাহস ফিরে পেয়েছে অনেকখানি। নিজেকে আর একা বলে মনে হচ্ছে না। লোকটির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকুক বা না-ই থাকুক।

ন'মাস আগে রানার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওর। *চেজিং দ্য পাস্ট*-এ তাকে ইন্টারভিউ করবার প্রস্তাব দেবার সময়। অদ্ভুত এক মানুষ... অন্যেরা যেখানে টিভিতে চেহারা দেখাবার জন্য, নিজের ঢাক পিটাবার জন্য মুখিয়ে থাকে... সেখানে রানা সরাসরি নাকচ করে দিয়েছিল ওকে। প্রথমে মনে হচ্ছিল এটা লোকটার নিজের দাম বাড়াবার কৌশল; কিন্তু মাসখানেক ওর পিছনে লেগে থাকার পর টের পেয়েছিল, মাসুদ রানা এক কথার মানুষ। টাকা বা খ্যাতির লোভ দেখিয়ে তাকে বশ করা সম্ভব নয়। জোরাজুরি করতে গিয়ে বরং কড়া কিছু কথা শুনতে হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে বেশ রেগে গিয়েছিল রেমি। *চেজিং দ্য পাস্ট* অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান, সেই সুবাদে মিডিয়া-জগতের খ্যাতিমান বড়-সড় সিলেব্রিটিও ওর অনুষ্ঠানে সুযোগ পাবার জন্য লাইন ধরে... আর রানা কিনা ওকেই অপমান করে তাড়িয়ে দিল! নিজেকে কী ভাবে লোকটা? ওকে এক হাত দেখে নেবার ইচ্ছে হয়েছিল খুব।

কিন্তু সময় গড়াবার সঙ্গে ফিকে হয়ে এসেছে রাগ। তার বদলে ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়েছে একটা সমীহের ভাব। যে-মানুষ বড় বড় অবদান রাখার পরেও নিভৃতে থাকতে চায়, নীরবে সেবা করতে চায় মানুষের... তার উপরে রাগ করে থাকা যায় না। জোরাজুরি করে ও-ই বরং অন্যায় করেছিল। লোকটা কি এখনও ওর উপর অসন্তুষ্ট?

আড়চোখে রানার দিকে তাকাল রেমি। এমন সুপুরুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। যেমন লম্বা, তেমনি সুঠামদেহী। রোদে পোড়া তামাটে চামড়া, মাথার কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা। ঠোঁটের কোণে কয়েকটা ভাঁজ আছে... দেখলে বোঝা যায়, মুহূর্তে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে লোকটা, অথচ চেহারা হাসিখুশি। বিশেষ করে চোখদুটো আশ্চর্য মায়াময়, সেদিকে একবার তাকিয়েই অনুভব করল রেমি—এই লোককে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে না। প্রাণ দিয়ে হলেও মানুষটা যে-কোনও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবে ওকে।

সঙ্গিনীর ভাবালুতার দিকে খেয়াল নেই রানার। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'পড়েছেন কাগজটা? কী লিখেছে ওতে? আমাদের হাতে আর মাত্র আঠারো মিনিট সময় আছে!'

সংবিৎ ফিরে পেয়ে কাগজের দিকে চোখ ফেরাল রেমি। প্রথম অংশটা আধুনিক গ্রিকে লেখা। বাকিটা লেখা হয়েছে প্রাচীন গদ্যরীতিতে। ঠিকমত অর্থ বোঝাই মুশকিল। আধুনিক অংশটায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলল, 'ফ্রিজের দরজায় একটা বুবি ট্র্যাপ বসানো আছে। ওটাকে ডিজেবল করতে হলে দরজার নীচে লাগানো একটা তার খুলে নিতে হবে।'

নিচু হয়ে ফ্রিজের তলায় ডান হাতের চার আঙুল ঢুকিয়ে দিল রানা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই খুলে আনল তারটা।

'এবার কী?'

'দরজা এবার খুলতে পারবেন।'

সতর্কতায় ঢিল দিল না রানা। ল্যাচ সরিয়ে মাত্র ইঞ্চিখানেক ফাঁক করল ফ্রিজের দরজা। উঁকি দিল ভিতরে। দেখতে চাইছে আরও কোনও ফাঁদ আছে কি না। নিশ্চিত হয়ে মেলে ধরল পুরো দরজা।

সবগুলো তাক সরিয়ে ফেলা হয়েছে ফ্রিজটার ভিতর থেকে।

খালি জায়গার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে স্বচ্ছ প্লাস্টিক কণ্টেইনার—ঠিক ই-মেইলে দেখা ছবির মত। কণ্টেইনারে রয়েছে ধূসর পাউডার। বাইরে টাইমার সময় দেখাচ্ছে—সতেরো মিনিট আটত্রিশ সেকেণ্ড। কণ্টেইনারের ভিতর থেকে একগোছা তার এসে মিলেছে টাইমারের সঙ্গে। আরেক গোছা তার অদৃশ্য হয়ে গেছে উপরের কাপড়ে-ঢাকা জিনিসটার মাঝে। ছোট একটা পাউচও আছে ফ্রিজের ভিতরে। হুক আর সুতোর সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে দেয়ালে।

'অদ্ভুত,' মন্তব্য করল রেমি। বুক ধড়ফড় করছে ওর, চেষ্টা করল গলার স্বর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখতে। 'বোমার চেহারা এমন হয় জানতাম না।'

'এটা আন-কনভেনশনাল বোমা,' বলল রানা। 'পাউডারটা এক ধরনের বাইনারি এক্সপ্লোসিভ। তার সঙ্গে ফিট করা হয়েছে ডিটোনেটর।'

অবাক হতে গিয়েও হলো না রেমি। মনে পড়ে গেছে, রানা একজন বোমা বিশেষজ্ঞও। ইন্টারভিউ-র উদ্দেশ্যে ওর ব্যাপারে বেশ খোঁজখবর নিয়েছিল সে।

'জিনিসটা নকল হবার সম্ভাবনা কতখানি? অযথাই অস্থির হচ্ছি না তো?'

'নকল বলে মনে হচ্ছে না,' রানা মাথা নাড়ল। 'নকল জিনিস এত নিখুঁত হয় না। শুধু আসল নয়, শক্তিশালীও বটে।'

'কতটা শক্তিশালী? সত্যি করে বলুন। আমাকে অভয় দেবার জন্য কমিয়ে বলার দরকার নেই।'

'এটা ফাটলে আমরা কেউই বাঁচব না। ফেরিটা চোখের পলকে ডুবে যাবে পানিতে।'

'এতই খারাপ?' আঁতকে উঠল রেমি।

'ঘাবড়ে গেলেন?'

'ঘাবড়াবার সময় পাচ্ছি কোথায়? এখান থেকে রক্ষা পেলে পরে না হয় ঘাবড়াব।' হালকা সুরে বলল রেমি।

'তখন আমিও হয়তো আপনার সঙ্গী হব,' বলল রানা। 'এখন কাগজ দেখুন। এরপর কী?'

'সাবধানে কাপড়ের ঢাকনা সরান,' পরের নির্দেশটা পড়ল রেমি।

সুতো দিয়ে কন্টেইনারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে কাপড়টা। সাবধানে বাঁধন খুলে ওটা সরিয়ে নিল রানা। এক ফুট উঁচু আর ছ'ইঞ্চি চওড়া একটা চারকোনা আকৃতি উদয় হলো চোখের সামনে—ব্রোঞ্জের তৈরি, চকচক করছে।

ভালমত দেখার জন্য একটু এগিয়ে গেল রেমি। ঘড়ির মত দুটো ডায়াল দেখা যাচ্ছে জিনিসটার গায়ে, একটা করে কাঁটাও আছে ডায়ালদুটোয়; কিন্তু ওটা ঘড়ি নয়। নড়ছে না কাঁটাগুলো। যেখানে সংখ্যা লেখা থাকার কথা, সেখানে দেখা যাচ্ছে নানা রকম গ্রিক বর্ণ। তৃতীয় একটা কাঁটাও আছে পিছনে। যন্ত্রটার সামনের দিকের ডায়ালদুটো ক্লক ফেসের মত বারো ভাগে ভাগ করা, সেখানে খোদাই করা গ্রিক লেখাগুলো আসলে একটা করে শব্দ... মনে হচ্ছে, রাশিচক্রের বারোটা রাশির নাম। আকৃতিটার বাম পাশে দুটো কন্ট্রোল নব দেখা গেল। অদ্ভুত এক ডিজাইন... নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীন। তবে চকচকে দেহ থেকে বোঝা যাচ্ছে, সম্প্রতি বানানো হয়েছে যন্ত্রটা।

কন্টেইনার থেকে বেরিয়ে আসা তারগুলো জোড়া দেয়া হয়েছে এই আজব জিনিসটার গায়ে। কিন্তু বোমার সঙ্গে ওটার কী সম্পর্ক থাকতে পারে, তা বুঝে পেল না রেমি।

'কী এটা?' বিড়বিড় করল ও। রানার কাছ থেকে জবাব পাবে বলে আশা করছে না।

কিন্তু ওকে বিস্মিত করে দিয়ে কথা বলল বাঙালি যুবক।

'আর্কিমিডিসের ডিজাইন করা একটা ডিভাইসের রেপ্লিকা এটা। নাম, জিয়োলেব।'

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল রেমি। 'জিয়ো... কী?'

'জিয়োলেব। প্রাচীন আমলের নেভিগেশনাল ডিভাইস। এটার সাহায্যে স্থলভূমির বিভিন্ন ল্যাণ্ডমার্কের রেফারেন্স নিয়ে নিজের অবস্থান এবং দিক-নির্ণয় করত সেই যুগের পর্যটক আর সওদাগরেরা। অচেনা জায়গায় পথ খুঁজে নিত। এমন আরেকটা ডিভাইস আছে—অ্যাস্ট্রোলেব। ওটা আকাশের তারার রেফারেন্স ব্যবহার করে সাগরে পথ চেনাত জাহাজকে।'

গলার সুরেই বোঝা যাচ্ছে, অনুমানের উপর ভিত্তি করে কথা বলছে না রানা। ডিভাইসটা দেখামাত্র চিনতে পেরেছে ও। রেমি হতভম্ব গলায় জানতে চাইল, 'এটা যে সেই ডিভাইস, তা আপনি বুঝলেন কী করে?'

তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'কারণ এই জিয়োলেবটা আমি কদিন আগেই দেখেছি।'

আট

পশ্চিম সিয়াটলের সি-বিচ সংলগ্ন পার্কিং লট থেকে পিউজেট প্রণালীর বিশাল একটা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। সে-কারণে ভাড়া করা একটা এস.ইউ.ভি নিয়ে ওখানেই অপেক্ষা করছে অ্যান্থনি গ্যারেট। বেইনব্রিজ আইল্যাণ্ডের পাশ ঘুরে ব্রেমারটনের দিকে মুখ করবার আগ পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাবে ফেরিটাকে। যা ঘটবার,

তা ঘটে যাবে এর ভিতরেই। মাসুদ রানা যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে বেইনব্রিজে পৌঁছুবার অনেক আগেই বিস্ফোরিত হবে বোমা।

এস.ইউ.ভি-র প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে গ্যারেটের নতুন সহচর অগাস্ট রেনফিল্ড। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে তাকিয়ে আছে ফেরির দিকে—এইমাত্র ওয়েস্ট সিয়াটল পেরিয়ে এল ওটা।

'দূরবীনটা একটু নামাবে?' বলল গ্যারেট। 'বোমা ফেটেছে কি ফাটেনি, সেটা বোঝার জন্য দুটো কানই যথেষ্ট। মানে... তুমি যদি কালা না হয়ে থাকো আর কী!'

'ডেকের উপর নজর রাখছি আমি,' অসন্তুষ্ট গলায় বলল রেনফিল্ড, গ্যারেটের মশকরা সহজভাবে নিতে পারেনি। 'কেউ অস্বাভাবিক আচরণ করছে কি না বোঝা দরকার। রানা গোপনে সবাইকে সতর্ক করে দিতে পারে।'

'করেনি... নিশ্চিত থাকতে পারো,' বলল গ্যারেট। চোখ বোলাল কবজিতে বাঁধা হাতঘড়িতে। 'এতক্ষণে ও বুঝে গেছে, আমি কতটা সিরিয়াস।'

সানগ্লাস পরা একটা মেয়েকে পার্কিং লটের পাশ দিয়ে জগিং করতে দেখল সে। এদিকে তাকাচ্ছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। চাপা গলায় সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, 'দূরবীনটা সরাও তো! লোকে সন্দেহ করে বসতে পারে। তোমাকে মোটেই বার্ড-ওয়াচারের মত দেখাচ্ছে না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বিনকিউলার নামিয়ে ফেলল রেনফিল্ড। মনোযোগ দিল কোলের উপর রাখা ল্যাপটপ কম্পিউটারে। স্ক্রিনে দুটো ভিডিও ফিড ভেসে উঠেছে। প্রথমটা আসছে ফেরিতে রাখা ট্রাকের ভাইজরে লুকানো ক্যামেরা থেকে। দ্বিতীয় ক্যামেরাটা বসানো হয়েছে ট্রাকের কার্গো হোল্ডে।

ড. রেমি হ্যাডলিকে ইন্সট্রাকশনের কাগজ পড়তে দেখল সে। জিয়োলেবের উপর থেকে কাপড়ের ঢাকনা ইতিমধ্যে সরিয়ে

নিয়েছে রানা, এবার দেয়ালের হুক থেকে নামাল পাউচটা। মুখ খুলে ভিতরের সবকিছু ঢালল টেবিলের উপর—ছোট-বড় চোদ্দটা আইটেম... সবগুলোই দু'হাজার বছর আগে তৈরি একটা পাযলের অংশ।

'কী মনে হয়েছে ওর কথাবার্তা শুনে?' গ্যারেটের দিকে ঘাড় ফেরাল রেনফিল্ড। 'ধাঁধাটা সমাধান করতে পারবে?'

'ওর উপর আস্থা আছে আমার,' বলল গ্যারেট নিরাসক্ত গলায়। 'এ-সব ব্যাপারে মাসুদ রানা একটা প্রতিভা। যদি কেউ পারে তো ও-ই পারবে।'

'আর যদি না পারে?'

'তা হলে আর কী?' কাঁধ ঝাঁকাল গ্যারেট। 'নতুন একটা ফেরি দরকার হবে ওয়াশিংটনের।'

জিপিএস ট্র্যাকার চেক করল সে। ঠিকমতই কাজ করছে। পিউজেট প্রণালীর মাঝখানে দেখাচ্ছে ট্রাকের অবস্থান... ওখানেই দেখানোর কথা।

জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল গ্যারেট, রেনফিল্ডের শরীর থেকে ভেসে আসছে দুর্গন্ধ, আর সহ্য করা যাচ্ছে না। বোমা তৈরিতে প্রতিভাবান হলেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে লোকটা স্রেফ একটা খবিসের হদ্দ। নোংরা চেহারা-সুরত... যেভাবে গন্ধ ছড়াচ্ছে, তাতে সন্দেহ হয় গত দশ-পনেরো দিনে একবারও গোসল করেনি ব্যাটা। পারলে লাথ মেরে নামিয়ে দিত গাড়ি থেকে, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। দলে একজন এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট রাখতেই হবে তাকে, গায়ে তার যত দুর্গন্ধই থাকুক না কেন।

টাকা ছড়ালে লোকের অভাব হয় না, কিন্তু যাকে-তাকে ভাড়া করলে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই বেশি। গ্যারেটের দরকার এমন লোক, যে তার সমস্ত আদেশ নির্দ্বিধায় মেনে নেবে, কখনও বেঈমানী করবে না। রেনফিল্ড ঠিক সেই ধরনের লোক। অনেক

খুঁজে পেতে তাকে বের করেছে সে।

প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শেষ করতে পারেনি রেনফিল্ড, তবে বোমা তৈরির ব্যাপারে সহজাত প্রতিভা রয়েছে তার। কলেজে পড়ার সময় কয়েকটা পাইপ-বম্ব ফাটিয়ে গোটা ক্যাম্পাসে আতঙ্কে দৌড়াদৌড়ি ফেলে দিয়েছিল। ফলাফল, কলেজ থেকে বহিষ্কার। জীবনে আর ও-মুখো হয়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষ মামলাও ঠুকেছিল ওর বিরুদ্ধে, কিন্তু ছোট্ট একটা টেকনিক্যালিটির জোরে ছাড়া পেয়ে যায় সে। তবে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে ওতে, ছড়িয়ে পড়েছে রেনফিল্ডের দুর্নাম। ভাল কোনও কাজ আর জোটাতে পারেনি সে। সহজাত দক্ষতা যা ছিল, তাতে একটাই কাজ করতে পেরেছে—দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন খনিতে ডিনামাইট ফাটানোর কাজ। তাতে ধীরে ধীরে বিস্ফোরক সংক্রান্ত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা বেড়েছে তার, কিন্তু টাকা বাড়েনি। গ্যারেটের সঙ্গে পরিচয় হবার আগ পর্যন্ত নিউ ইয়র্কের এক বস্তিতে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল সে।

ইন্টারনেটের সরকার-বিরোধী চ্যাট রুমের মাধ্যমে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে গ্যারেট। জানতে পারে—নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য আমেরিকার সরকার আর সমাজ-ব্যবস্থাকে দায়ী মনে করে রেনফিল্ড। ওটাই ছিল তাকে রিক্রুট করবার সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি। ধীরে ধীরে রেনফিল্ডের আস্থা অর্জন করে নেয় গ্যারেট। নিউ ইয়র্ক থেকে নিজ খরচায় তাকে নিয়ে আসে সিয়াটলে। কী করতে চলেছে, সেটা শোনার পর গ্যারেটের দলে ভিড়ে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি রেনফিল্ড। সারা জীবনের বঞ্চনা-গঞ্জনার প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে সে, তার সঙ্গে উপরি জুটছে দুই মিলিয়ন ডলার! কাজ শেষ হলে ওই পরিমাণ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি করেছে গ্যারেট। তবে তার জানা নেই, প্রতিশ্রুতিটা পূরণ হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

জীবনে দুঃখ-কষ্ট গ্যারেটও যথেষ্ট সয়েছে। চোদ্দ বছর বয়সে এতিম হয়েছে সে। তার আগ পর্যন্ত প্রাচুর্যের মাঝে বড় হচ্ছিল—বখে গিয়েছিল মা-বাবার একমাত্র সন্তান হিসেবে বাড়াবাড়ি রকমের আদর পেয়ে। কী ছিল না ওর? প্রাসাদতুল্য বাড়ি, দামি পোশাক-আশাক, চাকর-বাকর, হাজারো খেলনা... চাইলেই পেয়েছে সবকিছু। পড়ত প্রাইভেট স্কুলে, ছুটি কাটাতে যেত ইয়োরোপ, মধ্যপ্রাচ্য বা ক্যারিবিয়ানে। কিন্তু ভয়াল এক রাতে বদলে গেল সব—গাড়িসহ এক ব্রিজ থেকে পড়ে গেল ওর বাবা। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করল ওর মা। ফলে এক রাতের মধ্যে অনাথ হয়ে গেল গ্যারেট।

ওর বাবার মৃত্যু নিয়ে যথেষ্ট তদন্ত করল পুলিশ, কিন্তু তাতে দুর্ঘটনার কোনও আলামত খুঁজে পেল না। বরং গাড়ির অ্যাকসেলারেটরের উপর গ্যারেটের পিতার আড়ষ্ট হয়ে থাকা পা দেখে মনে হলো, ইচ্ছাকৃতভাবেই গাড়ি নিয়ে ব্রিজ থেকে লাফ দিয়েছিলেন তিনি। ব্যস, আত্মহত্যা বলে রায় দেয়া হলো ঘটনাটার। শুরুতে সেটা গ্যারেট বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু কয়েক বছর পর বুঝতে পেরেছিল—ভুল করেনি পুলিশ।

পেশায় ইনভেস্টমেণ্ট ব্যাঙ্কার ছিলেন গ্যারেটের পিতা। যে-ফার্মে কাজ করতেন, ঘটনার দু'মাস আগে ওরা তাঁকে দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত করেছিল। এতই বদনাম কুড়িয়েছিলেন তিনি, ওয়াল স্ট্রিটের আর কোনও প্রতিষ্ঠান চাকরি দিতে রাজি হয়নি তাঁকে। তার ওপর আদালতে মামলাও ঠুকেছিল পুরনো ফার্মটা, ফলে যে-কোনও মুহূর্তে গ্রেফতার... এমনকী জেল-জরিমানা হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। সন্দেহ নেই, সে-লজ্জা এড়াবার জন্যই আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি।

ভদ্রলোক তো মরে বাঁচলেন, কিন্তু অথৈ সাগরে ফেলে দিয়ে গেলেন ছেলেকে। কয়েক মাস পরেই দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত

হলো, ফলে তাঁর সমস্ত সহায়-সম্পদ ক্রোক করল আদালত। পথের ফকির হয়ে গেল গ্যারেট, ঠাঁই পেল ফস্টার হোমে। সেখানেই আজে-বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে ধীরে ধীরে অপরাধীতে পরিণত হলো সে। শুরুটা হয়েছিল ছোটখাট চুরি-চামারি দিয়ে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অপরাধের প্রকৃতি গুরুতর হতে থাকল। একবার মাত্র ধরা পড়েছিল সে, জুয়েলারি চুরির সময় আচমকা ফিরে এসেছিল বাড়ির মালিক। ফলাফল, ছয় মাসের কারাদণ্ড। সেই অভিজ্ঞতা তাকে করে তুলেছে বহুগুণ সতর্ক। আর কোনোদিন ভুল করেনি সে।

আস্তে আস্তে নিজের কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছে গ্যারেট। চুরি-ডাকাতি থেকে শুরু করে কিডন্যাপিং, মানুষ খুন... সবই আয়ত্ত করে নিয়েছে। নিজস্ব কোনও দল নেই তার, প্রতিটা কাজের সময় নিত্য-নতুন টিম গঠন করে নেয়। বাছাই করে এমন সব সদস্য, যাদেরকে ইচ্ছেমত নাচানো যাবে... কাজ শেষে প্রয়োজনে খতম করে দেয়া যাবে। সোজা কথায় এমন লোক, যার কাছ থেকে তার পরিচয় কিছুতেই ফাঁস হবে না। অনবদ্য এই কৌশল খাটানোর ফলে আজও সে আইনের নাগালের বাইরে। পুলিশ, এফবিআই, বা ইন্টারপোলের কাছে ওর নামে কোনও ফাইলই নেই! দুর্ধর্ষ এক ক্রিমিনাল হবার পরেও আণ্ডারওয়ার্ল্ডে অ্যান্থনি গ্যারেট স্রেফ একটা ভূত। তার অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না কেউ।

নিখুঁত অপরাধ সংঘটনের পিছনে গ্যারেট একটা প্রতিভা হলেও ছোট্ট এক দুর্বলতা রয়েছে তার। বড্ড খরুচে স্বভাবের লোক সে, বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত। শখ আর নেশার পিছনে উড়িয়ে দেয় সমস্ত টাকা। ফলে প্রচুর আয় হওয়া সত্ত্বেও জমে না কিছুই। বেশ কয়েকবার রিটায়ার করবার কথা ভেবেছিল, কিন্তু টাকা-পয়সার চিন্তায় করতে পারেনি। যতদিন না এমন কোনও

দাঁও মারতে পারছে, যার আয় দেদারসে খরচ করবার পরেও শেষ করা সম্ভব নয়, ততদিন রিটায়ার করাও সম্ভব নয় তার পক্ষে। আর তার একটাই অর্থ, রাজার ভাণ্ডার লুঠ করতে হবে তাকে।

অমন কোনও ঐশ্বর্য দুনিয়ায় আছে বলে ভাবেনি গ্যারেট, কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো—বছরখানেক আগে সত্যি সত্যি অমন এক ভাণ্ডারের খোঁজ পেয়েছে সে... পেয়েছে সেই ঐশ্বর্য হাতে পাবার সূত্র। লণ্ডনের অকশন হাউস থেকে চুরি করা সেই কোডেক্সে রয়েছে সূত্রটা। যদি সফল হতে পারে, দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী মানুষে পরিণত হবে সে। আর কোনোদিন ভাল-মন্দ কোনও কাজ করতে হবে না। সমস্যা হলো, কোডেক্সের পাঠোদ্ধার করবার ক্ষমতা নেই তার। তার জন্য দরকার সম্পূর্ণ আলাদা টাইপের মানুষ। ল্যাপটপের স্ক্রিনে ভেসে থাকা মাসুদ রানা আর রেমি হ্যাডলির দিকে তাকাল গ্যারেট। ওরাই কি সেই মানুষ? খুব শীঘ্রি জানা যাবে সেটা।

কোলের উপর রাখা ব্যাকপ্যাকের উপর হাত বোলাল গ্যারেট, ভিতরে রয়েছে আর্কিমিডিসের কোডেক্স। জিনিসটা কক্ষনো হাতছাড়া করে না সে। রেনফিল্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'কদ্দূর এগোল ওরা?'

'বেশি না,' ড্যাশবোর্ডের উপর রাখা ডোনাটের বাক্স থেকে একটা ডোনাট তুলে নিল রেনফিল্ড। কামড় বসাল ওটায়। 'স্টামাচিয়োনটা নিয়ে সমস্যায় পড়েছে বোধহয়।'

'স্টামাচিয়োন না, উচ্চারণটা হবে স্টোমাকিয়োন,' বিরক্ত গলায় বলল গ্যারেট। 'এনিওয়ে, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এখনও সময় আছে ওদের হাতে।'

'বারো মিনিট,' ঘড়ি দেখে বলল রেনফিল্ড। 'তাড়াতাড়ি হাত না চালালে বিপদে পড়বে।'

'দেখাই যাক।'

স্ক্রিনে পায্‌লের টুকরো আর ইন্সট্রাকশন নিয়ে ব্যস্ত দেখাচ্ছে রানা আর রেমিকে। আঁকাবাঁকা এবং ছোটবড় আকারের মোট চোদ্দটা টুকরো রয়েছে ওদের সামনে—এগারোটা ত্রিভুজ, একটা চতুর্ভুজ আর দুটো পঞ্চভুজ আকৃতির। ঠিকমত সাজানো হলে ওগুলো দিয়ে নিখুঁত একটা বর্গক্ষেত্র বানানো সম্ভব। এই পায্‌লকেই স্টোমাকিয়োন বলে। গ্যারেটের রিসার্চ বলছে, পায্‌লটার আবিষ্কর্তা স্বয়ং আর্কিমিডিস। কী যেন এক ম্যাথমেটিকাল নিয়ম প্রমাণ করা সম্ভব ওটা দিয়ে। কোডেক্সের ভিতরে ওই স্টোমাকিয়োনের ছবি আছে, সেই অনুসারেই বানানো হয়েছে টুকরোগুলো। আসলে স্টোমাকিয়োনটা একটা কোড। প্রতিটি টুকরো গ্রিক লেখায় ভরা।

সমস্যা হলো, প্রাচীন ধাঁধাটা সমাধান করতে পারেনি গ্যারেট। কোডেক্স থেকে এটুকু বুঝেছে—স্টোমাকিয়োনের লেখাগুলোর সঙ্গে জিয়োলেবের কাঁটায় খোদাই করা রাশিচক্রের সম্পর্ক আছে। ঠিকমত যদি ধাঁধার সমাধান করা যায়, তা হলে জিয়োলেবটা ব্যবহারের উপায় জানা যাবে। ওটাই রাজা মাইডাসের গুপ্তধন উদ্ধারের চাবিকাঠি। আর সেটা করবার জন্য মাত্র পাঁচদিন সময় গ্যারেটের হাতে। এ-কাজে মাসুদ রানা ও রেমি হ্যাডলিই তার একমাত্র ভরসা।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে টোকা দিয়ে গ্যারেটের মনোযোগ আকর্ষণ করল রেনফিল্ড। নয় মিনিটে নেমে এসেছে কাউণ্টডাউন।

'ওরা বোধহয় পারবে না,' বলল সে।

'না পারাটাই স্বাভাবিক,' মন্তব্য করল গ্যারেট। 'আর্কিমিডিস অত্যন্ত ধূর্ত লোক ছিল। ধাঁধাটার সমাধান তো আর একটা নয়... অনেকগুলো।'

অবাক চোখে তার দিকে তাকাল রেনফিল্ড। 'ক'টা?'

হাসল গ্যারেট। 'সতেরো হাজারেরও বেশি!'

নয়

তীক্ষ্ণ চোখে আর্কিমিডিসের পায্‌লের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, বোঝার চেষ্টা করছে এর ভিতর কোনও প্যাটার্ন আছে কি না। কিন্তু পাচ্ছে না। ও জানে, সতেরো হাজারের বেশি সমাধান আছে এর; কিন্তু ওদের জিয়োলেবের বেলায় প্রযোজ্য হবে মাত্র একটা। সেটাই খুঁজে বের করতে হবে ওকে।

স্টোমাকিয়োনের চোদ্দটা পিসের প্রতিটা কোনায় একটা করে গ্রিক সংখ্যা খোদাই করা আছে। যে-পাশে সংখ্যা, তার অন্যপিঠে রয়েছে একটা করে গ্রিক শব্দ। পায্‌লটা সমাধান করা গেলে জানা যাবে কীভাবে ব্যবহার করতে হয় জিয়োলেবটা। কিন্তু ঠিকমত সাজানো না হলে অর্থহীন হয়ে পড়বে ধাঁধার জবাব।

লিখিত ইন্সট্রাকশন বলছে, জিয়োলেবের সামনে-পিছনের সবগুলো কাঁটা যদি ক্লক ফেসের বারোটার পজিশনে আনা হয়, বন্ধ হয়ে যাবে বোমার টাইমার। সমস্যা হলো, নবের সাহায্যে ঘোরাতে হয় কাঁটাগুলো... আর সেটার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট কৌশল। নব ঘোরালে একসঙ্গে ঘোরে কাঁটা-তিনটে—ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে। ঠিক কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করলে সবগুলোকে বারোটার পজিশনে আনা যাবে, তা অনুমান করা সম্ভব নয়। ডিভাইসটার ভিতরে মোট সাতচল্লিশটা গিয়ার... অর্থাৎ, খাঁজকাটা চাকা আছে, তারমানে সম্ভাব্য কম্বিনেশনের সংখ্যা কোটির কাছাকাছি। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে লাভ নেই, ধাঁধার সমাধান করতেই হবে

ওদেরকে।

'আট মিনিট,' টাইমারের দিকে তাকিয়ে বলল রেমি। গলা কাঁপছে ওর।

কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না রানার মাঝে। আগের মতই এক দৃষ্টিতে স্টোমাকিয়োনের পিসগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ও।

'কী হলো? জমে গেলেন নাকি?' বলল রেমি।

'না। মাথা ঘামাচ্ছি,' রানা জানাল। 'আপনি কিছু পেলেন?'

'পুরো জিনিসটা পানিতে ফেলে দিলে কেমন হয়?'

'সম্ভব নয়। আমাদেরকে চোখে চোখে রাখা হয়েছে।'

'কীভাবে? আমরা ছাড়া আর তো কেউ নেই এখানে। বোমা ফাটার সম্ভাবনা আছে... এ-অবস্থায় ওরা ফেরিতে চড়েছে বলেও মনে হয় না।'

'খুঁজে দেখার সুযোগ পাইনি, কিন্তু আমার ধারণা লুকানো ক্যামেরা আছে ট্রাকের ভিতর। আমাদেরকে যে-লোক নাচাচ্ছে, সে মোটেই কাঁচা নয়।'

'কে সে? কোনও ধারণা আছে আপনার?'

'ওর নাম অ্যান্থনি গ্যারেট।'

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল রেমির। 'আপনি চেনেন তাকে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জিয়োলেবটা ও-ই আমাকে দেখাতে নিয়ে এসেছিল।'

'দুনিয়ায় এত লোক থাকতে আপনার কাছে এল কেন?'

'সে এক লম্বা কাহিনি। বেঁচে থাকলে নাহয় শোনাব আপনাকে কোনওদিন।'

'না, এখুনি শুনতে চাই। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও ব্যাপার আছে।'

ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। মাত্র সাত মিনিট বাকি। অথচ

রেমি নাছোড়বান্দা। অগত্যা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'গ্যারেট ভেবেছিল জিয়োলেবটা কীভাবে অপারেট করতে হয়, ভিতরের কলকজা খুলে সেটা বের করতে পারব আমি।'

'পারেননি?'

'নাহ্। পারলে কি আর দাঁড়িয়ে আছি খামোকা? যন্ত্রটা পুরোপুরি খুলে ফেলেছিলাম আমি। সমস্ত পার্টস্ আলাদা করে দেখেছি। কিন্তু কৌশলটা ধরতে পারিনি। জিনিসটাকে এক ধরনের রুবিকস্ কিউব বলতে পারেন। সঠিক কৌশল জানা না থাকলে যতই ঘোরান, কিছুতেই মেলাতে পারবেন না।'

'জাস্ট আ মিনিট। এই পায্‌লটা তখন কোথায় ছিল? তখনই এটা সমাধান করবার চেষ্টা করেননি কেন?'

'আমাকে পায্‌লটা দেখায়নি গ্যারেট। দেখাবার সময়ই পায়নি আসলে। আমি ব্যস্ত মানুষ, জিয়োলেবের পিছনে নষ্ট করবার মত সময় ছিল না হাতে। গ্যারেটকে সে-কথা বলে বিদায় করে দিয়েছিলাম। সত্যি বলতে কী... লোকটাকে আমার একদমই পছন্দ হচ্ছিল না।'

আঁতকে উঠল রেমি। 'হায় যিশু! তা হলে তো আপনিই এ-সবের জন্য দায়ী! সোজা পথে আপনাকে রাজি করাতে পারেনি গ্যারেট, তাই প্যাঁচের ভিতর ফেলে বাধ্য করছে জিয়োলেবের রহস্য ভেদ করতে!'

'এখন আর সে-কথা ভেবে কপাল চাপড়ে লাভ কী?' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'মোদ্দা কথা হলো, রহস্যটা ভেদ করতে হবে; আর সেটা...' টাইমারের দিকে তাকাল ও, '...আগামী ছ'মিনিটের মধ্যে।'

'এ কি আদৌ সম্ভব?' হতাশ গলায় বলল রেমি।

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল রানা। 'আপনাকে এখানে পাঠিয়েছে কেন গ্যারেট? নিশ্চয়ই ভেবেছে আপনার সাহায্য

প্রয়োজন হবে আমার। কিছু একটা করুন!'

'কীভাবে কী করব? জীবনে এই প্রথম জিয়োলেব দেখছি।'

'কিন্তু প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার উপরে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ। ওদের পায়ল সম্পর্কে কী জানেন?'

'এটুকুই যে, ওরা স্টেগানোগ্রাফির আবিষ্কর্তা।'

স্টেগানোগ্রাফি সম্পর্কে শুনেছে রানা—প্লেইন সাইট... অর্থাৎ চোখের সামনে মেসেজ লুকিয়ে রাখার কৌশল... ঠিক যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চিঠির স্ট্যাম্পের পিছনে মাইক্রোডট সেঁটে জরুরি তথ্য আদান-প্রদান করা হতো। আজও ব্যবহার করা হয় এই কৌশল—খবরের কাগজের নির্দোষ বিজ্ঞাপন, কিংবা ইন্টারনেটে পোস্ট করা ছবি বা ভিডিও-র মাধ্যমে। মেসেজ জায়গামতই থাকে; কিন্তু ওটা কোথায় আছে বা কীভাবে পড়তে হবে, তা না জানলে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়।

'প্লিজ, আরেকটু ক্লিয়ার করুন,' বলল ও। 'পুরনো আমলে স্টেগানোগ্রাফির মেথড কেমন ছিল?'

'আড়াই হাজার বছর আগে স্টেগানোগ্রাফি আবিষ্কার করে গ্রিকরা,' বলল রেমি। 'সহজ একটা উপায় ছিল উল্কি। মেসেঞ্জারের মাথা কামিয়ে উল্কির মাধ্যমে লিখে দেয়া হতো মেসেজ। চুল বড় করে সেই উল্কি ঢেকে ফেলত মেসেঞ্জার। গন্তব্যে পৌঁছুনোর পর আবার কামাত মাথা। ওয়াক্স ট্যাবলেট... মানে, মোমের ফলকেও মেসেজ লুকানো হতো।'

'কীভাবে?'

'দুই পরত মোম ব্যবহার করা হতো ট্যাবলেটে। তলার পরতে গোপন মেসেজ লিখে ঢেকে দেয়া হতো দ্বিতীয় পরত দিয়ে। সেটায় লেখা হতো গুরুত্বহীন তথ্য। জায়গামত পৌঁছুনোর পর উপরের লেয়ারটা চেঁছে নিলেই হলো।'

'তারমানে কোনও কোড ব্যবহার করত না ওরা? শুধু কী

খুঁজতে হবে, তা জানা থাকলেই হয়?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'তা হলে ধরে নিতে হয়, এখানেও সব চোখের সামনেই আছে,' স্টোমাকিয়োনের পিসগুলোর উপর দৃষ্টি ফেরাল রানা। 'কিন্তু কী খুঁজতে হবে, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'পায্‌লের পুরোটা হয়তো দেখছি না আমরা,' বলল রেমি। 'জিয়োলেবটাও তো এর একটা অংশ... মানে ওটার ভিতর-বাইরের সব পার্টস। ডিভাইসটা তো খুলেছিলেন আপনি। ভিতরে কী দেখেছেন মনে করার চেষ্টা করুন।'

'খুব বেশি কিছু না। সাতচল্লিশটা গিয়ার দেখেছি জিয়োলেবের ভিতরে।'

মনে মনে কী যেন হিসেব করল রেমি। তারপর উত্তেজিত গলায় বলল, 'পিসগুলোর কোনা! এগারোটা ত্রিভুজ, একটা চতুর্ভুজ, আর দুটো পঞ্চভুজ... সব মিলিয়ে সাতচল্লিশটা কোনা আছে পিসগুলোয়!'

চমকে উঠল রানা। তাই তো! আরও আগে খেয়াল করেনি কেন ব্যাপারটা? তাড়াতাড়ি বলল, 'কোনায় লেখা নম্বরগুলো পড়ুন। ওগুলোই আমাদের ক্লু।'

দুটো পিস হাতে তুলে নিল রেমি। 'চব্বিশ, সাতান্ন, চার, বত্রিশ, সতেরো...'

'দাঁড়ান। কত কত বললেন? চব্বিশ, সাতান্ন আর বত্রিশ?'

'চার আর সতেরোও আছে। কিছু বুঝতে পারলেন?'

চোখ বন্ধ করে একটু ভাবল রানা। হঠাৎ মাথার ভিতরে যেন জ্বলে উঠল হাজার ওয়াটের বাতি! ঝট্‌ করে রেমির দিকে ফিরল ও। 'জলদি! কোনোটার কোনায় সাঁইত্রিশ লেখা আছে কি না দেখুন!'

পাগলের মত স্টোমাকিয়োনের পিসগুলো ঘাঁটল রেমি।

কয়েক সেকেণ্ড পর তুলে ধরল একটা ত্রিভুজ। 'পেয়েছি!'

'দিন ওটা। যেটায় চব্বিশ লেখা আছে, ওটাও লাগবে।'

পাশাপাশি পিসদুটো বসাল রানা। এক লাইনে চলে এল সংখ্যাদুটো।

'কী হলো?' উৎকণ্ঠিত গলায় জানতে চাইল রেমি। 'মিলিয়ে ফেলেছেন?'

'আমার অনুমানে যদি ভুল না হয়ে থাকে... হ্যাঁ,' বলল রানা। 'জিয়োলেবের গিয়ারগুলোর অ্যারেঞ্জমেন্ট স্মরণ করছিলাম। সাঁইত্রিশ দাঁতের একটা গিয়ার ছিল ওতে, সেটার গায়ে মিশেছিল চব্বিশ দাঁতের আরেকটা। এভাবেই মেলাতে হবে ধাঁধাটা। গিয়ারের অ্যারেঞ্জমেন্টের সঙ্গে মিলিয়ে বসাতে হবে স্টোমাকিয়োনের পিসগুলো।'

'আর বাড়তি সংখ্যাগুলো?'

'ওগুলো লেখা হয়েছে মানুষকে বোকা বানাবার জন্য। দেরি করবেন না, আমি সংখ্যা বলছি... আপনি পিসগুলো দিন। হাতে কিন্তু মাত্র চার মিনিট সময়।'

দ্রুত সংখ্যা বলে গেল রানা, সেই অনুযায়ী একে একে বাকি তেরোটা পিস এগিয়ে দিল রেমি। ও যখন ওগুলো সাজাচ্ছে, রেমি জানতে চাইল, 'কোন্ চাকায় ক'টা দাঁত... ওগুলো কীভাবে সাজানো ছিল... এসব আপনি মনে রেখেছেন কীভাবে?'

'জিয়োলেবটা খুলে আবার রি-অ্যাসেম্বল করতে হয়েছিল আমাকে,' বলল রানা। 'তাই সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। কপাল ভাল, ভুলে যাইনি এখনও।'

এক মিনিটও লাগল না, চোদ্দটা পিস জোড়া দিয়ে নিখুঁত বর্গক্ষেত্র বানিয়ে ফেলল ও। পুরো জিনিসটা উল্টে ফেলল এরপর, যাতে পিছনের সাইডের লেখাগুলো পড়া যায়।

'পড়ুন তাড়াতাড়ি!' তাড়া দিল রানা। খেয়াল করল,

লেখাগুলো ঘড়ির ডায়ালের মত একটা বৃত্তের আকৃতি পেয়েছে। টাইমারে সময় তখন তিন মিনিট।

'ঠিক আছে, পড়ছি। কিন্তু এসবের কোনও অর্থ তো বুঝতে পারছি না!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রেমি। 'বারোটা এণ্ট্রি দেখতে পাচ্ছি এখানে। এই দেখুন... আলফা লিও, বিটা লিব্রা, আলফা পিসেস, বিটা স্করপিও... মানে কী এসবের?'

'নিশ্চয়ই জিয়োলেবের ডায়ালের রাশিগুলোকে রেফার করছে,' অনুমান করল রানা।

'আলফা আর বিটা বলতে কী বুঝিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'এগুলো,' ডিভাইসের গায়ের নবদুটো দেখাল রানা। 'উপরেরটা আলফা, নীচেরটা বিটা। গায়ে মার্কিং করা আছে।' ওগুলোর গায়ে হাত রাখল ও। 'ডায়াল মেলাবার জন্য সিকোয়েন্স অনুসারে নব ঘোরাতে হবে আমাকে।' ইশারায় বারোটার পজিশনে যে-লেখাটা আছে, সেটা দেখাল। 'এখানে পৌঁছুতে হবে আমাদেরকে। তারমানে এটা আমাদের লাস্ট মুভ। পরেরটাকে এক নম্বর ধরে শুরু করুন।'

'আলফা লিও,' বলল রেমি।

'লিও কোন্‌টা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল রেমি।

প্রথম নবটা ঘোরাল রানা। একসঙ্গে নড়তে শুরু করল সবগুলো কাঁটা। উপরের কাঁটা লিও-তে পৌঁছুলে থামল ও।

'এবার?'

'বিটা লিব্রা।' বলে লিব্রা দেখিয়ে দিল রেমি।

একই পদ্ধতিতে পরের সাতটা চিহ্ন পেরিয়ে এল ওরা। তবে সময় লেগে গেল অনেক। দশ নম্বর যখন শুরু করছে, তখন মিনিটের ঘর শূন্য হয়ে শুধু সেকেণ্ডে পৌঁছে গেছে টাইমারের

কাউন্টডাউন।

'তাড়াতাড়ি হাত চালান! বিটা ক্যানসার,' বলল রেমি।

'আর ক'টা বাকি?' পাগলের মত নব ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুটো। আলফা স্যাজিটারিয়াস।'

উপরের নবে হাত চলে গেল রানার। দ্রুত কাঁটা নিয়ে গেল রেমির দেখানো পজিশনে।

'এটাই শেষ, বিটা অ্যাকোয়ারিয়াস।'

টাইমারের দিকে তাকাল রানা। বুক খামচে ধরল কী যেন। পনেরো সেকেণ্ড!

আঙুলের টনটনানির পরোয়া করল না আর, ঘড়িতে দম দেবার ভঙ্গিতে নীচের নবটা ঘোরাল ও। যেন জাদুমন্ত্রবলে একত্র হলো কাঁটা তিনটে... চলে গেল বারোটার পজিশনে। ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো... সঙ্গে সঙ্গে বিপ বিপ আওয়াজ করল বোমা। ফুলকি দেখা দিল জিয়োলেবের সঙ্গে ওয়ায়্যারের সংযোগস্থলে।

রেমিকে জাপটে ধরে মেঝেতে ঝাঁপ দিল রানা। গড়ান দিয়ে চলে গেল ট্রাকের দরজার কাছে। দু'জনে চোখ বন্ধ করে ফেলল বিস্ফোরণের আশঙ্কায়।

মিনিটখানেক কেটে যাবার পরেও যখন কিছু ঘটল না, চোখ খুলল ওরা। ধীরে ধীরে উঠে বসল। দেখল, চার সেকেণ্ড বাকি থাকতে থেমে গেছে টাইমার।

রানার দিকে চোখ বড় করে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল রেমি 'ইটস্ আনবিলিভেবল, মি. রানা! বোমাটাকে সত্যিই থামিে দিয়েছেন আপনি!'

'হ্যাঁ, থেমেছে; তবে কৃতিত্ব আমার একার নয়,' বলল রানা 'আপনিও এ কৃতিত্বের সমান ভাগীদার, ড. হ্যাডলি।'

হাসি ফুটল রেমির ঠোঁটে। 'এবার বোধহয় ফর্মালিটি ত্যাগ করা যায়। আমাকে শুধু রেমি বলে ডাকলে খুশি হব।'

রানাও হাসল। 'আমাকে শুধু রানা।'

বেরসিকের মত এ-সময় বেজে উঠল ওর সেলফোন। ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে চেহারায় মেঘ জমল ওর। গ্যারেটের নাম্বার। কল রিসিভ করে স্পিকার অন করে দিল, যাতে রেমিও শুনতে পায় লোকটার কথা।

'কংগ্রাচুলেশন্স... মি. রানা অ্যাণ্ড ড. হ্যাডলি!' ভেসে এল গ্যারেটের উল্লসিত কণ্ঠস্বর। 'দারুণ দেখিয়েছ তোমরা...'

'ছেঁদো প্রশংসার প্রয়োজন নেই, গ্যারেট,' কাঠখোট্টা গলায় তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'তোমার কথামত কাজ করেছি আমরা। এবার যেতে পারি?'

এমনভাবে হেসে উঠল গ্যারেট, যেন খুব মজার কোনও রসিকতা করেছে রানা। হাসতে হাসতে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাবে, বন্ধু? খেলা তো কেবল শুরু!'

দশ

খাবারের টেবিলে উঠেছে প্রাণবন্ত আলোচনার ঝড়। আসরের মধ্যমণি হয়ে আছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, তাঁর সঙ্গে জর্জ রেডক্লিফ আর ল্যারি কিং ছাড়াও পেন্টাগনের একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও একজন কর্নেল যোগ দিয়েছেন লাঞ্চের জন্য। কথা হচ্ছে নুমার স্টেট অভ দ্য আর্ট টেকনোলজি নিয়ে।

'যা-ই বলুন, অ্যাডমিরাল,' ওয়েইটার খালি প্লেট নিয়ে গেলে বললেন ব্রিগেডিয়ার কলসন, 'নুমার হাতে যে-ধরনের টেকনোলজি আছে, তা আমাদের সঙ্গে শেয়ার না করে রীতিমত অন্যায় করছেন আপনারা।'

'সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট দিয়ে তোমরা কী করবে?' হালকা গলায় বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ওগুলো শুধু গবেষণার কাজে লাগে। মিলিটারির হয়ে গবেষণার কাজ তো ডারপা আর নুমাই করে দিচ্ছে।'

'আমি সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলছি না... বলছি মিলিটারি অ্যাপ্লিকেশনের কথা। আপনাদের অনেককিছুই আমরা যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহার করতে পারব।'

'যেমন?'

'আপনাদের ওই সুপার-কম্পিউটারের কথাই ধরুন...'

'ভিনাস?' ব্রিগেডিয়ারকে বাধা দিয়ে বলে উঠল ল্যারি কিং। 'দুঃখিত, স্যর। পুরো নুমাকে চালাচ্ছে ও। পেন্টাগনের হাতে ওকে তুলে দিলে আমরা খোঁড়া হয়ে যাব। আর যদি অমন আরেকটা কম্পিউটার বানিয়ে দিতে বলেন, সেটাও সম্ভব নয়। শি ইজ ওয়ান অভ আ কাইণ্ড। দশ বছরের বেশি লেগেছে আমার ওকে বর্তমান অবস্থায় আনতে। চট করে তার রেপ্লিকেশন সম্ভব নয়।'

'দুনিয়ায় অসম্ভব বলে কিছু নেই,' বিরক্ত গলায় বললেন কলসন। 'আসল কথা আপনাদের সদিচ্ছার অভাব।'

'এটা ভুল কথা,' বললেন হ্যামিলটন। 'নিজেদেরকে ধোয়া তুলসীপাতা ভাবছ তোমরা। কিন্তু আমরা তো জানি, যার-তার হাতে ভিনাসকে তুলে দেয়া হলে ওটার অপব্যবহার হবে। শত্রুদের উপর তো বটেই... খোদ আমেরিকানদের উপরও স্পাইং করবে তোমরা ভিনাসের সাহায্যে। এমনিতেই করছ। এ-নিয়ে জনসাধারণ যথেষ্ট খেপা।'

'বেশ, কম্পিউটারের কথা তা হলে বাদই দিলাম,' গোমড়ামুখে বললেন ব্রিগেডিয়ার। 'আণ্ডার-সি টেকনোলজির দিক থেকেও তো অনেক এগিয়ে আছেন আপনারা। ডিপ ডাইভিং সাবমারসিবল, গ্রাউণ্ড পেনিট্রেটিং রেইডার, লং রেঞ্জ সোনার... এসব কি নেভির সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন না?'

'ওগুলোর কোনোটাই নুমার একার সম্পত্তি নয়,' বললেন হ্যামিলটন। 'তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, আমাদের বেশিরভাগ টেকনোলজিই দেশ-বিদেশের হাজারো প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টার ফলে তৈরি হয়েছে। ওঁদের আবিষ্কার সামরিক কাজে ব্যবহার করা হবে না, এমন শর্তের ভিত্তিতেই ওঁরা নুমাকে সাহায্য করেছেন। জেনে-শুনে তো আমরা কথার বরখেলাপ করতে পারি না।'

'ওসব নীতিকথা আজকের জামানায় অচল, অ্যাডমিরাল। তা ছাড়া নুমার সবকিছু আমেরিকান সরকারের সম্পত্তি। আমরা যদি জোর খাটাই, আইনগতভাবে আপনি বাধা দিতে পারবেন না।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারো,' মৃদু হেসে বললেন হ্যামিলটন। 'ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

'প্রেসিডেন্টের সাপোর্ট আছে বলে এমন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়তে পারছেন,' মুখ বাঁকা করলেন কলসন। 'কিন্তু অ্যাডমিরাল, যে-দিন আপনার মতাদর্শে বিশ্বাস করেন না, এমন প্রেসিডেন্ট বসবেন ওভাল অফিসে, কী করতে পারবেন আপনি?'

'হয়তো কিছুই নয়। কিন্তু তার আগ পর্যন্ত নিজের নীতিতে অবিচল থাকব আমি।' শান্ত গলায় জানিয়ে দিলেন হ্যামিলটন।

পরিবেশ থমথমে হয়ে উঠল। অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করল সবাই। যেন তা থেকে ওঁদেরকে মুক্তি দেবার জন্যই উদয় হলো একজন ওয়েইটার। নুমা চিফের দিকে ঝুঁকে সে বলল, 'এক্সকিউজ মি, স্যর। এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে

চান। ব্যাপারটা নাকি জরুরি।'

রেস্টুরেন্টের ডোরওয়ের দিকে ইশারা করল সে। ঘাড় ফেরাতে নিভাঁজ ইউনিফর্ম পরা একজন আর্মি অফিসারকে দেখতে পেলেন অ্যাডমিরাল।

'আমাকে একটু উঠতে হয়, কলসন।'

'প্লিজ, অ্যাডমিরাল।'

লম্বা লম্বা কদম ফেলে দরজার কাছে চলে গেলেন হ্যামিলটন। তাকালেন অপেক্ষমাণ অফিসারের দিকে। ত্রিশের কাছাকাছি বয়স, রুক্ষ চেহারা। কাঁধে ক্যাপ্টেনের র‍্যাঙ্ক। বুকের বামপাশে নানা রঙের রিবন, আর ডানপাশে নেমপ্লেট... তাতে লেখা: পারকার। আগে কখনও এই অফিসারকে দেখেননি তিনি।

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন? কী ব্যাপার?'

অ্যাডমিরালকে স্যালিউট ঠুকল ক্যাপ্টেন। বলল, 'মাফ করবেন, অ্যাডমিরাল। তবে আমার উপর নির্দেশ আছে, আপনাকে এখুনি জয়েন্ট ফোর্সেস হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে হবে। কী যেন একটা সিচুয়েশন দেখা দিয়েছে... আপনার পরামর্শ দরকার।'

'এখুনি?' ভুরু কোঁচকালেন হ্যামিলটন।

'ইট'স্ আর্জেন্ট, স্যর।'

'কী হয়েছে, বলো তো!'

'আমাকে বিস্তারিত জানানো হয়নি, স্যর। শুধু আপনাকে এসকর্ট করে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।'

'এত জরুরি হলে সরাসরি আমাকেই ফোন করল না কেন?' বিড় বিড় করলেন হ্যামিলটন। 'কে আছে ওখানে?'

'জেনারেল হোগান, স্যর।'

জেনারেল রবার্ট হোগানকে চেনেন অ্যাডমিরাল। ভুরু কোঁচকালেন, 'বব হঠাৎ এমন খেপে গেল কেন?'

'নো আইডিয়া, স্যর। কিন্তু আমাদের এখুনি রওনা হওয়া দরকার।'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন। এক মিনিট সময় দাও আমাকে।'

ব্রিফকেস আনার জন্য টেবিলে ফিরে গেলেন তিনি। সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন, 'সরি, জেন্টলমেন। জয়েন্ট ফোর্সেস হেডকোয়ার্টারে যেতে হচ্ছে আমাকে। পরে আবার নাহয় কথা হবে, কেমন?'

'শিয়োর, অ্যাডমিরাল।'

সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে ফিরে এলেন হ্যামিলটন। 'চলো, যাওয়া যাক।'

অ্যাডমিরালকে নিয়ে এলিভেটরে উঠল ক্যাপ্টেন। হোটেলের একজন স্টাফও উঠল তাঁদের সঙ্গে, গায়ে শেরাটনের আকাশি রঙের ব্লেজার। তার উদ্দেশে ক্যাপ্টেন বলল, 'পার্কিং লেভেল, প্লিজ।'

বাটন টিপল হোটেলের লোকটা। দরজা বন্ধ হয়ে ধীর গতিতে নীচে নামতে শুরু করল এলিভেটর। দরজাটা পালিশ করা চকচকে পিতলের... আয়নার মত কাজ করছে। ওটায় ক্যাপ্টেনের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়েই স্থির হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। লোকটাকে দেখামাত্র মন খুঁত খুঁত করছিল। এখন বুঝতে পারছেন তার কারণ।

ক্যাপ্টেনের বুকে সাঁটা রিবনগুলোই সন্দেহের উদ্রেক ঘটিয়েছে তাঁর মনে। সার্ভিসের দৈর্ঘ্য কম নয় তাঁর, প্রচলিত সমস্ত মেডেল চেনেন। কোন্ মেডেলের সঙ্গে কোন্ রিবন থাকে, সেটাও খুব ভাল করে জানেন। এ-মুহূর্তে মস্ত বড় এক খুঁত দেখতে পাচ্ছেন তিনি সঙ্গীর বুকে।

বড় করে শ্বাস নিলেন অ্যাডমিরাল, তারপর ধীরে ধীরে

ঘুরলেন ক্যাপ্টেনের দিকে। কঠিন হয়ে উঠেছে চেহারা। সরাসরি প্রশ্ন করলেন, 'কে তুমি?'

'এক্সকিউজ মি, স্যর?' থতমত খেয়ে গেল ক্যাপ্টেন।

'আর্মি অফিসার নও তুমি, হতে পারো না। কারণ তুমি জানো না, এই রিবন পরার জন্য কমপক্ষে চল্লিশ বছর আগে জন্ম নেয়া দরকার ছিল তোমার।' লোকটার বুকে সাঁটা একটা রিবন স্পর্শ করলেন হ্যামিলটন।

'আ... আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, অ্যাডমিরাল।'

'এটা ভিয়েতনাম সার্ভিস মেডেলের রিবন, গাধা! সত্তরের দশকের পরে এই মেডেল পায়নি কেউ।' গমগম করে উঠল হ্যামিলটনের গলা। 'ইউনিফর্মটা কোত্থেকে জোগাড় করেছ?'

নার্ভাস হয়ে যাবার কথা, কিন্তু হলো না ভুয়া ক্যাপ্টেনরূপী বেনসন। তার বদলে হাসল। 'আপনার নজর বড়ই চোখা, অ্যাডমিরাল। কিন্তু ধাপ্পাটা ধরতে একটু দেরি করে ফেলেছেন।' এলিভেটরের তৃতীয় আরোহীর দিকে তাকিয়ে মৃদু মাথা ঝোঁকাল সে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল ধরতে পারলেন হ্যামিলটন। লোকটাকে সত্যি সত্যি হোটেলের স্টাফ ভেবেছিলেন তিনি, সেজন্যেই সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন ভুয়া ক্যাপ্টেনকে। ভেবেছিলেন সাক্ষীর সামনে কিছু করবার সাহস পাবে না প্রতিপক্ষ। কিন্তু আসলে তা নয়। দ্বিতীয় লোকটাও একই দলের! ক্যাপ্টেনের কথাই ঠিক—দেরি করে ফেলেছেন তিনি।

ভাবনাটা শেষ হবার আগেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন অ্যাডমিরাল। শরীরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল ত্রিশ হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহ। যন্ত্রটার নাম টেযার। সরাসরি তাঁর ঘাড়ে ঠেকিয়ে বোতাম চেপেছে কাটনার। দুনিয়া দুলে উঠল অ্যাডমিরালের চোখের সামনে। হাঁটু মুড়ে এলিভেটরের মেঝেতে পড়ে গেলেন তিনি।

এগারো

ব্রেমারটনের ডকে এসে ভিড়েছে ফেরি। ভেহিকল র‍্যাম্প নামছে ধীরে ধীরে, তবে তার আগেই পিয়ার স্পর্শ করল গ্যাঙওয়ে। যে-সব যাত্রীর গাড়ি নেই, তারা পিল পিল করে নামতে শুরু করল সেই গ্যাঙওয়ে ধরে।

ভিড় ঠেলে ফেরিতে উঠবার চেষ্টা করছে ববি মুরল্যাণ্ড। হাতে সময় কম, ভেহিকল র‍্যাম্প বেশিক্ষণ নামানো থাকে না, তার মাঝেই রানার গাড়িতে পৌঁছুতে হবে ওকে। ড্রাইভ করে নামিয়ে আনতে হবে ফেরি থেকে। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে খুঁজে বের করতে হবে *সিলভারলেক ট্রান্সপোর্ট* লেখা একটা ট্রাক। অপরিচিত এক লোকের কাছ থেকে অদ্ভুত এই নির্দেশ পেয়েছে ও কিছুক্ষণ আগে... কথা না শুনলে বন্ধু মাসুদ রানার মাথার উপর মহা বিপদ নেমে আসবে বলে থ্রেট দিয়েছে লোকটা। কোন্ রঙের কী গাড়ি, ইগনিশনের চাবি কোথায় পাওয়া যাবে, সব এমন নির্ভুল ও নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে যে বুঝে নিয়েছে ববি, ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। তাই কোনোরকম প্রশ্ন তোলেনি, একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এসেছে ডকে।

ছোটখাট মানুষ মুরল্যাণ্ড, বেঁটেই বলা যায়, তবে সৃষ্টিকর্তা উচ্চতার ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছেন শরীরভর্তি পেশি আর অমানুষিক শক্তি দিয়ে। মুখটা প্রায় গোল, কালো কোঁকড়া চুল ঘিরে রেখেছে সেটাকে; যখন হাসছে না তখনও ঠোঁটের কোণ

সামান্য বাঁকা হয়ে থাকে, যেন দুনিয়ার সমস্ত ব্যাপারেই কৌতুক বোধ না করে পারে না সে। নাকটা এমন খাড়া, দেখে মনে হবে তার পূর্বপুরুষেরা রোমান ছিলেন। নুমায় একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু এখন পৃথিবীতে তার সবচেয়ে বড় বন্ধু রানা, আর বন্ধুর জন্য পারে না এমন কোনও কাজ তার অভিধানে নেই।

নামতে থাকা যাত্রীদের ঠেলা-ধাক্কা খেয়ে এবং দিয়ে এগিয়ে চলল মুরল্যাণ্ড, স্রোতের উল্টোদিকে গেলে যা হয়। কানে ভেসে এল বিরক্তিসূচক নানা রকম মন্তব্য। কিন্তু তাতে ভ্রূক্ষেপ করল না ও। বরং আরও সেঁধিয়ে যাবার চেষ্টা করল ভিড়ের ভিতর। সঙ্গে টিকেট নেই, ফেরির স্টাফদের সামনে পড়লে ঝামেলা হতে পারে।

সতর্কতায় কাজ হলো না, ডেকে পা রেখে দশ ফুট এগোতে না এগোতে হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল ইউনিফর্ম-পরা এক গার্ড।

'অ্যাই, অ্যাই! করছেন কী! বোর্ডিং এখনও শুরু হয়নি।'

নিচুস্বরে ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিয়ে তার দিকে ফিরল মুরল্যাণ্ড। অবশ্য অবাক হয়নি, অমন গাঁট্টাগোট্টা শরীর নিয়ে কারও চোখ ফাঁকি দেয়া মুশকিল।

'হাই!' পরিস্থিতি সামলাবার জন্য ভুবনভোলানো হাসি হাসল সে। 'সিয়াটলে যাচ্ছি না আমি। ওখান থেকেই এলাম এইমাত্র। ভুলে আমার ব্যাগটা সিটের উপর ফেলে গেছি।'

হাসিতে কাজ হলো না। ভুরু কোঁচকাল গার্ড। বলল, 'কই, আপনাকে নামতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'বোধহয় ব্যস্ত ছিলে...'

'ডকে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্যাঙওয়েতে এসেছি আমি,' কড়া গলায় বলল লোকটা।

'আরে বাবা, এত লোকের ভিড়ে নির্দিষ্ট কারও কথা কি মনে

রাখা যায়? তর্ক ছাড়ো তো! যেতে দাও আমাকে।'

সন্দেহ বাড়ল গার্ডের চোখে। 'আপনার ব্যাগের বর্ণনা দিন। কাউকে পাঠিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি।'

'দরকার নেই,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'খামোকা খোঁজাখুজি করবে... তাতে সময় নষ্ট হবে। কোথায় রেখেছি, তা তো জানিই। এক দৌড়ে নিয়ে আসব।'

'তা হলে আপনার টিকেট দেখান,' গার্ড নাছোড়বান্দা।

পকেট হাতড়াবার ভান করল মুরল্যাণ্ড। 'এই রে! টিকেট বোধহয় ব্যাগের ভিতরেই ফেলে এসেছি।'

'দুঃখিত, টিকেট না-দেখে আপনাকে ছাড়তে পারব না আমি,' বলল গার্ড। 'নিয়ম-কানুন আজকাল খুব কড়া।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুরল্যাণ্ড। একটাই উপায় এখন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠোর মধ্যে একশো ডলারের একটা নোট ভরল। তারপর মুখে বন্ধুসুলভ হাসি টেনে এনে হ্যাণ্ডশেক করল গার্ডের সঙ্গে। 'একটু দেখো না কী করা যায়!'

বলা বাহুল্য, নোটটা পাচার হয়ে গেছে গার্ডের হাতে। চোরা চোখে টাকার অঙ্ক দেখে নিল সে। একশো ডলার দেখে হাসি ফুটল মুখে। বলল, 'আরে... আপনাদের সেবার জন্যই তো আছি আমরা। যান, যান... কোনও অসুবিধে নেই, আপনার ব্যাগ নিয়ে আসুন।'

মনে মনে ব্যাটাকে গাল দিতে দিতে পা বাড়াল মুরল্যাণ্ড। ঘুষখোর বাঁদর কোথাকার, সুযোগ পেয়েই একশো ডলার খসিয়ে নিল ওর পকেট থেকে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই আবার হাসল ও। রানাকে বলবে দুই শ' ডলার দিতে হয়েছে।

দ্রুত ভেহিকল ডেকে পৌঁছুল মুরল্যাণ্ড। সব গাড়ি নেমে গেছে, রয়েছে শুধু রানারটা। লাল রঙের ডজ ভাইপার। কভারঅল-পরা ফেরির এক ক্রু দাঁড়িয়ে আছে ওটার পাশে।

হাতের ক্লিপপ্যাডে কী যেন টুকছে। তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেল ও।

'এটা আপনার?' মুরল্যাণ্ডকে দেখে বলে উঠল লোকটা। 'এত দেরি কেন? আরেকটু হলেই আমি টো-ট্রাক ডাকতাম।'

'সরি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'কী করব, অসময়ে প্রকৃতি মা-মণি ডেকে বসলেন।'

'যান, যান, তাড়াতাড়ি নামান গাড়ি।'

লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল মুরল্যাণ্ড। গ্লাভ-বক্স খুলে বের করে নিল চাবি। ইঞ্জিন চালু করে মিনিটখানেকের মধ্যে নেমে এল ফেরি থেকে।

ডক থেকে বেরিয়ে রাস্তার দু'পাশে চোখ বোলাতে শুরু করল ও। দু-দুটো ইন্টারসেকশন পেরুনোর পর চোখে পড়ল সিলভারলেক ট্রান্সপোর্টের ট্রাকটা। দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে। ড্রাইভারের জানালার পাশে গিয়ে ব্রেক কষল মুরল্যাণ্ড। পরমুহূর্তে চমকে উঠল।

কাঁচ নেমে গেল ট্রাকের, মাথা বের করল রানা। 'তোমাকেও ফাঁসিয়েছে লোকটা!' ওকে দেখে অবাক হয়েছে রানাও। 'নিশ্চয়ই বলেছে আমার ভয়ানক বিপদ? যাই হোক, এসেছ সেজন্য ধন্যবাদ, ববি,' বলল ও। 'খুব ঝামেলা হয়নি তো?'

'না, না,' মাথা নাড়ল মুরল্যাণ্ড। 'ঝামেলা আর কী... দুই শ' ডলার ঘুষ দিতে হয়েছে আমার। ওটা দিয়ে দিলেই...' রানার পাশে নড়াচড়া লক্ষ করে থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সঙ্গে কে?'

রানার পাশ থেকে উঁকি দিল রেমি। 'হাই! আপনি নিশ্চয়ই মি. ববি মুরল্যাণ্ড? আমি রেমি হ্যাডলি।'

'নাইস টু মিট ইউ,' বলে অভিযোগের দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'সঙ্গে ডেট নিয়ে আসছ... এ-কথা বলেনি তো লোকটা? তাও আবার ট্রাকে? আগে জানলে একটা এক্কাগাড়ি

ম্যানেজ করে দিতাম—ট্রাকের চেয়ে ওটা অনেক-অনেক বেশি রোমাণ্টিক।'

'এক্কাগাড়ি যে লাগবে, তা তো জানতাম না,' হাসিমুখে বলল রানা। 'ফেরিতে ওঠার পর রেমির সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।'

মুখ বাঁকা করল মুরল্যাণ্ড। 'পিউজেট প্রণালীর মাঝখান থেকে বান্ধবী জোগাড় করা একমাত্র তোমাকে দিয়েই সম্ভব!'

'ফাজলামি এবার বন্ধ করো তো, ববি।' সিরিয়াস হলো রানা। 'জরুরি কাজ আছে। ট্রাক থেকে নামতে পারছি না আমি বা রেমি। নতুন নির্দেশ এসেছে, গাড়িটা নিয়ে আমাদের পিছু পিছু আসতে হবে তোমাকে। ঠিক আছে?'

'কী হয়েছে বলো তো!'

'পরে।' ইশারায় বন্ধুকে বুঝিয়ে দিল রানা—ট্রাকে লুকানো ক্যামেরা আর মাইক্রোফোন আছে।

মুরল্যাণ্ডের কপালের ভাঁজ গভীর হলো। মাথা ঝাঁকিয়ে ও বলল, 'ঠিক আছে, আমি পিছনে থাকছি।'

গিয়ার দিয়ে ট্রাককে আগে বাড়াল রানা। বিশ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করল মুরল্যাণ্ড। বৃষ্টির তোড় বেড়েছে, সংকুচিত হয়ে গেছে দৃষ্টিসীমা।

ফোনে ভেসে আসা নির্দেশ অনুসারে পরের আধঘণ্টা গোটা ব্রেমারটন-এর এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে বেড়াল ওরা। এরপর শহরের বাইরে ওদেরকে যেতে বলল গ্যারেট। হাইওয়ে ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর হাতের বাঁয়ে একটা কাঁচা রাস্তা পড়ল, রাস্তার মুখে ভাঙাচোরা একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে—*স্টিভেনসন স্টোনওয়ার্কস্।* ওখানে মোড় নিল রানা। কাঁচা রাস্তা ধরে মিনিট পাঁচেক এগিয়ে একটা বিশাল গর্তের কিনারে গিয়ে থামল—বৃষ্টির পানি জমে গর্তটা পুকুরে পরিণত হয়েছে।

একটু দূরত্ব বজায় রেখে থামল মুরল্যাণ্ডও। রানা আর

রেমিকে ট্রাক থেকে নামতে দেখল। জ্যাকেটের হুড মাথার উপর তুলে দিয়ে সে-ও নেমে পড়ল ভাইপার থেকে। এগোল বন্ধুর দিকে।

রানা আবার ট্রাকের পিছনে উঠে গেছে। ক্যানভাসে মোড়ানো কী যেন একটা নিয়ে নেমে এল কয়েক মুহূর্ত পর। কাছে গিয়ে বলল, 'কী হচ্ছে এসব, এবার জানতে পারি?'

'যেতে যেতে বলব। চলো।' ভাইপারের দিকে পা বাড়াল রানা। ওর পিছু নিল রেমি আর মুরল্যাণ্ড।

ভাইপারের ট্রাঙ্ক খুলে ক্যানভাসে মোড়ানো জিনিসটা রাখল রানা। মুরল্যাণ্ড জিজ্ঞেস করল, 'কী ওটা?'

ক্যানভাসের একটা কোনা সরাল রানা। চকচক করে উঠল ব্রোঞ্জের তৈরি জিয়োলেব। সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটা চিনতে পারল ববি। গ্যারেটের কাছ থেকে পাবার পর ওটা রানা এক রাতের জন্য নিজের কাছে রেখেছিল, তখন দেখেছে ও।

'এটা সেই জিয়োলেবটা না?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আধ-পাগল এক লোক যেটার রহস্য জানার জন্য তোমার পিছনে লেগেছিল?'

'এখনও পিছু ছাড়েনি, ব্যাটা পুরোপুরিই পাগল হয়ে গেছে,' রানা বলল। 'চলো, গাড়িতে উঠে সব খুলে বলব।'

'ড্রাইভ কে করবে? তুমি, না আমি?' ভুরু নাচাল মুরল্যাণ্ড। ভাইপারে মাত্র দুটো সিট, রেমিকে ওদের একজনের কোলে বসতে হবে।

'তুমিই চালাও,' বলল রানা। 'এত অল্প পরিচয়ে কোনও ভদ্রমহিলা তোমার কোলে বসতে চাইবে বলে মনে হয় না।'

'তোমার সঙ্গে পরিচয় আবার গাঢ় হলো কখন?' বাঁকা সুরে বলল মুরল্যাণ্ড। জবাবের প্রতীক্ষা না করে উঠে পড়ল ড্রাইভিং সিটে।

'চলো,' রেমির দিকে ফিরল রানা। 'দুঃখিত, আমার কোলে

বসতে হবে তোমাকে।'

'কিংবা তোমাকে বসতে হবে আমার কোলে,' বলল রেমি। 'তাতেও আমার আপত্তি নেই... বোমাটার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারলে বাঁচি।'

প্যাসেঞ্জার সিটে গাদাগাদি করে বসল দু'জনে। মুরল্যাণ্ড সন্দিহান গলায় বলল, 'মিস হ্যাডলি কি বোমার কথা বললেন?'

'মিস নয়... ডক্টর,' শুধরে দিল রানা। 'আর হ্যাঁ... ট্রাকটায় বোমা আছে। পুরো একটা কণ্টেইনার ভর্তি বাইনারি এক্সপ্লোসিভ। ছোটখাট একটা পাহাড় ধসিয়ে দেয়া যাবে ওটা দিয়ে।'

'সর্বনাশ! আগে বলবে তো!'

গিয়ার দিয়ে ভাইপারের মুখ ঘোরাল মুরল্যাণ্ড। কাঁচা রাস্তা ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল মেইন রোডের দিকে।

সেলফোন বেজে উঠল এ-সময়। গ্যারেটের নাম্বার। স্পিকার অন করল রানা। 'এবার কী?'

'ববি মুরল্যাণ্ড আছে তো তোমাদের সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল গ্যারেট।

'হ্যাঁ।'

'গুড। এখন থেকে আমাদের এই ছোট্ট খেলার ও-ও একজন প্লেয়ার।'

'কেন, আমাকে আর ড. হ্যাডলিকে দিয়ে চলছে না?'

'ব্যাপারটা স্রেফ হিসেবি চাল বলতে পারো। আমি না চাইলেও ববি মুরল্যাণ্ড ঠিকই নাক গলাবে খেলাটার মাঝে। আমার চোখ-কান ফাঁকি দিয়ে যেভাবেই হোক সাহায্য করবার চেষ্টা করবে তোমাকে। এমন নাছোড়বান্দা এবং বিপজ্জনক লোককে ঠেকানোর চেষ্টা করার চাইতে ওকে এখুনি তোমাদের সঙ্গে জুড়ে দেয়া ভাল মনে হয়েছে। সেজন্যে ওকে টেনে এনেছি এর মধ্যে।

তা ছাড়া মুরল্যাণ্ডকে সঙ্গে পেলে তোমার সফল হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে অনেকখানি। টিম হিসেবে তোমাদের সাকসেস রেট ঈর্ষণীয়।'

'পাম দিয়ে তো ফুলিয়ে ফেললে হে!' টিটকারির সুরে বলল মুরল্যাণ্ড। রানার দিকে তাকাল। 'কে এই তোষামোদকারী? রামছাগল টাইপের যে-লোকটা জিয়োলেব নিয়ে এসেছিল... সে? কী যেন নাম... প্যারট? তোতা পাখি?'

'টিটকিরি না মারলেই ভাল করবে, মি. মুরল্যাণ্ড,' স্পিকারে ভেসে এল রুক্ষ গলা। ঠাট্টা-মশকরায় খেপে গেছে। 'আমার নাম অ্যান্থনি গ্যারেট... এবং আমি খুবই সিরিয়াস লোক।'

'বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ তুমি, গ্যারেট,' বলল রানা। 'কী চাও জলদি বলে ফেলো। বোমার কাছ থেকে সরে এসেছি আমরা, অন্য কারও ক্ষতি হবারও সম্ভাবনা নেই। কাজেই তোমার কথা শুনব কি শুনব না, সেটা এখন সম্পূর্ণ আমাদের মর্জির উপর নির্ভর করছে।'

'এতটা নিশ্চিত হয়ো না,' বলল গ্যারেট। 'ড. হ্যাডলি কি বলেনি, ওর বোন যে আমার কবজায়? কথা না শুনলে বোনটাকে আর জ্যান্ত দেখতে পাবে না।'

'সত্যি?' রেমিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' মৃদু গলায় বলল রেমি। 'আমি তোমাকে বলার সময় পাইনি।'

'কিচ্ছু ভেবো না, ওকে উদ্ধার করব আমরা।' কথা দিল রানা।

'কাজের কথায় আসা যাক,' সুর বদলাল গ্যারেট। 'জিয়োলেবটা নিয়ে এসেছ?'

'হ্যাঁ। যেভাবে বলেছিলে, সেভাবেই বোমা থেকে ডিসকানেক্ট করে নিয়েছি,' জানাল রানা। 'কিন্তু ট্রাকটা তো রয়ে গেল ওখানে।

কী হবে ওটার?'

'ট্রাক নিয়ে আমাকে মাথা ঘামাতে দাও। তোমাদেরকে আবার ওই ফেরিতে ফিরে যেতে হবে।'

'কেন? আরেকটা বোমা রেখেছ নাকি ওখানে?'

'উঁহুঁ। একটাই ছিল।'

'তা হলে কেন আবার...'

রানার কথা শেষ হলো না, বজ্রপাতের মত শব্দে কানে তালা লেগে গেল ওদের। পিছন থেকে ছুটে এল শকওয়েভ, তার ধাক্কায় দুলে উঠল ডজ ভাইপারের পুরো কাঠামো। আরেকটু হলেই ছিটকে রাস্তা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল গাড়িটা, দক্ষ হাতে সামলে নিল মুরল্যাণ্ড।

ধাক্কাটা একটু সয়ে এলে রিয়ারভিউ মিররে চোখ বোলাল রানা। পুকুরপাড়ে পাক খাচ্ছে ধোঁয়া। বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে আকাশ থেকে নেমে আসছে ট্রাকের খণ্ড-বিখণ্ড অংশ। রিমোটের সাহায্যে বাইনারি এক্সপ্লোসিভ ফাটিয়ে দিয়েছে গ্যারেট। বুদ্ধিমান লোক... শহরের অনেক বাইরে, নির্জন এলাকায় ফাটিয়েছে বোমা... তা-ও আবার ঝড়-বাদলের মধ্যে। কেউ যদি শুনেও থাকে, বাজ পড়ার শব্দ বলে ভাববে।

রেমি অবশ্য সেটা বুঝতে পারেনি। চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'হোয়াট দ্য হেল! এভাবে বোমা ফাটায় কেউ? আমাদের যদি কিছু হয়ে যেত?'

'রিল্যাক্স, ড. হ্যাডলি,' নির্বিকার গলায় বলল গ্যারেট। 'তোমাদেরকে খতম করতে চাইলে আরও আগেই ফাটাতাম বোমাটা।'

'তা হলে কী চাও তুমি?'

'বলছি। তার আগে বলো—এক্সপ্লোশনটা কি যথেষ্ট জোরালো ছিল? পুরো ফেরি কি ডুবিয়ে দেয়া যেত ওটার সাহায্যে?'

'তুমি কি সার্টিফিকেট চাইছ আমাদের?' বিরক্ত গলায় বলল রানা।

'প্রশ্নের জবাব দাও, প্লিজ।'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট জোরালো ছিল ওটা। চাইলেই ফেরিটা ধ্বংস করে দিতে পারতে। খুশি?'

'তা হলে বুঝতেই পারছ, আমার হুমকিকে হালকাভাবে নেবার কোনও সুযোগ নেই। কয়েক শ' নিরীহ যাত্রীর জীবনের পরোয়া যদি না করে থাকি, তা হলে ভেবে দেখো, তোমাদের গুরু... অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের জীবনেরও পরোয়া করি না আমি।'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন!' চমকে উঠল রানা। 'তার মানে?'

'ওফ্-ফো, তোমাদেরকে তো বলাই হয়নি...' হাসল গ্যারেট, 'নুমা চিফ এখন আমার হাতের মুঠোয়... বুঝলে, বন্দি।'

বারো

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা ও মুরল্যাণ্ড। দু'জনেরই চোখে ফুটে উঠেছে অবিশ্বাস। এ কী করে হয়? গতকালই অ্যাডমিরালের সঙ্গে দেখা হয়েছে ওদের। তা হলে কখন তাঁকে আটক করল গ্যারেট? যদি করেও থাকে, এখন পর্যন্ত ওরা খবর পায়নি কেন?

ওদের মনের অবস্থা বোধহয় বুঝতে পারল গ্যারেট। আরও জোরে হেসে উঠল সে। 'কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? তা হলে খোঁজ নিয়ে দেখো!'

লাইন কেটে দিল সে।

'কার কথা বলছে ও?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

জবাব না দিয়ে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের নাম্বারে দ্রুত ডায়াল করল রানা। একবার মাত্র রিং হলো, তারপরেই শোনা গেল গ্যারেটের অতি-পরিচিত কণ্ঠ।

'দুঃখিত, রানা। অ্যাডমিরাল এ-মুহূর্তে ফোন ধরতে পারছেন না। জরুরি কোনও মেসেজ থাকলে আমাকে দিতে পারো।' কথা শেষ করে হেসে উঠল নিজের রসিকতায়। 'আশা করি এবার বুঝতে পারছ, কেন মুরল্যাণ্ডকে তুমিও ঠেকাতে পারতে না? হ্যামিলটনের জন্যই ও নাক গলাত আমাদের কাজের মাঝে। এতই যখন দরদ, ওকে আর মাঠের বাইরে রাখি কী করে, বলো?'

দাঁতে দাঁত পিষল রানা। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'অ্যাডমিরালের গায়ে যদি ফুলের টোকাও পড়ে, নিজের কবর খুঁড়ে রেখো, গ্যারেট। আমরা সেখানে পৌঁছে দেব তোমাকে।'

'জানি, তুমি আপসেট হয়ে পড়েছ। কিন্তু অনুরোধ করব মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রাখতে। এখুনি অ্যাডমিরালের কোনও ক্ষতি করবার ইচ্ছে আমার নেই। মানে... যতক্ষণ তুমি আর তোমার বন্ধুরা আমার কথামত কাজ করছ, কোনও ক্ষতি হবে না তাঁর।'

'বাকোয়াজ বন্ধ করো। খাল কেটে কুমির ডেকে এনেছ তুমি, গ্যারেট! কোনও আইডিয়া আছে কাকে কিডন্যাপ করে বসেছ? পুলিশ, এফবিআই, এনএসএ, সিআইএ... এমনকী পুরো আমেরিকান মিলিটারি তোমার পিছনে পাগলা কুকুরের মত লেগে যাবে।'

'সবই জানি আমি, বাপু। বোকা নই, ভালমত খোঁজখবর নিয়েই কাজে নেমেছি। হতে পারেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন কেউকেটা লোক, প্রেসিডেন্টের খাস বন্ধু... কিন্তু এখন সেসব স্ট্যাটাস কোনও কাজে আসবে না তাঁর। আমার হাতের মুঠোয়

আটকা পড়েছেন তিনি, ভেবো না খুব সহজে তাঁকে খুঁজে বের করতে পারবে। এ-সব কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে আমার। কীভাবে মানুষ গায়েব করে রাখতে হয়, কীভাবে আইনের চোখে ধুলো দিতে হয়—তা আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। তারপরেও যদি কপালজোরে অ্যাডমিরালের খোঁজ পেয়ে যাও, শিয়োর থাকো, তাঁকে জ্যান্ত উদ্ধার করতে পারবে না। বিপদের আভাস পাওয়ামাত্র তাঁকে খুন করব আমি! যারা অ্যাডমিরালের খোঁজে বের হবে, তাদেরকে কথাটা জানিয়ে দিতে পারো।'

নিষ্ফল আক্রোশে ড্যাশবোর্ডের উপর ঘুসি বসাল রানা। এতক্ষণে টের পেয়েছে, কতবড় ধুরন্ধর ও বিপজ্জনক এক লোকের পাল্লায় পড়েছে ওরা। সেই সঙ্গে হিসেবি এবং বেপরোয়াও বটে। এমন এক চাল দিয়েছে, যার ফলে এ-মুহূর্তে সম্পূর্ণ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ওরা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন শুধু নুমার ডিরেক্টর, বা ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি নন; রানা আর মুরল্যাণ্ডের কাছে তিনি পিতৃসম ব্যক্তিত্ব। যেমন তাঁকে শ্রদ্ধা করে ওরা, তেমনি ভালবাসে। তাঁর জীবনের উপর কোনও রকম ঝুঁকি নিতে পারবে না ওরা।

'অ্যাডমিরালের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই,' বলল রানা।

'দুঃখিত, এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়,' জানাল গ্যারেট। 'তাঁকে গোপন এবং সুরক্ষিত একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওখানে পৌঁছুনোর পর নাহয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে, যাতে বুঝতে পারো অ্যাডমিরাল সুস্থ আছেন।'

'তোমার মতলবটা কী, গ্যারেট? কেন এসব বিপজ্জনক খেলা খেলছ?'

'বলছি। তার আগে ফোনের স্পিকার অন করো। তোমাদের সবারই কথাগুলো শোনা দরকার।'

সেলফোনের বাটন চাপল রানা। 'অন করেছি।'

'বেশ, তা হলে শোনো... এতক্ষণ যা করেছ তোমরা, সেটা ছিল স্রেফ একটা পরীক্ষা। পরীক্ষায় পাস করেছ, কাজেই এবার আসছে আসল কাজের পালা।'

'কী ধরনের কাজ?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'সিম্পল। আমি চাই, তোমরা আমাকে মাইডাস টাচের সন্ধান এনে দেবে।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'মাইডাস টাচ? কীসের কোড ওটা?'

'কোড নয়, রানা। মেটাফোর নয়... নয় কোনও ব্র্যাণ্ড নেম। আমি সত্যিকার মাইডাস টাচের কথা বলছি, যার সাহায্যে যে-কোনও জিনিসকে সোনায় পরিণত করা যায়।'

একটা আঙুল কপালের পাশে তুলে শূন্যে মোচড় দেবার ভঙ্গি করল মুরল্যাণ্ড, বোঝাতে চাইছে—গ্যারেটের মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে। চোয়াল ঝুলে পড়ল রেমির। রানাও বিমূঢ়; এই ধরনের একটা অবাস্তব কথা বলবে লোকটা, আশা করেনি। ভেবেছিল অ্যাডমিরালের জন্য বড় অঙ্কের মুক্তিপণ চেয়ে বসবে, অথবা সরকারি কোনও গোপন তথ্য-টথ্য চুরি করে আনতে বলবে ওদেরকে।

কিন্তু মাইডাস টাচ! একে পাগলামি বললেও কম বলা হয়। সবাই জানে, ওটা কল্প-কাহিনি বৈ আর কিছু নয়। লোভের ফলে মানুষের কত বড় সর্বনাশ হতে পারে, সেটা বোঝানোর জন্য গ্রিক পৌরাণিক কাহিনিতে রচনা করা হয়েছিল চরিত্রটার। মাইডাস ছিলেন অত্যন্ত লোভী এক রাজা, স্বর্ণের প্রতি অতিশয় আসক্তি ছিল তাঁর। রাজার তরফ থেকে অবিরাম প্রার্থনা আর নৈবেদ্যর চাপে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা অদ্ভুত এক বর দেন তাঁকে—শুধু স্পর্শ দিয়েই যে-কোনও বস্তুকে সোনায় পরিণত করতে পারবেন তিনি! ওটাই মাইডাস টাচ নামে পরিচিত। কিন্তু আসলে ওটা বর ছিল না, ছিল নির্মম এক অভিশাপ। মাইডাস টাচের কারণে

খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায় রাজার, তাঁর স্পর্শ পাওয়ামাত্র খাবারগুলো নিরেট সোনা হয়ে যেত। এক পর্যায়ে মনের ভুলে আদর করতে গিয়ে নিজের একমাত্র মেয়েকেও সোনার মূর্তি বানিয়ে ফেলেন তিনি। এরপর দুঃখ, ক্ষোভ আর অনুতাপে ভরে যায় রাজার হৃদয়। দেবতাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে মাইডাস টাচের ক্ষমতা বিসর্জন দেন তিনি।

'আমার বোধহয় বোঝার ভুল হচ্ছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'তুমি কি গ্রিক মিথোলজির সেই মাইডাস টাচের কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, রানা। বুঝতে মোটেই ভুল হয়নি তোমার।' বলল গ্যারেট। 'মাইডাস টাচের সন্ধান চাই আমি... এবং তোমরা সেটা এনে দেবে। যদি না পারো, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলি মারা যাবে। ইট ইজ দ্যাট সিম্পল।'

'কিছু মনে কোরো না,' ফোড়ন কাটল মুরল্যাণ্ড। 'শেষ কবে নিজের মাথা পরীক্ষা করিয়েছ তুমি, জানতে পারি?'

'আমি পাগল নই,' শীতল কণ্ঠে বলল গ্যারেট। 'জানি, কথাটা অবিশ্বাস্য শোনাচ্ছে; কিন্তু গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, মাইডাস টাচের অস্তিত্ব সত্যিই আছে।'

'বেশ,' বলল রানা। এরই মধ্যে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে—কীভাবে লোকটাকে না খেপিয়ে অ্যাডমিরালকে উদ্ধার করা যায়।

'নিজ চোখে দেখেছি আমি ওটা,' বলে চলল গ্যারেট, 'আর তা প্রমাণও করে দিতে পারি।'

'দেখেই যদি থাকো, তা হলে ওটার খোঁজও তুমি জানো। এত ঝামেলা করে আমাদেরকে রাজি করাবার দরকার পড়ছে কেন?'

'সাক্ষাতে সব বলব। সে-কারণেই ফেরিতে উঠতে বলছি। সিয়াটলে দেখা করব আমরা। ঠিক দুপুর আড়াইটায়, সাফেকো

ফিল্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায়। শুধু তোমরা তিনজন, আর কেউ না। পুলিশ-টুলিশের ছায়াও যদি দেখি, তা হলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেলকে শেষ করে দিয়ে সরে পড়ব আমি। আমার বক্তব্য পরিষ্কার হয়েছে?'

ঘড়ি দেখল রানা। পৌনে একটা বাজে। আড়াইটার মধ্যে সিয়াটলে ফেরা একটু কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। এখুনি গিয়ে ফেরি ধরতে হবে।

'ঠিক আছে, জায়গামত হাজির থাকব আমরা,' জানাল ও।

নীরব হয়ে গেল সেলফোন। ওটা পকেটে ঢুকিয়ে থম মেরে গেল রানা। মুরল্যাণ্ড আর রেমিও চুপ। অল্প সময়ের ব্যবধানে অনেক কিছু ঘটে গেছে, এতক্ষণ দম ফেলারই ফুরসত পাওয়া যায়নি, এবার মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝে নিতে চাইল পরিস্থিতিটা।

উদ্দাম বেগে ব্রেমারটনের ডকের দিকে ছুটে চলেছে ভাইপার। নীরবতা অসহ্য হয়ে ওঠায় খানিক পর মুরল্যাণ্ড বলল, 'পুরো ব্যাপারটা গোড়া থেকে জানা দরকার আমার। কেউ কি বলতে পারো, দুনিয়ায় এত লোক থাকতে ওই মেণ্টাল পেশেণ্টটা আমাদেরকে টার্গেট করল কেন?'

'জানি না,' বলল রেমি। 'দু'দিন আগে আমি সিয়াটলে এসেছি *চেজিং দ্য পাস্ট*-এর সামনের পর্বের জন্য রিসার্চ ম্যাটেরিয়াল সংগ্রহ করতে। আজই আবার নিউ ইয়র্কে যাবার কথা ছিল...'

'তাই তো বলি, আপনাকে চেনা চেনা লাগে কেন!' ওর কথার মাঝখানে বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'আপনি ওই অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা না? টিভিতে দেখেছি আপনাকে। রানার পিছনেও তো বোধহয় কিছুদিন ইণ্টারভিউয়ের জন্য ঘুরেছেন, তাই না?'

'পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই, ববি,' বলল রানা। 'বলো রেমি, তোমার সঙ্গে গ্যারেটের যোগাযোগ হলো কীভাবে?'

'সরি, ড. হ্যাডলি,' ববি সুর মেলাল। 'প্লিজ, কণ্টিনিউ।'

'শুধু রেমি বলে ডাকলে খুশি হব,' বলে একটু হাসল রেমি। 'এনিওয়ে, গ্যারেটের সঙ্গে আজ সকালের আগে কোনোদিন কথা হয়নি আমার। ওকে চিনিই না আমি, দেখিনি কোনোদিন। নামটাও তোমার মুখেই প্রথম শুনলাম, রানা। র‍্যাচেলের নাম্বার থেকে আমাকে ফোন করেছিল ও, কিডন্যাপিঙের খবর দিয়েছে। প্রমাণ হিসেবে ই-মেইলে পাঠিয়েছে একটা ভিডিও। তারপর বেলা পৌনে এগারোটার ফেরিতে উঠতে বলেছে। ফেরি ছাড়ার পর দ্বিতীয়বার ফোন পেয়েছি ওর—ভেহিকল ডেকে ওই ট্রাকটার কাছে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েছি তখন। বাকিটা তো তুমি জানো।'

'হুম, মনে হচ্ছে টিভি দেখেই তোমাকে টার্গেট করেছে গ্যারেট,' বলল রানা। 'নিশ্চয়ই ভেবেছে, মাইডাস টাচ খোঁজার কাজে গ্রিক সভ্যতার উপর একজন বিশেষজ্ঞ পেলে সুবিধে হবে ওর।'

'আর আমরা কীসের বিশেষজ্ঞ?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড। 'পাগল-ছাগলকে চুম্বকের মত আকৃষ্ট করবার?'

হেসে ফেলল রেমি। 'আমার ধারণা, খ্যাতির বিড়ম্বনার শিকার হয়েছেন আপনারা। আপনি আর রানা অতীতে বহু ট্রেজার সফলভাবে উদ্ধার করে এনেছেন। জানেন কি না জানি না, আর্কিয়োলজিকাল সার্কেলে কিন্তু বেশ নাম-ডাক হয়ে গেছে আপনাদের। বিশেষ করে রানা কোনও কাজে হাত দিলে সেটা ব্যর্থ হয় না, এমন একটা ধারণা প্রচলিত রয়েছে সবার মাঝে।'

'তাই বলে মাইডাস টাচ? ওই জিনিসের তো ঐতিহাসিক কোনও ভিত্তিই নেই!'

'এই গ্যারেট লোকটাকে ভিত্তিহীন একটা মরীচিকার পিছনে ঘুরবার মত মানুষ বলে মনে হচ্ছে না আমার,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছে সে—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের মত একজন প্রভাবশালী মানুষকে কিডন্যাপ করে বিরাট বিপদ ডেকে

এনেছে নিজের মাথার উপর। এর বিনিময়ে নিশ্চয়ই বিশাল কিছু পাবে বলে বিশ্বাস আছে ওর।'

'সোনা বানাবার ক্ষমতা?' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মুরল্যাণ্ড। 'এসব আকাশকুসুম স্বপ্নেরও একটা লিমিট থাকা উচিত বলে মনে করি। আলকেমিস্টরা কয়েক শ' বছর সাধনা করেও সফল হয়নি ও-কাজ করতে। আর গ্যারেট চাইছে জাদুর স্পর্শে সোনা হয়ে যাক সব!'

'নিশ্চয়ই ওর হাতে বিশেষ কোনও তথ্য আছে। যদ্দূর বুঝতে পারছি, আর্কিমিডিসের ডিজাইন করা ওই জিয়োলেব সেটার একটা অংশ। ডিভাইসটা কীভাবে অপারেট করতে হয়, সেটা শেখার জন্য আমার কাছে এসেছিল ও। হয়তো ভেবেছিল, অপারেশন জানলে নিজেই খুঁজে নিতে পারবে মাইডাস টাচ। কিন্তু সে-সময় জিয়োলেবের রহস্য ধরতে পারিনি আমি—এক রাতের বেশি সময় ছিল না আমার হাতে... তা ছাড়া পরেও ইচ্ছে হয়নি গ্যারেটকে সাহায্য করবার; ওর হাবভাব ভাল লাগেনি আমার। অন্যত্র চেষ্টা করেও সম্ভবত ব্যর্থ হয়েছে ও। তাই মরিয়া হয়ে এই পথ বেছে নিয়েছে—যেভাবেই হোক আমাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিতে চাইছে। গ্রিক ভাষা আর সভ্যতার ব্যাপারে আমার জ্ঞান না থাকার মতই। সম্ভবত সেজন্যেই রেমিকেও রিক্রুট করেছে। অনেকটা সায়েণ্টিফিক এক্সপিডিশনের টিম গঠন করবার মত একটা ব্যাপার আর কী—তবে প্যাঁচে ফেলে, মোচড় দিয়ে।'

'জিয়োলেবের ব্যাপারে একটা খটকা আছে আমার,' বলল রেমি। 'ওটা তো আর্কিমিডিসের ডিজাইন করা জিনিস, তা হলে এত চকচক করছে কেন? দেখে তো একেবারে নতুন বলে মনে হলো।'

'ডিজাইনটা আর্কিমিডিসের, কিন্তু জিনিসটা সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে,' বলল রানা। 'আমাকে আর্কিমিডিসের একটা কোডেক্সের কয়েক পাতার ফটোকপি দেখিয়েছিল

গ্যারেট—ছবিসহ ওতে বিস্তারিত লেখা ছিল জিয়োলেব বানাবার নিয়ম। সেই ইন্সট্রাকশন ফলো করে ও নিজেই ডিভাইসটা বানিয়েছে বলে জানিয়েছিল।'

'নিজেই যদি বানিয়ে থাকে, তা হলে অপারেট করতে পারছে না কেন?'

'ওই যে, তখন রুবিকস্ কিউবের উদাহরণ দিলাম না? ম্যানুয়েল দেখে কিউবের সমস্ত পার্টস্ বানাতে পারবে তুমি, জোড়া দিয়ে গোটা কিউবটাও দাঁড় করিয়ে ফেলতে পারবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কিউবটা সমাধানের কৌশল শিখে ফেললে। যদি তা-ই হতো, তা হলে খেলনা কোম্পানিতে এমন কোনও শ্রমিক থাকত না, যে রুবিক'স্ কিউব মেলাতে না পারে।'

'হুম, বুঝলাম। কিন্তু আর্কিমিডিসের কোডেক্স গ্যারেট পেল কোথায়?'

'নিশ্চয়ই চুরি করেছে কোথাও থেকে,' অনুমান করল রানা। 'কিনেও নিতে পারে। আমি শিয়োর না, ওকে জিজ্ঞেসও করিনি। মন খুঁতখুঁত করায় আমার ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিকে দিয়ে ওর ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক করিয়েছিলাম, কিন্তু কোথাও কোনও খারাপ রিপোর্ট পাইনি। অন্তত পুলিশ, এফবিআই বা ইন্টারপোলে ওর নামে কোনও ফাইল নেই।'

'তা কী করে হয়?' বিস্মিত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'এমন ডেঞ্জারাস একটা লোক... অথচ ওর ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না! এই লাইনে ওকে তো অ্যামেচার বলে মনে হলো না।'

'এ-কারণেই সাবধানে এগোতে হবে আমাদেরকে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'অত্যন্ত ধুরন্ধর এক লোকের পাল্লায় পড়েছি আমরা। প্রফেশনাল ক্রিমিনাল, অথচ আইনের চোখে অস্তিত্ব নেই ওর। তারমানে আজ পর্যন্ত কোথাও কোনও ভুল করেনি।'

'কিন্তু এবার তো ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে,' বলল

মুরল্যাণ্ড। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে কিডন্যাপ করেছে, এরপর তো আর আইনের চোখ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব হবে না ওর পক্ষে।'

'ববি, ও যদি সত্যিই মাইডাস টাচ পায়, তা হলে এসবের কোনও গুরুত্ব থাকবে বলে মনে করো? পুরো দুনিয়াকে কিনতে-বেচতে পারবে গ্যারেট, কেউ ওর নখের ডগাও স্পর্শ করতে পারবে না। ঝুঁকি নেবার জন্য মোটিভেশনটা মন্দ নয়, কী বলো?'

'এ স্রেফ পাগলামি!' বলে উঠল রেমি। 'মাইডাস টাচের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কীভাবে ওটা খুঁজে বের করব আমরা? র‍্যাচেল বা তোমাদের ওই অ্যাডমিরালকে বাঁচাবার কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না আমি।' গলা ধরে এল ওর।

ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেল না রানা বা মুরল্যাণ্ড।

তেরো

গতি কমে গেছে ভ্যানের; তবে চোখ বাঁধা থাকায় অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বুঝতে পারলেন না, গাড়িটা মোড় ঘুরছে, নাকি গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন তাঁরা।

ঘণ্টাখানেক ধরে ছুটছে ভ্যান। উদ্দাম বেগে। সাধারণত হাইওয়েতে এ-রকম স্পিডে গাড়ি চালায় লোকে। কতদূর এসেছেন, মনে মনে হিসেব করলেন। ডিসি, ভার্জিনিয়া, মেরিল্যাণ্ড, পেনসিলভ্যানিয়া বা ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া... যে-কোনও

জায়গাই হতে পারে; নির্ভর করছে কোন্‌দিকে ছুটছে গাড়ি, তার উপর। ইলেকট্রিক শক খাওয়ার পর কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। চেতনা ফেরার পর টের পেয়েছেন, চলন্ত এই প্যানেল-ভ্যানের মেঝেতে পড়ে আছেন। মুখে গুঁজে দেয়া হয়েছে কাপড়; দুই হাতের কবজি হাতকড়া দিয়ে আটকানো। আর দুই গোড়ালি বেঁধে রাখা হয়েছে প্লাস্টিকের স্ট্রিপ দিয়ে। তল্লাশি চালিয়ে এর আগেই কেড়ে নেয়া হয়েছে তাঁর পকেটের সমস্ত জিনিস। মাঝে একবার গাড়ি থামিয়ে তাঁর ফোনটা বাইরের কারও হাতে তুলে দিয়েছে অপহরণকারীরা। ওদের কথাবার্তা শুনে সেটা টের পেয়েছেন অ্যাডমিরাল।

ভ্যান চালাচ্ছে ভুয়া হোটেল-স্টাফ। আর্মি ছদ্মবেশধারী যুবকটি বসেছে ভ্যানের পিছনে। জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডমিরালের চোখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে দিয়েছে সে। তবে তার আগেই পাশে একটি মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখেছেন তিনি। বয়স বেশি না, বিশ-বাইশ হতে পারে। হাত-পা বাঁধা হয়নি মেয়েটির। এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে থাকা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ড্রাগ দেয়া হয়েছে ওকে। মেয়েটি বেশ সুন্দরী; ছিপছিপে, অ্যাথলিটের মত দেহ। ওকে আগে কোনোদিন দেখেছেন বলে মনে পড়ছে না হ্যামিলটনের। ভেবে পাচ্ছেন না, তাঁকে এবং এই অচেনা মেয়েটিকে একই সঙ্গে কেন কিডন্যাপ করা হয়েছে।

মুখের গোঁজটার জন্য বেশ অসুবিধে হচ্ছিল অ্যাডমিরালের, খানিক আগে দয়াপরবশ হয়ে ওটা সরিয়ে নিয়েছে ভুয়া ক্যাপ্টেন। ধন্যবাদ জানিয়ে আলাপ জুড়বার চেষ্টা করেছেন তিনি, ভেবেছিলেন কথা বলাতে পারলে কিছু তথ্য বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সে-আশার গুড়ে বালি। মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে যুবক। অ্যাডমিরালকে বক বক করতে দেখে ধমক দিয়েছে—চুপচাপ শুয়ে না থাকলে আবার ইলেকট্রিক শক দিয়ে বেহুঁশ করে

ফেলবে।

ভয় পাচ্ছেন না অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, তবে নিজের উপর ক্ষুব্ধ হচ্ছেন বেশ। বিপদ-আপদ তাঁর জন্য নতুন কিছু নয়, সামরিক বাহিনীতে চাকরির সুবাদে বহুবার বহু জটিল ও বিপজ্জনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন; আজকের ঘটনা সে-তুলনায় কিছুই না। ভুলটা তাঁরই—জেনারেল হোগানের নাম শুনেই অমন অস্থির হওয়া ঠিক হয়নি। জয়েন্ট ফোর্সেস হেড-কোয়ার্টারে যাবার জন্য ফোন যেহেতু পাননি, নিজেরই ফোন করে নিশ্চিত হয়ে নেয়া উচিত ছিল। তা হলে তাঁকে বাগে পেত না এই লোকগুলো। বরং নিজেরাই ফাঁদে পড়ে যেত।

এখন আর কপাল চাপড়ে লাভ নেই। কী করা যায়, সেটাই ভাবতে চাইলেন অ্যাডমিরাল। কোর্স অভ অ্যাকশন নির্ভর করছে কেন তাঁদের দুজনকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, সেটার উপর। সাধারণ মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না, তার জন্য নুমার ডিরেক্টরের চেয়ে অনেক বেশি নিরাপদ এবং ধনী টার্গেট রয়েছে। তা হলে? গোপন কোনও তথ্য জানতে চায় প্রতিপক্ষ? মেয়েটির বয়স কম, তবে পেন্টাগন ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে এরচেয়েও কমবয়েসী স্টাফ আছে। ওভাবে চিন্তা করলে একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হয়তো টর্চার করে অ্যাডমিরাল এবং মেয়েটির কাছ থেকে কিছু জেনে নেবার পাঁয়তারা কষছে এরা। সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। লোকদুটো অ্যামেচার নয়, নিখুঁত পদ্ধতিতে একটা মিলিটারি সেমিনারের মাঝ থেকে তুলে এনেছে তাঁকে। এ-কাজ যাকে-তাকে দিয়ে সম্ভব নয়। প্রকাশ্য দিবালোকে যেভাবে চেহারা দেখিয়েছে কাজটা সারার আগে... ধরে নিতে হয় ওরা বেপরোয়া, কিংবা নিজেদেরকে রক্ষা করবার মত যথেষ্ট প্রস্তুতি রয়েছে ওদের। দ্বিতীয়টাই সত্যি বলে মনে হলো অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছে।

ব্রেক কষে থমকে দাঁড়াল ভ্যান। গ্যারাজ ডোর খুলে যাওয়ার ঘটাং-ঘটাং আওয়াজ পেলেন হ্যামিলটন। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডোর... রেসিডেনশিয়াল হলে এত জোরে আওয়াজ করত না।

মৃদু ঝাঁকি খেয়ে ধীরগতিতে সামনে বাড়ল গাড়িটা, সামান্য এগিয়ে থামল আবার। ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হলো। গ্যারাজ ডোর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেলে অ্যাডমিরালের চোখের বাঁধন খুলে দিল ভুয়া ক্যাপ্টেন। ছুরি বের করে গোড়ালিতে আটকানো প্লাস্টিকের স্ট্রিপও কাটল। হাতকড়া দুটো রইল যেমন ছিল।

মুখের কাছে তাক করে রাখা টেযার গান দেখতে পেলেন হ্যামিলটন। ডুয়াল-অপারেশন মডেল। সরাসরি গায়ে লাগিয়ে শক দেয়া যায়, আবার সিঙ্গল-ইউজ কার্ট্রিজ ছুঁড়ে ত্রিশ ফুট দূরের শিকারকেও ঘায়েল করা যায় অনায়াসে। এই মুহূর্তে ডাইরেক্ট কণ্ট্যাক্ট মোডে রাখা হয়েছে ওটাকে। পিস্তল-বন্দুকের বদলে টেযারের উপস্থিতি একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে দিচ্ছে—এখুনি অ্যাডমিরালকে খুন করতে চায় না এরা।

ভ্যানের পিছনের দরজা খুলে গেল। টেযার নেড়ে হ্যামিলটনকে নামতে ইশারা করল ভুয়া ক্যাপ্টেন। হাতের বাঁধন খোলা হয়নি, আছড়ে-পিছড়ে নামতে হলো তাঁকে। কংক্রিটের মেঝেতে পা রাখতেই প্রতিধ্বনি উঠল চারপাশে। মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে চোখ বোলালেন অ্যাডমিরাল।

বিশাল এক ওয়্যারহাউসে ঢুকেছে ভ্যান—একসঙ্গে বিশটা ট্র্যাক্টর-ট্রেইলারের জায়গা হয়ে যাবে, এমনই ওটার আকার-আয়তন। দেয়ালে কোনও জানালা নেই, ভিতরটা আলোকিত করছে মাথার উপর জ্বলতে থাকা ফ্লুরেসেন্ট বাতির সারি। গুদামঘরটা পরিত্যক্ত নয়; মোটামুটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, দেয়ালে নতুন রঙের আস্তর। সম্ভবত ওয়্যারহাউস ডিস্ট্রিক্টের কোনও বিল্ডিং এটা। আশাবাদী হয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল,

কোনোমতে এখান থেকে বেরুতে পারলে সাহায্য খুঁজে নেয়া যাবে সহজে। নির্জন কোনও এলাকা হলে সেটা সম্ভব হতো না।

এই মুহূর্তে ওয়্যারহাউসের ভিতরটা সম্পূর্ণ খালি—খোলা ময়দানের মত দেখাচ্ছে জায়গাটা। গুদামজাত মালামাল নেই... এমনকী মালামাল সাজিয়ে রাখার একটা র‍্যাকও দেখা যাচ্ছে না। আছে স্রেফ ক'টা ফার্নিচার—ভ্যান যেখানে থেমেছে, তার একটু দূরে এলোমেলো ভঙ্গিতে পড়ে আছে স্টিলের চারটে কট, তিনটা টেবিল, চারটা চেয়ার, এবং উপচে পড়া একটা ট্র্যাশ ক্যান। কটগুলোর চারপাশে পড়ে আছে খালি পিৎজা-বক্স, চাইনিজ খাবারের প্যাকেট; সেইসঙ্গে বিয়ার আর পানির বোতল। টেবিলের উপর শোভা পাচ্ছে চোদ্দ-ইঞ্চি স্ক্রিনের একটা কালার টিভি, দুটো ল্যাপটপ আর একটা ওয়্যারলেস রাউটার। অস্থায়ী আবাসের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

ছোটখাট কাজকর্মও বোধহয় সারা হয় এখানে, কারণ থাকার জায়গার কিছু দূরে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু ইকুইপমেন্ট—ড্রিল মেশিন, সোল্ডারিং আয়রন, আর্ক ওয়েল্ডার, হাতুড়ি, ইত্যাদি। মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে ধাতুর গুঁড়ো আর বাতিল লোহার টুকরো। সার বেঁধে সাজিয়ে রাখা বারোটা স্টিলের ব্যারেল দেখতে পেলেন হ্যামিলটন কটগুলোর পিছনে। ওগুলোর সঙ্গে রাখা হয়েছে কয়েকটা কাঠের ক্রেট, তবে ক্রেটের গায়ের লেখাগুলো কালো রঙ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে... ফলে বোঝা যাচ্ছে না ওগুলো কীসের আধার।

ওয়্যারহাউসের দক্ষিণ প্রান্তে, সিণ্ডার-ব্লকের দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে চারটে কামরা। দুটোর দরজা ওয়্যারহাউসের সামনের দিকে, আর অন্যদুটো পিছন দিকে মুখ করা। প্রতিটা দরজার চোখ বরাবর উচ্চতায় রয়েছে ছ'ইঞ্চি বাই ছ'ইঞ্চি সাইজের একটা করে ফোকর। ফোকরগুলো লোহার জাল দিয়ে

ঢাকা। উপরে কাঁচের আবরণও ছিল, তবে এখন তা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তার বদলে কবজা-সহ লোহার ঢাকনা লাগানো হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে ফোকরটা বন্ধ করা বা খুলে রাখা যায়—জেলখানার দরজার মত। কামরাগুলো মূলত ওয়্যারহাউসের সুরক্ষিত অংশ—দামি জিনিসপত্র আলাদাভাবে রাখার জন্য বানানো হয়েছিল। তবে আপাতত ওখানে দুই বন্দিকে রাখবার প্ল্যান করেছে কিডন্যাপাররা।

ঘাড় ফিরিয়ে টেযারধারী যুবকের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'এবার কী, *ক্যাপ্টেন?*'

'আমি ক্যাপ্টেন নই,' চাঁছাছোলা গলায় বলল যুবক। 'আমাকে বেনসন বলে ডাকতে পারেন। আসুন, কামরা দেখানোর আগে ছোট্ট একটা কাজ সেরে নেয়া যাক।'

দেয়ালের পাশে একটা চেয়ার নিয়ে গেল সে। নির্দেশ দিল, 'বসুন।'

'কেন?'

'কথা বাড়াবেন না। যা বলব, চুপচাপ তা-ই করতে হবে। নইলে আবার শক দেওয়া হবে। মনে হয় না সেটা খুব উপভোগ্য হবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন অ্যাডমিরাল। বললেন, 'ইন্টারোগেট করবে? যদি ভেবে থাকো আমার মুখ থেকে...'

'ইন্টারোগেশন?' হেসে উঠল বেনসন। 'না, অ্যাডমিরাল, ভুল ভাবছেন আপনি। এখানে আপনাকে আনা হয়েছে স্রেফ লিভারেজ হিসেবে।'

'কীসের লিভারেজ?'

'আপনার প্রিয় মাসুদ রানা যেন আমাদের ছোট্ট একটা কাজ করে দেয়,' বলল বেনসন। 'শান্ত হয়ে বসুন. ভিডিও করা হবে আপনার। বেঁচে আছেন. সংবাদটা রানার কাছে পাঠাবার জন্য।'

এই-ই তা হলে ব্যাপার? রানাকে বাগে পেতে চাইছে এরা? নিশ্চয়ই কঠিন, বিপজ্জনক কোনও কাজের জন্য? কৌশলটা মন্দ নয়, মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন অ্যাডমিরাল। তাঁকে বাঁচাবার জন্য রানা প্রয়োজনে প্রাণের ঝুঁকি নেবে। মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিলেন তিনি: ভীমরতি ধরেছে বুড়ো-হাবড়ার! তাঁর অসতর্কতার জন্যই এখন বিপদের মাঝে ঝাঁপ দিতে হবে ছেলেটাকে!

ভ্যান থেকে একটা ডাফল ব্যাগ নিয়ে এসেছে বেনসন। টেবিলের উপর রেখে ওটার ভিতর থেকে বের করে আনল স্কি-মাস্ক, দৈনিক পত্রিকা আর একটা ভিডিও ক্যামেরা। আর্মি ইউনিফর্মের টিউনিক খুলে পরল একটা কালো সোয়েটার। এরপর স্কি-মাস্ক দিয়ে ঢেকে ফেলল মুখ। প্রস্তুতি শেষ হলে ঘাড় ফিরিয়ে ডাকল সঙ্গীকে, 'কাটনার, তুমি রেডি?'

'হ্যাঁ,' বলে ভ্যানের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় লোকটা। সে-ও বেনসনের মত কালো পোশাক আর স্কি-মাস্ক পরে নিয়েছে।

'শুরু করা যাক,' বলল বেনসন।

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল কাটনার, এক হাতে দৈনিক পত্রিকাটা ধরল তাঁর বুকের উপর; ওটার তারিখ দেখে নিশ্চিত হতে পারবে রানা—ভিডিওটা আজই করা হয়েছে। অন্য হাতে তৈরি রেখেছে টেৎযার।

'অযাচিত কোনও মুভমেন্ট দেখতে চাই না আপনার মধ্যে,' বেনসন বলল। 'কোনও রকম আকার বা ইঙ্গিত... কিচ্ছু না। কয়েকটা প্রশ্ন করব আমি, আপনি ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে যাবেন। বাড়তি একটা কথাও যেন বের না হয় মুখ দিয়ে। ক্লিয়ার?'

হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না হ্যামিলটন। মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে বেনসন বলল, 'শুরু করলাম তা হলে।'

ভিডিও ক্যামেরার রেকর্ড বাটন চাপল সে। প্রথমে লেন্স জুম করল অ্যাডমিরালের বুকের উপর রাখা পেপারের উপর, তারিখটা যেন স্পষ্ট দেখা যায়। এরপর জুম আউট করে অ্যাডমিরালের পুরো অবয়ব ধরল স্ক্রিনে।

'আপনার নাম বলুন।'

'কাকে জিজ্ঞেস করছ?' বাঁকা সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'আমাকে, নাকি কাটনারকে?'

দাঁত কিড়মিড় করল বেনসন। 'আপনি দেখছি মহা ত্যাঁদোড় লোক! কাটনার, ওঁকে একটু ঝাঁকি দেবার ব্যবস্থা করো।'

অ্যাডমিরালের কাঁধের উন্মুক্ত চামড়ায় টেযার চেপে ধরল কাটনার। ভীষণভাবে কেঁপে উঠল তাঁর দেহ। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কাতর ধ্বনি। তবে এবার ভোল্টেজ কমিয়ে রাখা হয়েছে... জ্ঞান হারালেন না হ্যামিলটন, শুধু প্রচণ্ড ব্যথায় নেতিয়ে পড়লেন।

'ওতেই হবে,' সন্তুষ্ট গলায় বলল বেনসন। 'ঘাড়ত্যাড়ামির সাহস পাবে না আর। একটু সুস্থ হয়ে নিক, তারপর আবার শুরু করা যাবে।'

'ভিডিওতে আমার নাম উচ্চারণ করে ফেলল তো ব্যাটা!' শঙ্কিত গলায় বলল কাটনার।

'ভয়ের কিছু নেই। নতুন করে পুরোটা আবার রেকর্ড করব।'

একটু পরেই গুঙিয়ে উঠে সোজা হয়ে বসলেন অ্যাডমিরাল। কাটনার বলল, 'এই তো, উঠেছে। লেটস্ কন্টিনিউ।'

'টেক টু, অ্যাডমিরাল,' বলল বেনসন। 'এবার আর কোনও ভুল যেন না হয়।' পত্রিকার ভিডিও করে আবার প্রশ্ন ছুঁড়ল সে। 'আপনার নাম?'

'জর্জ হ্যামিলটন,' দাঁতে দাঁত পিষে বললেন অ্যাডমিরাল।

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে! পেশা?'

'চাকরি।'

'কী চাকরি... কী পদ?'

'ডিরেক্টর, ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি।'

'গায়ে সনাক্তকরণ চিহ্ন আছে কোনও?'

'হ্যাঁ। বুকের বামপাশে একটা কালো তিল।'

কাটনারকে ইশারা করল বেনসন। অ্যাডমিরালের শার্টের বোতাম খুলে তিলটা ক্যামেরার সামনে উন্মুক্ত করল সে।

'গুড,' খুশি খুশি গলায় বলল বেনসন। 'আপনি সুস্থ তো, স্যর?'

'এ-অবস্থায় যতটা থাকা যায়।'

'ব্যস, এতেই চলবে।' ক্যামেরা অফ করে দিল বেনসন।

টান দিয়ে অ্যাডমিরালকে দাঁড় করালো কাটনার। টেযার তাক করে বন্দিশালার দিকে এগোতে বাধ্য করল। একটা কামরার দরজা খুলে ধরল বেনসন, ওখানে ধাক্কা দিয়ে ঢোকানো হলো তাঁকে। হুমড়ি খেয়ে মেঝের উপর পড়লেন হ্যামিলটন, ককিয়ে উঠলেন ব্যথা পেয়ে। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। বাইরে থেকে হ্যাস্পবোল্ট লাগানোর আওয়াজ হলো।

কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসলেন অ্যাডমিরাল। হাতকড়া না খুলেই প্রকোষ্ঠের মত কামরাটায় ঢোকানো হয়েছে তাঁকে। এখানকার ছাত আর দেয়াল সিণ্ডার-ব্লকে তৈরি। দরজাটা লোহার। এপাশে ঝালাই করা একটা হাতল আছে, তবে চাবির ফুটো নেই। দরজার পাল্লাতে বিল্ট-ইন কোনও তালাও নেই বোধহয়। বাইরে থেকে হ্যাস্পবোল্ট লাগিয়ে তালা ঝোলাতে হয়। ফার্নিচার বলতে স্রেফ একটা চারপায়া। বাথরুম সারার জন্য ঘরের কোনায় রাখা আছে জং ধরা একটা বালতি। মাথার উপর জ্বলছে নিঃসঙ্গ একটা বালব। নিম্নমানের জেলখানার সঙ্গে তেমন কোনও তফাৎ নেই জায়গাটার।

'থাকার জায়গা পছন্দ হয়েছে?' দরজার ফোকরে উদয় হলো

বেনসনের মুখ। 'না হলেও কিছু করার নেই। আগামী কিছুদিন এখানেই থাকতে হবে আপনাকে।'

'কতদিন?' জানতে চাইলেন হ্যামিলটন।

'সেটা নির্ভর করছে আপনার প্রিয়পাত্রটির উপর।'

'ততদিন কি হাতকড়া পরেই থাকতে হবে আমাকে?'

ফোকর দিয়ে ছোট্ট একটা চাবি ছুঁড়ে দিল বেনসন। 'হ্যাণ্ডকাফ খুলে ফেলুন। তারপর চাবি আর হ্যাণ্ডকাফ, দুটোই ফেরত দিন আমাকে।'

নির্দেশ পালন করলেন অ্যাডমিরাল।

'এখানকার নিয়ম-কানুন জানিয়ে দিই আপনাকে,' বলল বেনসন। 'যদি ঝামেলা না বাধান, তা হলে আরামে থাকবেন। তেড়িবেড়ি করতে গেলেই কঠিন শাস্তি পেতে হবে। যখন আমরা খাব, তখন আপনিও খাবার পাবেন। অসময়ে কোনও আবদার জুড়তে পারবেন না। বাথরুম নিজের কামরাতেই সারবেন, বালতি ভরে গেলে জানাবেন আমাদের; ওটা খালি করবার ব্যবস্থা করা যাবে। গোসল-টোসলের কথা কয়েকদিনের জন্য ভুলে থাকতে হবে। আর হ্যাঁ, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে—পালাবার কোনও চেষ্টা করবেন না। বেঘোরে মারা পড়বেন সেক্ষেত্রে। চেঁচামেচি করে কারও দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেও লাভ নেই। ভিতর থেকে ওয়্যারহাউসের আওয়াজ বাইরে যায় না। গেলেও লাভ হতো না। এটারই মত আশপাশের বিল্ডিংগুলোও খালি। কোনও প্রশ্ন আছে? নেই? গুড।'

বন্ধ হয়ে গেল ফোকরের ঢাকনা। কাটনারের গলা শুনতে পেলেন অ্যাডমিরাল, 'চলো, ছুকরিটার ঘুম ভাঙানো যাক। এবার ওর পালা।'

ক্লান্ত পায়ে চারপায়ার কাছে গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়লেন অ্যাডমিরাল। কিন্তু মাথার ভিতরে ঝড়ের বেগে কাজ করছে

মগজ। কিডন্যাপারদের হুমকি আমলে নেননি, ভাবছেন কীভাবে পালাবেন এখান থেকে। সন্দেহ নেই, তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হবে পুলিশ এবং এফবিআই-এর তরফ থেকে; কিন্তু ওদের অপেক্ষায় থাকতে রাজি নন তিনি। যত বেশি সময় তিনি আটকে থাকবেন এখানে, ততই কোণঠাসা হয়ে পড়বে রানা। বাধ্য হবে কঠিন কোনও ঝুঁকি নিতে। তা তিনি হতে দেবেন না কিছুতেই।

তবে হাজার চিন্তার ভিতর একটা চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে। তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসা ওই মেয়েটি কে? পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে ও কীভাবে জড়িত?

চোদ্দ

ব্রেমারটন ডকের এন্ট্রান্সের বাইরে, বোর্ডিঙের অপেক্ষায় গাড়িতে বসে আছে রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ড। আসার পথে নুমার নির্মাণাধীন বিল্ডিঙের সাইট থেকে বাহন বদলে নিয়েছে ওরা—রানার ভাইপার রেখে চড়ে বসেছে মুরল্যাণ্ডের ব্যক্তিগত টয়োটা সেডানে... যাতে আসন-সঙ্কটে ভুগতে না হয়। ওখান থেকে একটানে চলে এসেছে ডকে, অন্যান্য গাড়ির পিছনে লাইন ধরেছে ফেরিতে ওঠার জন্য।

ড্রাইভারের আসনে বসে আছে মুরল্যাণ্ড। তার পাশে বসে নিচু গলায় সেলফোনে কথা বলছিল রানা। ওর আলাপ শেষ হলে পিছনের সিট থেকে রেমি জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে কথা

বললে?'

'ঢাকায়... আমার বসের সঙ্গে,' সংক্ষেপে জানাল রানা। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় গেল না।

'মেজর জেনারেল রাহাত খান?'

বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকাল রানা।

'কাম অন, রানা,' একটু হাসল রেমি। 'তোমার ব্যাপারে ডিটেইলড্ রিসার্চ করেছি আমি। তুমি যে বিসিআই-এর সঙ্গে জড়িত, সেটাও এমন কোনও গোপন খবর নয়। রাহাত খান কী বললেন, তা-ই বলো। নুমার কাউকে ফোন না করে তুমি ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে কেন?'

শ্রাগ করল রানা। 'বুদ্ধি-পরামর্শের জন্য। তা ছাড়া অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আমার বসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। খবরটা সবার আগে তাঁকেই জানানো দরকার বলে মনে করেছি।'

'কোনও লাভ হয়েছে তাতে?'

'হ্যাঁ। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট ধরিয়ে দিয়েছেন বস—অ্যাডমিরাল সত্যিই গ্যারেটের হাতে বন্দি হয়েছেন কি না, তার কোনও অকাট্য প্রমাণ পাইনি আমরা।'

'পাইনি?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'তা হলে অ্যাডমিরালের সেলফোন গ্যারেটের হাতে গেল কী করে?'

'ওটা স্রেফ একটা ফোন কল, ববি,' বলল রানা। 'সিগনালটা ইন্টারসেপ্ট করেও ধোঁকা দেয়া যায়। মনে হবে ফোনটা গ্যারেটের হাতে... আসলে তা নয়।'

'তুমি সত্যি তা-ই মনে করো? গ্যারেট মিথ্যে ভয় দেখিয়ে কাজে নামাতে চাইছে আমাদেরকে?'

'উঁহুঁ। ওটা স্রেফ একটা সম্ভাবনা। অ্যাডমিরাল যে আটকা পড়েছেন ওর হাতে, তাতে আমার যদিও কোনও সন্দেহ নেই। তারপরেও নিশ্চিত হয়ে নেয়া ভাল না?'

'তা হলে নুমা হেডকোয়ার্টারে ফোন করছ না কেন? জিজ্ঞেস করো অ্যাডমিরালের লোকেশন ওরা জানে কি না।'

'এখুনি ফোন করলে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে। হুলস্থূল পড়ে যাবে গোটা দেশে। কিছুতেই একাকী গ্যারেটের সঙ্গে দেখা করতে পারব না আমরা। ল-এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সিগুলো আঠার মত লেগে যাবে আমাদের পিছনে—যাতে মিটিঙের জন্য হাজির হলেই অ্যারেস্ট করতে পারে গ্যারেটকে। অমন কিছু করতে গেলে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে কী করবে ও, তা তো জানোই।'

'তা হলে আমাদের ট্যাকটিক্স কী হবে?'

'আগে গ্যারেটের সঙ্গে মিটিং, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। দরকার হলে ঢাকঢোল পিটিয়ে চাউর করে দেব অ্যাডমিরালের নিখোঁজ-সংবাদ। অথবা গোপনে উদ্ধার অভিযান চালাবার জন্য রাজি করাব এফবিআই-কে। ইউ সি, যতক্ষণ গ্যারেটের সঙ্গে কথা না হচ্ছে, ততক্ষণ ইন ফ্যাক্ট কিছুই করার নেই আমাদের।'

'আর ও যদি বলে, এখুনি মাইডাস টাচের খোঁজে বের হতে হবে আমাদেরকে? যদি কোনও সময় না দেয় র‍্যাচেল বা অ্যাডমিরালকে উদ্ধার করবার?'

'যদি-টদি না, আমার তো মনে হয় তা-ই ঘটতে চলেছে,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'একটা ব্যাপার মেনে নেয়া ভাল—গ্যারেটের হাত থেকে ওঁদেরকে চট করে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। প্রচুর সময় এবং শ্রম দিতে হবে তার জন্য, ভাগ্যেরও সহায়তা দরকার। এক্ষুণি যদি আমাদেরকে কাজে না-ও নামায় গ্যারেট, অত বেশি সময় দেবে বলে মনে হয় না। এ-অবস্থায় একটাই কাজ করা যেতে পারে—ওর কথামত এক্সপিডিশনে যাব আমরা... তার ফলে নিরাপদ থাকবেন অ্যাডমিরাল... র‍্যাচেলও: পুলিশ আর এফবিআই-ও সময় পাবে গোপনে তদন্ত করবার... ওঁদেরকে উদ্ধার করবার!'

'তোমার বস কি এই পরামর্শই দিয়েছেন?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'হ্যাঁ। অ্যাডমিরালের ব্যাপারে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করবে না আমেরিকান কর্তৃপক্ষ। কিন্তু উদ্ধার তৎপরতা সফল করবার জন্য সময় চাই ওদের। গ্যারেটের প্রস্তাব মেনে নিয়ে সেই সময়টুকুই আদায় করে নেব আমরা।'

'আমার ভয় করছে, রানা।'

'সাহস রাখো। এত সহজে গ্যারেটকে জিততে দেব না আমরা। যেভাবেই হোক, উদ্ধার করব র‍্যাচেল আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে।'

রানার সেলফোন গুঞ্জন করে উঠল। একটা মেসেজ এসেছে, সঙ্গে দুটো ভিডিও অ্যাটাচমেণ্ট। সমস্ত সন্দেহের নিরসন ঘটল এর ফলে। বন্দি অবস্থায় র‍্যাচেল হ্যাডলি আর নুমা চিফকে দেখল ওরা। ভিডিও শেষ হলে গম্ভীর হয়ে গেল।

'এখন কী?' খানিক পরে জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'ফেরিতে ওঠো,' সামনের দিকে ইশারা করল রানা। বোর্ডিঙের সঙ্কেত দিচ্ছে ডক ওয়ার্কাররা। 'তারপর নাহয় কথা বলব মি. রেডক্লিফের সঙ্গে।'

'গ্যারেটের সঙ্গে মিটিঙের আগেই?' ইঞ্জিন চালু করে গিয়ার দিল মুরল্যাণ্ড।

'মি. রেডক্লিফকে ব্যাপারটার আভাস দিয়ে রাখা দরকার। বলে দেব যাতে খবরটা কয়েক ঘণ্টা চেপে রাখেন।'

র‍্যাম্প ধরে দু'মিনিটের মাথায় ভেহিকল ডেকে উঠে এল টয়োটা। তার পাঁচ মিনিট পর ডকের পাশ থেকে সরে এল ফেরি। রওনা হয়ে গেল সিয়াটলের উদ্দেশে।

গাড়ি পার্ক করে আপার ডেকে উঠে গেল রানা আর মুরল্যাণ্ড। রেমি গেল বাথরুমে। বৃষ্টিতে ভিজে মেকাপের যাচ্ছেতাই অবস্থা.

চেহারা একটু ভদ্রস্থ করে নেয়া দরকার।

বাথরুমে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়াল ও। ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে—দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে মুখ। রানা আর মুরল্যাণ্ড যতই সাহস জোগাক, নির্ভয় হতে পারছে না ও। মাইডাস টাচ তো নয়, আসলে আলেয়ার পিছে ছুটতে বলা হয়েছে ওদেরকে। যে কাজে কিছুতেই সফল হওয়া সম্ভব নয়। মনে হচ্ছে র‍্যাচেলের আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল।

ভাবনাটা চাবুকের মত আঘাত করল ওকে। নিজের অজান্তে ঝটকা দিয়ে সিধে হলো। কী ভাবছে এসব? বিনা লড়াইয়ে হার মানার পাত্রী তো ছিল না ও কোনোদিন! তা হলে এখন হাল ছাড়ছে কেন? সবচেয়ে বড় কথা, রানার মত যোগ্য একজন সহযোদ্ধা আছে ওর পাশে—তার পক্ষে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব।

মুখ-হাত ধুয়ে চুল আঁচড়াল রেমি। মুখে নতুন করে লাগাল প্রসাধন। তারপর বাথরুম থেকে বেরিয়ে রানা আর মুরল্যাণ্ডকে খুঁজে বের করল। জিজ্ঞেস করল, 'কোনও খবর আছে?'

'নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর... মি. জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে কথা বলেছি,' জানাল রানা। 'ওয়াশিংটনের শেরাটন প্রিমিয়ারে ঘণ্টাদুই আগে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে লাঞ্চ করেছেন উনি।'

'সে কী! তা হলে তাঁকে কিডন্যাপ করা হলো কখন?'

'সম্ভবত লাঞ্চের পর পরই। রেডক্লিফ বললেন, খাওয়া শেষ হবার পর একজন আর্মি অফিসার এসেছিল অ্যাডমিরালের কাছে। জয়েন্ট ফোর্সেস হেডকোয়ার্টারে যাওয়ার কথা বলে রেস্টুরেন্ট থেকে বের করে নিয়ে গেছে তাঁকে। কিন্তু ওখানে পৌঁছায়নি ওরা। আর্মি অফিসারকে ঠিকমত দেখেননি রেডক্লিফ। হোটেলের স্টাফদের কাছ থেকে খোঁজ নেবেন বলে জানিয়েছেন। এখনও উনি ওখানেই আছেন।'

'ব্যাটাদের ডেয়ারিং বললেও কম বলা হয়,' সখেদে বলল

মুরল্যাণ্ড। 'মিলিটারি সেমিনার চলছে শেরাটনে, সবখানে সামরিক লোক... তার মাঝ থেকে একজন অ্যাডমিরালকে তুলে নিয়ে গেল? বুকের পাটা আছে বলতে হবে!'

'বুঝতেই পারছ, কঠিন পাত্রের পাল্লায় পড়েছি আমরা।'

'তা হলে কীভাবে বুঝ দেবে গ্যারেটকে?' জিজ্ঞেস করল রেমি। 'মাইডাস টাচ একটা মিথ ছাড়া আর কিছু না। ওটাকে সত্য ভাবলে বোকামি করবে।'

'সব মিথের পিছনেই সত্যের সামান্য হলেও লেশ থাকে,' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'তা অবশ্য ঠিক,' একমত হলো রেমি। 'কিছু পণ্ডিত মনে করেন, মাইডাস নামে সত্যিই একজন মানুষ ছিল। তাঁদের ধারণা, প্রাচীন ফ্রিজিয়া... মানে এখন যেটাকে তুরস্ক বলি... তার রাজা ছিল লোকটা। তবে ওখানে জন্ম নেয়নি সে।'

'কোথায় জন্ম নিয়েছিল?'

'কিছু কাহিনিতে বলে ম্যাসেডোনিয়া। অন্য কোথাও হওয়াটাও বিচিত্র নয়। আসলে... এ-বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনও রেকর্ড পাওয়া যায়নি। তবে বাপের সঙ্গে উদ্বাস্তু হিসেবে ফ্রিজিয়ায় এসেছিল সে। কাকতালীয়ভাবে যেদিন ওরা এল, সেদিনই নাকি রাজ্যের পরবর্তী রাজা ষাঁড়ে টানা ওয়্যাগনে চেপে রাজধানীতে ঢুকবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এক ওরাকল। মাইডাসের বাবাকে তৎক্ষণাৎ রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় লোকজন।'

'একেই বলে কপাল!' সকৌতুকে বলল মুরল্যাণ্ড।

হাসল রেমি। 'তা তো বটেই। খুবই ইন্টারেস্টিং একটা গল্প। গর্ডিয়াস... মানে মাইডাসের বাবা ওয়্যাগনটাকেই নিজের সৌভাগ্যের উৎস বলে ভেবেছিলেন, ওটাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন দেবতা জিউসের নামে... কৃতজ্ঞতা হিসেবে। কোনোদিন যাতে ওটা হারিয়ে না যায়, সেজন্যে অত্যন্ত জটিল

এক গিঁঠের সাহায্যে ওয়্যাগনটাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল ফ্রিজিয়ার শহর-কেন্দ্রে। লোকে বলত—ওই গিঁঠ যে খুলতে পারবে, সে-ই পরবর্তীতে রাজা হবে গোটা এশিয়ার।'

'গর্ডিয়ান নটের গল্প বলছ তুমি,' রানা বলল। 'আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট শেষ পর্যন্ত ওটা খুলতে সক্ষম হন। তবে চাতুরি করেছিলেন তিনি, প্যাঁচ খোলার আগে তলোয়ারের খোঁচায় গিঁঠের কিছুটা অংশ কেটে নিয়েছিলেন।'

'রাইট। এ-কারণেই জটিল যে-কোনও সমস্যাকে আজও গর্ডিয়ান নট বলা হয়।'

'কী শুরু করলে তোমরা?' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমার মাথার ভিতরেই গিঁঠ লাগিয়ে দিচ্ছ! মাইডাসের কপালে কী ঘটেছিল, সেটা বলছ না কেন?'

'গর্ডিয়াসের পরে সিংহাসনে বসেছিল সে,' বলল রেমি। 'তবে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল, তা জানা নেই কারও। অনেক ধরনের থিয়োরি প্রচলিত আছে—কেউ কেউ ভাবে, তুরস্কে কবর দেয়া হয়েছে তাকে। আবার কারও ধারণা, আগ্রাসী পার্শিয়ানরা তাকে বিতাড়িত করেছিল। মিথ বলে, দেবতাদের বিরাগভাজন হয়েছিল সে; শাস্তি হিসেবে মানুষের কান বদলে গিয়ে গাধার কান গজায় তার মাথার দু'পাশে। লজ্জায় ফ্রিজিয়া থেকে পালিয়ে যায় মাইডাস, আর কখনও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি।'

'গল্প হিসেবে মন্দ নয়,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তবে মাইডাস টাচের ব্যাপারে আপনার ধারণাই বোধহয় সত্যি। আলকেমিস্টরা তো বহু চেষ্টা চালিয়েছে সীসাকে সোনা বানাবার। কিন্তু সফল হয়নি। কারণ ওটা সায়েণ্টিফিক্যালি অসম্ভব।'

'হাই স্কুলের পর থেকে সায়েন্সের সঙ্গে যোগাযোগ নেই আমার,' রেমি বলল। 'কেন ওটা অসম্ভব, একটু বুঝিয়ে বলবেন? মাইডাসের কাছে হয়তো গোপন কোনও ফর্মুলা ছিল, আমরা যেটা

জানি না?'

হাসল মুরল্যাণ্ড। 'কয়েক হাজার বছরের পুরনো ওই ফর্মুলায় তা হলে ফিশন রিঅ্যাকশনের উল্লেখ থাকতে হবে।'

'ফিশন মানে কি নিউক্লিয়ার?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুরল্যাণ্ড। 'ইউ সি... সীসার আণবিক ওজন স্বর্ণের চেয়ে বেশি। তারমানে স্বর্ণের চেয়ে বেশি প্রোটন আছে ওতে। তাই সীসাকে স্বর্ণ বানাবার একমাত্র উপায়—বাড়তি প্রোটন ঝরিয়ে ফেলা। আর যে-কোনও অ্যাটমের নিউক্লিয়াস থেকে প্রোটন সরানোকেই নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন বলে। স্বীকার করছি, নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটর ব্যবহার করে সীসাকে সোনা বানানো থিয়োরিটিক্যালি সম্ভব; কিন্তু ওতে খরচ এত বেশি পড়বে যে, উৎপাদিত সোনা বেচে লাভ হবে না কোনও। কষ্টটা সম্পূর্ণ মাঠে মারা যাবে।'

'তারমানে অলীক স্বপ্ন দেখছে গ্যারেট?'

'তা তো বটেই। বদ্ধ পাগল বললেও ভুল হবে না। কারণ ও যে-পদ্ধতিতে সোনা বানাতে পারবে বলে ভাবছে, সেটা জাদু ছাড়া আর কিছু না। কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক জাদুতে বিশ্বাস করে না।'

'বাহ্,' হালকা গলায় বলল রেমি, 'পাগল-ছাগলকে আকৃষ্ট করা ছাড়াও আপনার দেখছি আরও এক্সপার্টিজ আছে, ববি। রীতিমত সায়েন্টিস্ট!'

'উঁহুঁ, আমি সামান্য এক ইঞ্জিনিয়ার। আপনার মত পিএইচডি ডিগ্রি নেই আমার, রেমি। ভাল কথা, আপনি কি গ্রিক সভ্যতার উপরেই থিসিস করেছেন?'

'গ্রিক আর রোমান... দুটোই,' বলল রেমি। 'সাবজেক্টটাকে বলা হয় ক্লাসিকস্। আমি একজন ক্লাসিসিস্ট।'

'এত কিছু থাকতে ওই সাবজেক্ট কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দে ময়ন-এর এক খামারে বড় হয়েছি আমি,' বলল রেমি। 'বাবা-মা ধনী ছিলেন না, আইওয়া-র বাইরে কখনোই যাওয়া হয়নি আমার ছোটবেলায়। কিন্তু ইয়োরোপ দেখার খুব শখ ছিল আমার, ভেবেছিলাম ক্লাসিকসের উপর পড়াশোনা করলে শখটা পূরণ করা সহজ হবে। সেজন্যেই...'

'ক্লাসিসিস্ট থেকে টিভি সিলেব্রিটি হলে কী করে?'

'সে আর এক গল্প। ইয়োরোপ ভ্রমণের শখ পূরণের জন্য ক্লাসিকসে ভর্তি হয়েছিলাম, কিন্তু ভার্সিটিতে বছরদুই কাটাবার পরেই টের পেলাম—অ্যাকাডেমিক কাজ-কারবার আমাকে দিয়ে হবে না। ওই অবস্থায় নতুন করে কোনও সাবজেক্ট নেবার সুযোগ ছিল না, বাধ্য হই পিএইচডি শেষ করতে। ততদিনে বিশাল অঙ্কের স্টুডেন্ট লোনের তলায় চাপা পড়ে গেছি। রেজাল্ট বেশি ভাল ছিল না, কাজেই ভাল চাকরি জোগাড় করতে পারছিলাম না। এমন সময় *চেজিং দ্য পাস্ট*-এর জন্য অডিশনের বিজ্ঞাপন দেখে অ্যাপ্লাই করি তাতে। কপাল ভাল, কম্পিটিটরদের কারও কোনও ডিগ্রি ছিল না; প্রডিউসাররাও চাইছিল অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউণ্ড-সহ কাউকে হায়ার করতে। দর্শকের সামনে এক ধরনের অথেনটিকেশন সৃষ্টির প্রয়াস আর কী। ফলে সহজেই কাজটা পেয়ে যাই আমি। বাকিটা ইতিহাস। বছর ঘোরার আগেই সমস্ত লোন শোধ করে ফেলি আমি। অনুষ্ঠান হিট হওয়ায় মোটামুটি নামডাকও ছড়িয়ে পড়ে।'

তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখতে পেয়েছে রানা আর মুরল্যাণ্ড। ফেরিতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কয়েকজন যাত্রী ঘিরে ফেলেছিল ওদেরকে—রেমির অটোগ্রাফ নিয়ে তারপর ছেড়েছে। ভক্তদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সামান্য ছদ্মবেশ নিতে বাধ্য হয়েছে ও। বড় সানগ্লাসে চোখ ঢেকে মাথায় বেঁধেছে স্কার্ফ।

'তোমার বাবা-মা নিশ্চয়ই খুব গর্ব করেন তোমাকে নিয়ে,'

বলল রানা। 'এখনও কি আইওয়াতেই আছেন ওঁরা?'

'না। আমার বয়স পনেরো হবার আগেই মারা গেছেন, দুজনেই।'

'দুঃখিত।'

'দুঃখ পাবার কিছু নেই। খুব একটা খারাপ অবস্থায় নেই আমি বা র‍্যাচেল। আমারটা তো জানো, র‍্যাচেলও জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে আইন বিষয়ে পড়ছে।'

'আশা করি নামকরা লইয়ার হবে ও,' বলল রানা।

বিষাদ দানা বাঁধল রেমির চোখে। সত্যি কি সেটা সম্ভব? লেখাপড়া শেষ করা তো পরের কথা, আদৌ কি বাঁচানো যাবে র‍্যাচেলকে?

চোখ ছলছল করে উঠল ওর।

রেমির হাতে হাত রাখল রানা। দৃঢ় গলায় বলল, 'ওকে উদ্ধার করব আমরা। কথা দিচ্ছি!'

পনেরো

পয়লা দর্শনেই বুঝল রানা—দেখা করবার জন্য সাফেকো ফিল্ডের পাশটা কেন বেছে নিয়েছে গ্যারেট। আমেরিকার জাতীয় সেনসেশন বেসবলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ম্যাচ শুরু হতে চলেছে তিনটায়। স্টেডিয়ামে ঢোকার জন্য সাউথ-ইস্ট এন্ট্রান্সের সামনে ভিড় করছে খেলা-পাগল দর্শকরা... প্রতি মুহূর্তে সেই ভিড় বড় হচ্ছে আরও। বৃষ্টি থেমে গেছে খানিক আগে, ফলে মানুষের

অভাব নেই। রাস্তায় সুভ্যেনিয়ার বিক্রি করছে ভেণ্ডররা, ভক্তদের গালে প্রিয় টিমের প্রতীক এঁকে দিচ্ছে শিল্পীর দল। বাতাসে ভাসছে পপকর্ন আর নানা ধরনের ফাস্ট ফুডের গন্ধ। গাড়ির হর্নে কান ঝালাপালা, শেষ মুহূর্তে পার্কিং স্পেস নিয়ে ঝগড়া বেধে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। টিকেট বুথের সামনে ক্রীড়ামোদী মানুষের ঢল... চলছে হৈচৈ আর হল্লা। রীতিমত বিশৃঙ্খল পরিবেশ। এমন জায়গায় ঠিকমত নজরদারি করা অসম্ভব। মানুষের ভিড়ে চোখের পলকে মিশে যেতে পারবে গ্যারেট, উদয়ও হতে পারবে চোখের পলকে। ভেরি স্মার্ট, মনে মনে স্বীকার করল রানা।

খেলা না থাকলে পাঁচ মিনিটেই ডক থেকে পৌঁছুনো সম্ভব সাফেকোয়। কিন্তু আজ ট্রাফিক জ্যাম আর মানুষের অরণ্য পেরুতে পাক্কা বিশ মিনিট লেগে গেছে ওদের। স্টেডিয়ামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় পৌঁছেই ঘড়ি দেখল রানা। নির্ধারিত সময়ের মাত্র তিন মিনিট বাকি। একেবারে কানের পাশ দিয়ে গুলি গেছে। আরেকটু হলেই মিস করত গ্যারেটের টাইমটেবল।

গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে ব্যস্ত ভঙ্গিতে চোখ বোলাচ্ছে রেমি। রানার কাছে জানতে চাইল, 'গ্যারেট দেখতে কেমন?'

'ক্লিন শেভড়, রোদে পোড়া চামড়া,' বর্ণনা করল রানা। 'আমার চেয়ে সামান্য খাটো। মাথায় কোঁকড়া কালো চুল। চোখদুটো বাদামি। নাকটা একটু ভাঙা। ঠিক সুদর্শন বলা যাবে না ওকে।'

'কোথায় সেই নাকভাঙা শয়তান?' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'সময় তো হয়ে গেছে, ওকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'নিশ্চয়ই আশপাশে আছে,' অনুমান করল রানা। 'অপেক্ষা করা যাক।'

'সেই সঙ্গে পেটপুজো করলে ও আপত্তি করবে না আশা করি?' হাত তুলে কাছে দাঁড়ানো এক ফাস্ট ফুডের ভেণ্ডারকে

ডাকল মুরল্যাণ্ড, 'অ্যাই মিয়া, এখানে পাঁচটা হট ডগ দাও। যত তাড়াতাড়ি দেবে, তত বেশি বখশিশ পাবে।'

হট ডগ তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল লোকটা।

'এই অবস্থায় আপনি খেতে পারবেন?' চোখ কপালে তুলল রেমি।

'পারব না মানে?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'সকাল থেকে না খেয়ে আছি। পেটের ভিতর ছুঁচো না, রীতিমত হাতি দৌড়াচ্ছে। পাঁচটা চেয়েছি সে-জন্যেই। তিনটে আমার, বাকি দুটো আপনাদের।'

'আমি খাব না।' মাথা নাড়ল রেমি।

'আপনি উপোস থাকলে কোনও লাভ হবে না র‍্যাচেলের। তারচেয়ে খাওয়াদাওয়া করুন। না খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে বোনকে উদ্ধার করবেন কীভাবে?'

'ভুল বলেনি ও,' রানা একমত হলো। 'যুদ্ধে নামার আগে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে নেয়া ভাল।'

হটডগ নিয়ে এসেছে ভেণ্ডার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটায় কামড় বসাল রেমি। দাম মিটিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড, সঙ্গে বিশ ডলার বখশিশ। দাঁত বের হয়ে গেল ভেণ্ডারের।

খেতে খেতে চারদিকে চোখ বোলাল ওরা। আকার-আকৃতিতে মেলে এমন লোকের অভাব নেই, কিন্তু গ্যারেটের সঙ্গে চেহারা মিলছে না কারও। সে ছদ্মবেশ নিয়েছে কি না কে জানে, চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় রইল না।

খাওয়া শেষে পানির বোতলে চুমুক দিচ্ছে তিনজনে, এমন সময় খুব কাছ থেকে ভেসে এল একটা কর্কশ কণ্ঠ।

'হাউডি, ফ্রেণ্ডস!'

ঝট্‌ করে ঘাড় ফেরাল তিনজনে। মাত্র দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে গ্যারেট। জিন্সের প্যান্ট, আর সিয়াটল মেরিনার্স টিমের

ছাপ্পড়-মারা একটা ঢোলা জ্যাকেট পরে আছে সে—মাথায় জকি ক্যাপ। কাঁধে ঝুলছে একটা ব্যাকপ্যাক। আশপাশ দিয়ে ছুটতে থাকা আর দশটা বেসবল-দর্শকের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই।

হাসিমুখে এগিয়ে এল সে। থামল রানাদের ঠিক সামনে এসে। দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত দৃষ্টি-বিনিময় হলো। গ্যারেটের টুঁটি চেপে ইচ্ছেটা বহু কষ্টে দমাতে হলো রানাকে।

'একাই এসেছি আমরা,' শান্ত গলায় বলল ও।

'জানি,' বলল গ্যারেট। 'অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি তোমাদের। বলতে বাধ্য হচ্ছি, মি. মুরল্যাণ্ড, রাক্ষসের মত খাও তুমি। দৃশ্যটা শোভন নয়।'

'দেরি করে ফেলেছ,' নিরাসক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'আগে এলে তোমাকেও একটা হট ডগ অফার করতাম। ঘেয়ো কুকুর কীভাবে গরম কুকুর খায়... সেটা দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম আমরা।'

'এখনও খোঁচা মারছ?' ঝাঁঝালো গলায় বলল গ্যারেট। 'কোন্টা সৌভাগ্য, আর কোন্টা দুর্ভাগ্য তা টের পাবে খুব শীঘ্রি।'

'প্লিজ, আমার তর সইছে না।'

কথায় না পেরে রেমির দিকে ফিরল গ্যারেট। 'ওর অভব্যতার জন্য আমিই ক্ষমা চাইছি, ড. হ্যাডলি। বাই দ্য ওয়ে, সামনাসামনি তোমাকে টিভির চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে।'

'জাহান্নামে যাও!' রাগী গলায় বলল রেমি।

'সবাই দেখি একসঙ্গে অভদ্রতা দেখাতে শুরু করেছ,' আহত গলায় বলল গ্যারেট। 'এভাবে চললে তো কথা বলা মুশকিল।'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী নই আমরা,' চাঁছাছোলা গলায় বলল রানা। 'তবে একটা প্রস্তাব দিতে পারি—এখুনি যদি অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল হ্যাডলিকে মুক্তি দাও, তা হলে আমরা তোমাকে বিনা-প্যাঁদানিতে ছেড়ে দেব।'

হাসল গ্যারেট। 'চমৎকার এই অফার ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত।'

স্টেডিয়ামের এণ্ট্রান্সে ভিড় সামলানোয় ব্যস্ত পুলিশদের দিকে ইশারা করল মুরল্যাণ্ড। 'আমরা ডাক দিলেই ওরা এসে আটক করবে এই ছাগলটাকে। তারপর বন্দি-বিনিময় করা যেতে পারে, রানা। ওর বদলে অ্যাডমিরাল আর র‍্যাচেল। প্ল্যানটা কেমন?'

জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাল গ্যারেট। 'ভুলেও ও-কাজ করতে যেয়ো না। অমন সমস্যা মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়েই আমি এসেছি। বাইনারি এক্সপ্লোসিভের কথা ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই? দশ পাউণ্ড এক্সপ্লোসিভ আমার জ্যাকেটের লাইনিঙে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, পকেটে রেখেছি ট্রিগার। তোমরা কোনও চালাকি করতে গেলেই এখানে বোমা ফাটবে... নিরীহ মানুষ মরবে!'

বিস্ফারিত চোখে ডানে-বাঁয়ে তাকাল রেমি। নারী-পুরুষ-শিশু,.. সব ধরনের মানুষ এসেছে খেলা দেখতে। বোমা ফাটলে ভয়াবহ ব্যাপার হবে। 'না! আমি বিশ্বাস করি না তুমি এ-কাজ করবে!' বলে উঠল ও।

ঠোঁট বেঁকে গেল গ্যারেটের। 'ডারলিং, আমি কী করতে পারি আর না-পারি, সে-ব্যাপারে কোনও ধারণাই নেই তোমার।'

'আমি ওর সঙ্গে একমত,' বলল রানা। 'তোমাকে দেখে আত্মঘাতী টেরোরিস্ট বলে মনে হয় না। যা-ই ঘটুক, বোমা ফাটিয়ে সাধের পরিকল্পনার দফা-রফা করবে না তুমি।'

'আমাকে তুমি চেনো না, মাসুদ রানা,' থমথমে গলায় বলল গ্যারেট। 'তবে তোমার দুর্বলতা আমি ধরতে পেরেছি।'

'তা-ই? বললে খুশি হই।'

'তুমি সবাইকেই নিজের মত বাস্তববাদী আর যুক্তিশীল ভাবো।'

'তা তুমি নও?'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাসল গ্যারেট। 'তোমার-আমার পেশায় তিন ধরনের মানুষ আছে—সাহসী, মরিয়া এবং জিনিয়াস। লক্ষ্য পূরণের জন্য সাহসীরা সাধ্যমত চেষ্টা চালায়; মরিয়া লোক সাধ্যের চেয়েও বেশি কিছু করে। আর জিনিয়াস নেয় অচিন্তনীয় পদক্ষেপ। আমাকে তুমি কোন্ ক্যাটাগরির লোক ভাবছ?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। গ্যারেট অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কথাবার্তাও পরিষ্কার। পাগল বলে মনে হচ্ছে না মোটেই... অথচ খুঁজে বেড়াচ্ছে মাইডাস টাচের মত একটা অবাস্তব, কল্পিত জিনিস! জিনিয়াস, না পাগল? কে জানে। কিন্তু তার হুমকিটাকে অগ্রাহ্য করবার কোনও উপায় নেই। সত্যি সত্যি যদি বোমা ফাটায়, নিরীহ প্রাণ ঝরবে। অযথা ঝুঁকি নেবার কোনও মানে হয় না।

'বেশ,' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'তোমার কথা শোনা যাক। মাইডাস টাচের অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রমাণ আছে বলেছিলে... কী সেটা?'

'চলো, কোথাও বসি,' বলল গ্যারেট। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলে না।'

স্টেডিয়ামের সামনের পার্কে বেঞ্চি পাতা আছে, ওখানে বসল চারজনে।

'প্রথমেই তোমাদেরকে একটা গল্প শোনাতে চাই,' আলোচনা শুরুর ভঙ্গিতে বলল গ্যারেট। 'খুবই ইন্টারেস্টিং একটা গল্প...'

'মাইডাস টাচের গল্প আমরা জানি।'

'ওই গল্প নয়।'

'হোয়াটএভার, গ্যারেট। আমি বলতে চাইছি যে, তুমি আমাদেরকে মরীচিকার পিছনে ছোটাতে চাইছ। মাইডাস টাচ বলে কিছু নেই।'

'এখানে আমি দ্বিমত পোষণ করছি,' বলল গ্যারেট। 'কেন করছি, তাও শোনো। নিজ চোখে আমি মাইডাস টাচের কীর্তি দেখেছি।'

বিস্ময়ের ধ্বনিটা নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এল রানার মুখ দিয়ে। 'নিজ চোখে? তারমানে তুমি রাজা মাইডাসের দেখা পেয়েছিলে?'

'এক অর্থে... হ্যাঁ।'

'কীভাবে?'

'ওই গল্পই তো শোনাতে চাইছি।' কাঁধ থেকে ব্যাকপ্যাক নামিয়ে রাখল গ্যারেট। বেশ ভারী ওটা, ভিতরে কী আছে বুঝতে পারল না রানা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়ল গ্যারেট। বলল, 'বারো বছর বয়সে বাবা-মায়ের সঙ্গে নানাবাড়িতে গিয়েছিলাম আমি—ইটালির নেপলসে। ও হ্যাঁ, আমার মা ইটালিয়ান ছিলেন... এ-কথা সম্ভবত জানো না তোমরা। এনিওয়ে, ওখানে মায়া নামে আমার এক খালাতো বোনের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। দু'জনে একসঙ্গে পুরো নেপলসের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতাম। ওর সঙ্গে শহরের তলার টানেলে ঢুকে মাইডাস টাচের দেখা পাই আমি।'

'কীসের টানেল?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'ভলক্যানিক টাফের উপর গড়ে উঠেছে নেপলস নগরী,' লেকচারের ভঙ্গিতে বলল গ্যারেট। 'ওই টাফ সহজেই খোঁড়া যায়। গ্রিকরা... মানে যারা ওই নগরের গোড়াপত্তন করেছিল... বেশ বুদ্ধিমান ছিল। ভলক্যানিক টাফ খুঁড়ে ঘর-বাড়ি বানাবার মাটি-পাথর সংগ্রহ করত ওরা। পরে ওরা সেই টাফের ভিতর দিয়ে অ্যাকোয়া-ডাক্ট, মানে পানিবাহী সুড়ঙ্গও তৈরি করে। অ্যাকোয়া-ডাক্টের সাহায্যে আশপাশের বিভিন্ন হ্রদ আর নদী থেকে সুপেয় পানির জোগান দেয়া হতো নগরবাসীকে। সেই সব সুড়ঙ্গের বিশাল এক জাল আজও টিকে আছে নেপলসের তলায়। এই নেটওয়ার্ক এতই বিস্তৃত এবং জটিল যে, এমন বহু জায়গ

আছে, যেখানে গত কয়েক হাজার বছরে কারও পা পড়েনি।'

'ওখানেই মাইডাসের দেখা পেয়েছিলে তোমরা?' জিজ্ঞেস করল রেমি। কণ্ঠে অবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট।

মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। জ্বলজ্বল করে উঠল তার চোখ। 'ওই স্মৃতি আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। সোনায় মোড়া একটা চেম্বারে ঢুকেছিলাম আমরা। অনেকটা পুরনো আমলের সমাধির মত। সোনায় গড়া একটা কফিন দেখেছিলাম ওখানে। আর দেখেছিলাম সুন্দরী এক মেয়ের নিরেট সোনার মূর্তি—চেম্বারের ঠিক মাঝখানে, ছয় ফুট বাই ছয় ফুট সাইজের সোনার একটা ব্লকের উপরে দাঁড় করানো ছিল ওটা। সবদিক থেকে একেবারে নিখুঁত—যেন সত্যিকার একজন মানুষের গায়ে সোনালি রঙ মেখে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। একমাত্র খুঁতটা ছিল শুধু ডান হাতে—অসম্পূর্ণ ছিল ওটা। মনে হচ্ছিল কবজির নীচ থেকে হাতটা কেউ কেটে নিয়েছে। আমার ধারণা: ওটা আসলে সেই রাজকন্যা, যাকে আদর করতে গিয়ে মূর্তি বানিয়ে ফেলেছিলেন রাজা মাইডাস। সমাধিটাও তাঁরই।'

দ্বিধায় ভুগতে শুরু করল রানা। বানানো গল্প শোনাচ্ছে না তো গ্যারেট? অমন কোনও আবিষ্কার যদি নেপলসের শহরের তলায় করে থাকে ও, তার খবর কাউকে বলেনি কেন? মাত্র বারো বছর বয়স ছিল গ্যারেটের, ওই বয়সের বাচ্চারা নিজের কৃতিত্ব ফলাও করে জানায় সবাইকে; সমাধি বা সোনার মূর্তির খবর গোপন রাখে না।

'যা বলছ, তার কোনও প্রমাণ দেখাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল ও। 'ছবি-টবি তুলে রেখেছিলে?'

'উঁহুঁ, ক্যামেরা ছিল না আমাদের সঙ্গে,' মাথা নাড়ল গ্যারেট। 'তবে ছবির চেয়েও ভাল প্রমাণ আছে আমার কাছে। ওটা দেখাবার জন্য সকাল থেকে অপেক্ষা করছি।' ব্যাকপ্যাকটা রানার

দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। 'ব্যাগের মুখ খুলে উঁকি দাও ভিতরে। সাবধান, জিনিসটা বের কোরো না!'

কৌতূহলী হয়ে ভারী ব্যাগটা হাতে নিল রানা। কোলের উপর রেখে চেইন খুলল। রেমি আর মুরল্যাণ্ডও কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকল ওর দিকে।

প্রথমে কিছু দেখা গেল না, ব্যাগের ভিতরটা অন্ধকার। মুখটা আলোর দিকে ঘুরিয়ে আবার উঁকি দিল রানা। স্টাইরোফোমে প্যাঁচানো একটা আকৃতি চোখে পড়ল এবার। হাত ঢুকিয়ে আবরণ খুলে ফেলল ও, সঙ্গে সঙ্গে রোদের আভায় সোনালি ঝিলিক দিয়ে উঠল জিনিসটা।

হাত বের করে ভালমত তাকাল রানা। থমকে গেল। পাশ থেকে আঁতকে ওঠার মত আওয়াজ করল রেমি।

মুরল্যাণ্ড বলল, 'যা ভাবছি, এটা কি তা-ই?'

কোনও সন্দেহ নেই। ব্যাগের তলায় শুয়ে আছে সোনায় গড়া নিখুঁত একটা হাত!

ষোলো

হতভম্ব হয়ে গেছে ওরা। ব্যাগের ভিতরের জিনিসটা সোনার হাত বলে নয়, হাতটা আশ্চর্য রকম নিখুঁত বলে। চামড়ার সমস্ত ভাঁজ, এমনকী রোমকূপগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। হাতের তালুতে হাজারো আঁকাবাঁকা রেখা, ঠিক যেমনটা রক্তমাংসের তালুতে থাকে।

কবজি পর্যন্ত হাতটার দৈর্ঘ্য। আরেকটু ভাল করে পরখ করবার জন্য ব্যাগের মুখের কাছে ওটাকে তুলে আনল রানা। যেখানে শেষ হয়েছে হাত, সেই কাটা জায়গাটায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শিরা-উপশিরা, লিগামেন্ট, পেশি আর হাড়ের সমস্ত খুঁটিনাটি। এমনকী জটিল নকশার ডিজাইনে সত্যিকার অস্থিমজ্জা যেভাবে হাড়ের ভিতর সাজানো থাকে, তা-ও আছে এই হাতে। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে ভাস্কর্য নয়, অ্যাটানমি বইয়ে মানব-হস্তের ক্রস-সেকশনের ছবি ওটা।

মুখের ভাষা হারাল রানা, রেমি ও মুরল্যাণ্ড।

ওদেরকে চমকে দিতে পেরে বিজয়ীর হাসি হাসল গ্যারেট। বলল, 'এটা মাইডাসের মেয়ের সেই হারানো হাত। মাসছয়েক আগে জোগাড় করেছি। ছোটবেলায় দেখা মূর্তিটার সঙ্গে এটা পুরোপুরি মিলে যায়।'

'কোথায় পেয়েছ এই জিনিস?' সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'সেটা ইম্পরট্যান্ট নয়।'

'আমি জানি,' বলল রেমি। শ্বাস নিল বড় করে। 'কারণ এই হাতটা আমি আগেও দেখেছি।'

বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকাল রানা। 'কোথায়?'

'টিভিতে,' বলল রেমি। 'ছ'মাস আগে বেশ মাতামাতি হয়েছিল এ-নিয়ে। প্রয়াত এক ইংরেজ লর্ডের ব্যক্তিগত কালেকশনে পাওয়া যায় হাতটা। প্রাথমিকভাবে যারা এটা দেখেছে, তারা ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিল। কিছুতেই বুঝতে পারেনি কীভাবে এমন নিখুঁত একটা ভাস্কর্য তৈরি করা সম্ভব। তবে বিস্তারিত গবেষণার সুযোগ পায়নি কেউ। হাতটা নিলামে তোলার কথা ছিল... কিন্তু তার আগেই লণ্ডনের এক অকশন হাউসের ভল্ট থেকে চুরি হয়ে যায় জিনিসটা।'

'বুঝতেই পারছ, আমি তোমাদেরকে অবাস্তব কোনও জিনিস খুঁজতে বলছি না,' বলল গ্যারেট।

রাগী চোখে তার দিকে ফিরল রেমি। 'অকশন হাউসের ভল্টে তা হলে তুমিই হানা দিয়েছিলে? ওখানে দু'জন গার্ডকেও খুন করেছ।' পরিষ্কার অভিযোগ ওর কণ্ঠে।

'ওরা আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল,' সংক্ষেপে বলল গ্যারেট। ব্যাখ্যাটা এত নিস্পৃহ ভঙ্গিতে দিল যে, মনে হলো মানুষ নয়, মশা মেরেছে সে। শীতল প্রতিক্রিয়াটাই বুঝিয়ে দিল, সে আসলে একজন ঠাণ্ডা মাথার খুনি।

পার্ক-বেঞ্চের উপরে সিধে হয়ে বসল মুরল্যাণ্ড। বলল, 'ওটা সত্যিকার হতে পারে না। ভাস্কর্য হতে দোষ কোথায়? দক্ষ শিল্পীর হাতে যে-কোনও শিল্পই জীবন্ত হয়ে ওঠে।'

'তাই বলে এতটা নয়,' বলল গ্যারেট। 'মাইক্রোস্কোপের তলায় রাখলে দেখতে পাবে, সূক্ষ্মতম জায়গাতেও কারুকাজ আছে ওটার। এত সূক্ষ্ম কাজ হাতে তো দূরের কথা, মেশিনেও করা কঠিন।'

ব্যাগটা রানার কাছ থেকে নিয়ে নিজের কোলের উপর রাখল রেমি। ভালমত দেখল হাতটা। গ্যারেটের কথাই ঠিক। পেশি, শিরা, চামড়া আর হাড়ের প্রতিটা ডিটেইলস্ যেভাবে ফুটে উঠেছে হাতটার ক্রস-সেকশনে, তা কৃত্রিমভাবে বানানো সত্যিই কঠিন। দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ শিল্পীও মানুষের হাতের এত নিখুঁত রেপ্লিকা তৈরি করতে পারবে না।

'ইন্টারেস্টিং!' মন্তব্য করল ও। 'এর দাম কত হতে পারে?'

'বর্তমান বাজার দরে শুধু সোনার দামই আশি হাজার ডলার,' বলল গ্যারেট। 'সেই সঙ্গে যদি অ্যান্টিক মূল্য যোগ করা হয়... আমার ধারণা... তিন-চার মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। যদি ক্রেতা জোগাড় করতে পারো আর কী। এ-ধরনের চোরাই মাল বিক্রি

করা কঠিন। হাতে-গোনা দু'তিনজন ছাড়া আর কেউ কিনবে না এ-জিনিস।'

'আমাদেরকে এটা দেখাতে গেলে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কারণ তোমাদেরকে বিশ্বাস করানো দরকার—যেটার খোঁজে বেরুচ্ছ, সেটার অস্তিত্ব সত্যি সত্যি আছে। নইলে তোমরা ভাববে আমি একটা উন্মাদ, মরীচিকার পিছে তোমাদের সময় নষ্ট করছি। অভিযানে সফল হবার জন্য যতটা দরকার ঠিকমত ততটা চেষ্টা চালাবে না। বরং আমার অগোচরে ফন্দিফিকির করবে—কীভাবে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেলকে উদ্ধার করা যায়। বাই দ্য ওয়ে, আবার জানিয়ে দিচ্ছি, সেটা সম্ভব নয়। কাজেই আমার নির্দেশমত না চললে ওদেরকে ফিরে পাবার কথা ভুলে যেতে পারো।'

'তুমি তো দেখি সবজান্তা!' টিটকিরি মারল মুরল্যাণ্ড।

নির্বিকার রইল গ্যারেট। বলল, 'সবজান্তা হলে তোমাদেরকে প্রয়োজন হতো না আমার। সে-সব কথা থাক, তোমরা কী ঠিক করলে, সেটাই বলো।'

দুই সঙ্গীর সঙ্গে চোখাচোখি করল রানা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে। আর কোনও উপায় নেই যখন, তুমি যা চাও, তা-ই করব আমরা।'

'গুড,' হাত বাড়িয়ে দিল গ্যারেট। 'ব্যাগটা তা হলে ফেরত দাও।'

চেইন আটকে ব্যাকপ্যাকটা ফিরিয়ে দিল রানা। বলল, 'একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়নি। ধরে নিলাম তোমার সব কথা সত্যি। মানে, মাইডাস টাচের অস্তিত্ব আছে... এবং নেপলস্ শহরের তলায় লুকিয়ে আছে সেই টাচের রহস্য আর বিপুল গুপ্তধন। তুমি তো ওটা দেখেছ... কোথায় আছে, তাও জানো।

তা হলে নিজেই গিয়ে উদ্ধার করে আনছ না কেন? কেন এর সঙ্গে জড়াচ্ছ আমাদেরকে?'

'আগে একবার দেখেছি বলেই ওই গোল্ডেন চেম্বার আবার খুঁজে বের করতে পারব, এমন কোনও কথা নেই,' তিক্ত গলায় বলল গ্যারেট।

'হেঁয়ালি করছ?' বিরক্ত হলো রানা।

'ব্যাপারটা বেশ জটিল, ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় লাগবে। শুধু এটুকু বলি—চেম্বারে যাবার দুটো রাস্তা আছে। প্রথমবার যে-রাস্তায় গিয়েছিলাম, সেখান দিয়ে এখন আর যাওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। কেন, সেটা তোমাদের না জানলেও চলবে। তা ছাড়া... ওখান দিয়ে ঢুকলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে, তা-ও নয়। সুড়ঙ্গগুলো স্রেফ একটা গোলকধাঁধা। পথ হারিয়ে ওই চেম্বারের খোঁজ পেয়েছিলাম আমরা। ফিরেছি বহু কষ্টে। পথে চিহ্ন-টিহ্ন দেবার, বা রাস্তা চিনে রাখবার মত মনের অবস্থা ছিল না।'

'দ্বিতীয় রাস্তাটা কোথায়?'

'ওটা খুঁজে বের করাই তোমাদের দায়িত্ব। আর সেজন্যে গ্রিক পণ্ডিত আর্কিমিডিসের বানানো একটা ম্যাপ দরকার হবে তোমাদের। সেই ম্যাপের ভিতর আছে মাইডাসের সমাধি... মানে ওই গোল্ডেন চেম্বারে পৌঁছুনোর পথনির্দেশ।'

'জাস্ট আ মিনিট,' বলে উঠল রেমি। 'আর্কিমিডিস কমপক্ষে দু'হাজার বছর আগেকার মানুষ। এত পুরনো ম্যাপ এখনও টিকে আছে, তা নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে? ম্যাপ টিকে থাকলেও... ওটা যে কাজে লাগানো যাবে, তা-ই বা ভাবছ কেন? দু'হাজার বছরে গ্রিক, সাইরাকিউজান, রোমান আর ইটালিয়ানদের হাতে বহুবার ভাঙাগড়ার শিকার হয়েছে শহরটা। মাউন্ট ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে ধ্বংসও হয়েছে কয়েকবার। এখন আর আদি শহরের

সঙ্গে কোনও মিলই নেই ওটার।'

'তুমি সারফেসের কথা বলছ। কিন্তু মাটির তলার টানেলগুলো এখনও আগের মতই আছে,' পাল্টা যুক্তি দেখাল গ্যারেট। 'আমি আর মায়া যখন ওখানে ঢুকেছিলাম, বেশ কয়েক জায়গার ছাতে কুয়োর ফুটো দেখেছি। পুরনো আমলে ওইসব কুয়োই ছিল অ্যাকোয়াডাক্টে ঢোকার আসল এণ্ট্রান্স। পুরো নেপলসে ওই ধরনের কয়েক হাজার কুয়োমুখ আজও আছে। বেশিরভাগই বুজিয়ে ফেলা হয়েছে, তবে কিছু কিছু এখনও খোলা পাওয়া যাবে। আমার জানা প্রয়োজন, আর্কিমিডিসের ম্যাপ অনুসারে কোন্‌টা দিয়ে ঢুকতে হবে আমাদের... এবং টানেলে ঢোকার পর কীভাবে পৌঁছুনো যাবে গোল্ডেন চেম্বারে। পুরোটাই আসলে এক ধরনের ধাঁধা। আর সেই ধাঁধার সমাধান করতে হবে জিয়োলেবের সাহায্যে।'

'সে-কারণেই ফেরিতে পরীক্ষা নিয়েছ আমাদের?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। 'আর্কিমিডিসের পায্‌ল তোমরা ভাঙতে পারো কি না, জানা প্রয়োজন ছিল। কারণ পায্‌লটা না ভাঙলে জিয়োলেব ব্যবহার করা যাচ্ছে না। আর জিয়োলেব ব্যবহার করা না গেলে গোল্ডেন চেম্বারের লোকেশন বের করা অসম্ভব।'

'পায্‌লটা আগেই আমাকে দেখাওনি কেন... যখন জিয়োলেব দেখাতে এসেছিলে?'

'তখনও আর্কিমিডিসের কোডেক্সের সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করতে পারিনি আমি। যতটুকু করেছিলাম, তাতে জিয়োলেব বানাবার নিয়ম-কানুন লেখা ছিল। তা দেখে ডিভাইস তো বানিয়ে ফেললাম, কিন্তু ব্যবহার করতে পারছিলাম না। তাই তোমার সাহায্য চেয়েছিলাম। পরে যখন পুরো কোডেক্সের অনুবাদ শেষ

হলো, দেখলাম স্টোমাকিয়োনের ধাঁধার মাধ্যমে জিয়োলেবের অপারেশন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওটা ভেদ করবার ক্ষমতা ছিল না আমার। তুমিও আমাকে এড়িয়ে চলছিলে। অগত্যা চরম ব্যবস্থা নিতে হলো।'

'হুম। এখন তা হলে আমাদেরকে আর্কিমিডিসের ওই ম্যাপ খুঁজে বের করতে হবে?'

'কারেক্ট। এবং সেটা নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে।'

'খুব তাড়া দেখছি! কবে নাগাদ চাও?'

'সামনের রোববার রাতের মধ্যে ম্যাপটা আমাকে এনে দেবে তোমরা। নেপলসে!'

'ঠাট্টা করছ?' কপালে ভাঁজ পড়ল রানার। 'আজ বুধবার। তুমি চাও আগামী চারদিনের ভিতরে আমরা দু'হাজার বছরের পুরনো একটা রহস্য ভেদ করব? সেটা কোনোদিন সম্ভব?'

'অসম্ভবকে সম্ভব করবার ব্যাপারে সুনাম আছে তোমার, রানা। তা ছাড়া আমিও নাচার। চারদিনের মধ্যে যদি মাইডাসের সমাধি খুঁজে বের করতে না পারি... আর কোনোদিনই পারব না। ওটা আরেকজনের হাতে চলে যাবে।'

'কার হাতে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল রেমি।

'আমার কাজিন এবং ছোটবেলার সেই বান্ধবী মায়ার হাতে।'

'মানে যার সঙ্গে গোল্ডেন চেম্বারে ঢুকেছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ। তবে এখন আর বন্ধুত্ব নেই আমাদের মাঝে, বরং সৃষ্টি হয়েছে প্রতিযোগিতা—মাইডাসের ওই সমাধিতে ফিরে যাবার প্রতিযোগিতা। ওর ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি। বড়ই ডেনজারাস স্বভাবের মেয়ে। যদি জানতে পারে তোমাদের হাতে আর্কিমিডিসের সূত্র আছে, নির্ঘাত কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে। খুনখারাপিও হতে পারে। কাজেই সাবধান!'

'আমাদের কাছে তো আর্কিমিডিসের সূত্র নেই!'

'থাকবে। লণ্ডনের ওই অকশন হাউস থেকে সোনার হাত ছাড়াও আর্কিমিডিসের একটা কোডেক্স চুরি করেছি আমি। ওটার ভিতরেই আছে সমস্ত সূত্র—কীভাবে পৌঁছুনো যাবে মাইডাসের সমাধিতে।'

'জিয়োলেব আর স্টোমাকিয়োন বানাবার নির্দেশনা কি ওটা থেকেই পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল গ্যারেট। 'কোডেক্সের কয়েকটা পাতার ফটোকপি আমি আগেই দেখিয়েছি তোমাকে। এবার পুরোটাই দেখবে। ক্লাসিকসের এক রিটায়ার্ড প্রফেসরের মাধ্যমে কোডেক্সের অনুবাদ করিয়েছি আমি, জিয়োলেব আর স্টোমাকিয়োন তৈরিতেও লোকটা সাহায্য করেছে আমাকে। পারলে ওকেই ফিল্ডে পাঠাতাম, কিন্তু একেবারেই হাড় জিরজিরে বুড়ো সে... এ-ধরনের কঠিন কাজ সম্ভব ছিল না ওর পক্ষে।'

'কে এই প্রফেসর?'

'ওর পরিচয় নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। এখন আর সে বেঁচে নেই।'

গ্যারেটের দৃষ্টি দেখে সন্দেহ হলো রানার—প্রফেসর সম্ভবত বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যাননি।

ট্রান্সলেশন, আর মূল কোডেক্সের ফটোগ্রাফ... দুটোই আমি ই-মেইল করে পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে,' বলে চলল গ্যারেট। 'আশা করি খোঁজাখুঁজির কাজে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে পারবে তাতে। তবে আমার ধারণা, কিছু একটা মিস করে গেছে প্রফেসর। তোমাদের দায়িত্ব হবে সেটা খুঁজে বের করা। জিয়োলেবটাও থাকছে তোমাদের কাছে। কদ্দূর কী অগ্রগতি হলো, তার ডেইলি রিপোর্ট চাই। যদি ব্যর্থ হও, কিংবা আমার মনে হয় যে, কিছু গোপন করছ তোমরা... অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেলের একটা করে আঙুল কেটে নেব। বুঝতে পেরেছ?'

হুমকি শুনে ভয় ফুটল রেমির চোখে।

'তার কোনও প্রয়োজন পড়বে না। নিয়মিত রিপোর্ট পাবে আমাদের।' বলল রানা। 'কিন্তু তোমার কাছ থেকেও পাল্টা রিপোর্ট চাই আমরা। বন্দিরা যে অক্ষত আছে, তার প্রমাণ দেখাতে হবে তোমাকে।'

'অলরেডি দুটো ভিডিও দেখেছ,' মনে করিয়ে দিল গ্যারেট।

'সেটা তো আজকের জন্য। প্রতিদিনই একটা করে ভিডিও চাই আমরা, যাতে বুঝতে পারি—অ্যাডমিরাল আর র‍্যাচেল কোনও আঙুল খোয়ায়নি। যদি তা না করো, আমাদের বোঝাপড়া ওখানেই খতম। তোমাকে শিকার করতে বেরুব তখন আমি। বুঝতে পেরেছ?' গ্যারেটের সুর নকল করল রানা।

'যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব,' মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। 'আমি রাজি। প্রতিদিন নতুন ভিডিও পাবে।' স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় পাতলা হতে শুরু করেছে, দর্শকরা ঢুকে পড়েছে মাঠে। 'আমাকে এবার উঠতে হয়।' বলে বেঞ্চ ছাড়ল সে, কাঁধে ঝোলাল ব্যাকপ্যাক। 'যোগাযোগ রেখো।'

'কখন পাঠাচ্ছ কোডেক্সের কপি?' পিছন থেকে জানতে চাইল রেমি।

'খুব শীঘ্রি।' বলে উল্টো ঘুরল গ্যারেট। 'শেষ একটা কথা। পুরো ব্যাপারটার গুরুত্ব একটু ভালভাবে ভেবে দেখো। আমার সারাজীবনের স্বপ্ন এটা... জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। কাজেই কোনও ধরনের ভুল বা ব্যর্থতা সহ্য করা কঠিন আমার জন্য। রোববারে নেপলসে হাজির থাকব, তখন যদি আমাকে দেখাবার মত কোনও রেযাল্ট না থাকে, তোমাদের ওখানে যাবারই দরকার নেই। ধরে নিয়ো সব চুকেবুকে গেছে।'

আকাশে চাপা গর্জন করে উঠল মেঘ। নামল গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। মাথায় জ্যাকেটের হুড তুলে দিয়ে মানুষের ভিড়ে মিশে গেল

গ্যারেট। যতক্ষণ দেখা গেল, লোকটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রেমি।

'ওকে আমার খুন করতে ইচ্ছে করছে,' দাঁতে দাঁত পিষে বলল ও। 'কথার কথা না, সত্যি সত্যি!'

'ওর চামড়া ছিলে লবণ মাখিয়ে দিতে পারলে আরও বেশি খুশি হতাম,' যোগ করল মুরল্যাণ্ড।

'তাতে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বা র‍্যাচেলের কোনও উপকার হতো না,' বলল রানা। 'তারচেয়ে ও যা চাইছে, সেটা সম্ভব কি না, ভেবে দেখা যাক।'

'সত্যি সত্যি মাইডাসের সমাধি খোঁজার কথা ভাবছ তুমি?' ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করল রেমি।

'অন্তত মাইডাস টাচ খোঁজার চেয়ে সমাধি খোঁজা তো সহজ! তা ছাড়া... অস্বীকার করব না... আমাকে কৌতূহলী করে তুলেছে গ্যারেট। আর্কিমিডিস আর কিং মাইডাস—এই কম্বিনেশনটাই খুব ইন্টারেস্টিং। অভিযানে না গিয়ে উপায় নেই আমাদের... আর যাবই যখন, ভালমত খুঁজতে অসুবিধে কী?'

'কথাটা অবশ্য মন্দ বলোনি,' হাসল মুরল্যাণ্ড। 'সফল হতে পারলে গ্যারেটকে ল্যাঙ মেরে গোল্ডেন চেম্বারের সমস্ত গুপ্তধন কেড়ে নেয়া যাবে। আমাদের তরফ থেকে ওটাই হবে ওর শাস্তি।'

সতেরো

আধঘণ্টা পরেই চলে এল গ্যারেটের ই-মেইল। অ্যাটাচমেণ্ট হিসেবে সঙ্গে রয়েছে আর্কিমিডিসের কোডেক্সের সবগুলো পাতার ফটোগ্রাফ, এবং তার অনুবাদ। রানা তখন গেস্ট হাউসে ফিরে এসেছে, রেমিকে পাঠিয়ে দিয়েছে হোটেলে—জামা-কাপড় বদলে নেবার জন্য। মুরল্যাণ্ডও নুমা হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কো-অর্ডিনেশন সেরে নেবে বলে চলে গেছে। রানার গেস্ট হাউসেই পরে আবার মিলিত হবে তিনজনে।

কোমরে তোয়ালে পেঁচিয়ে বাথরুমে ঢুকল রানা। সময় নিয়ে শাওয়ার সারল, ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলল শরীরের সমস্ত ক্লান্তি। বেরুল একদম ঝরঝরে, তরতাজা হয়ে। ক্লজিট খুলল ও। কিছু শার্ট ও ট্রাউজার ঝুলছে, নীচে রয়েছে চকচকে কয়েক জোড়া জুতো। জিন্সের প্যান্ট আর একটা নীল সুতি শার্ট পছন্দ করল, আর নিল একজোড়া শু। বেডরুমে গিয়ে পরে ফেলল ওগুলো।

এরপর কম্পিউটারে বসল ও। দুটো অ্যাটাচমেণ্ট-ই প্রিণ্ট করে নিল তিন সেট। ওগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে স্ট্যাপলার করতে করতেই বেল বাজল সদর দরজায়। রেমি।

দরজা খুলতেই ওর হাতে বড়-সড় একটা সুটকেস দেখতে পেল রানা। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

'আমার লাগেজ,' বলল রেমি। 'একসঙ্গে কতটা সময় থাকতে হবে, তার তো কোনও ঠিক নেই। হোটেল থেকে ছোটাছুটি

করতে পারব না। তাই তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে এলাম। সরো একটু, ভিতরে ঢুকতে দাও আমাকে।'

'ওহ্, নিশ্চয়ই!' তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে সুটকেস নিল রানা। ঘরে ঢোকাল।

'আমাকে অবাঞ্ছিত অতিথি ভেবো না,' গা থেকে ওভারকোট খুলতে খুলতে বলল রেমি। 'স্রেফ কাজের সুবিধের কথা ভেবে চলে এসেছি। যদি আপত্তি করো তো এখুনি চলে যাব।'

'আমার আপত্তি কীসের?' ড্রয়িংরুমের টেবিলে সুটকেস নামিয়ে রাখল রানা। 'এসব ব্যাপারে মেয়েরাই বরং আপত্তি করে। ভাবে একটা ছেলের সঙ্গে এক ছাদের তলায় থাকলে বদনাম হয়ে যাবে।'

'বদনামের ভয় আমি করি না,' বলল রেমি। 'তা ছাড়া কিছু ঘটলেই বা কী এসে যায়? তুমি তো আর বিবাহিত নও।'

বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকাল রানা। 'কী করে জানছ আমার গার্লফ্রেণ্ড নেই?'

'ওফ্ফো,' বিব্রত হলো রেমি। 'আমার মাথায় তো এ চিন্তা আসেইনি! যেমন কাঠখোট্টা লোক! ...অমন কেউ আছে নাকি?'

'না, নেই। কিন্তু থাকতে তো পারত! ভাবলে না কেন?'

'কী জানি! বোধহয় তোমাকে আমি নিজের মতই ভেবেছি। আত্মকেন্দ্রিক, কাজ-পাগল... রোমান্সের সময় নেই।'

'মোটামুটি মিলেছে,' হাসল রানা। 'বসো। কিছু খাবে?'

'উঁহুঁ। হট ডগটা বেশি সুবিধের ছিল না। পেটের ভিতর থেকে এখনও কুকুরটা ডাক ছাড়ছে।'

'তা হলে ফ্রেশ হয়ে নাও—স্পেয়ার বেডরুমটায় থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তোমাকে। তারপর নাহয় কাজ শুরু করা যাবে।'

সুটকেসটা ড্রয়িংরুম সংলগ্ন একটা কামরায় পৌঁছে দিল রানা। এরপর নিজের কামরায় গিয়ে নিয়ে এল কোডেক্সের

প্রিন্টআউট আর জিয়োলেবটা। ড্রয়িংরুমের টেবিলে ওগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতেই ফিরে এল রেমি।

'এগুলোই পাঠিয়েছে গ্যারেট?' একতাড়া কাগজ হাতে তুলে জিজ্ঞেস করল ও।

'হুঁ। তিন সেট প্রিন্ট করেছি। অবশ্য গ্রিক কোডেক্সটা তুমি ছাড়া কেউ পড়তে পারবে না।'

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জানালার কাছে চলে গেল রেমি। বলে উঠল, 'ওয়াও! দারুণ দৃশ্য তো!'

গেস্ট-হাউসটা ছোট একটা ক্লিফের উপর। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে পিউজেট প্রণালী। কিনার ঢাকা পড়ে আছে সবুজ গাছপালায়। জানালা দিয়ে দেখতে সত্যিই চমৎকার লাগে।

'এর জন্য ক্রেডিট নিতে পারছি না বলে দুঃখিত,' রেমির পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। 'বাসাটা ভাড়া করা। তাও আমি করিনি। আমার ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির লোকাল ইনচার্জ জোগাড় করে দিয়েছে।'

'ভদ্রলোকের পছন্দ আছে বলতে হবে।'

'ভদ্রলোক নয়, ভদ্রমহিলা। ওর নাম অনন্যা হায়দার। বয়সও বেশি না, মাত্র পঁচিশ।'

বিস্মিত হলো রেমি। 'এত অল্পবয়েসী একটা মেয়েকে ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ইনচার্জ বানিয়েছ?'

'বয়স বা সেক্স নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। যোগ্যতাবলেই পদটা পেয়েছে অনন্যা।'

'আ'ম্যাম ইমপ্রেসড, রানা!'

'এতে ইমপ্রেস হবার কী আছে?' বিব্রত গলায় বলল রানা। প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'আমরা কি বসব এখন?'

'ববির জন্য অপেক্ষা করবে না?'

'ওর আসতে দেরি হবে। আপাতত আমরাই শুরু করি।'

‘বেশ, তবে একটু কফি পেলে ভাল হয়।’

‘এক্ষুণি নিয়ে আসছি।’

ধূমায়িত কফি নিয়ে কিছুক্ষণ পরেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল দু’জনে। প্রথমেই জিয়োলেবটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। উপরের ডায়ালে দুটো কাঁটা, পিঠটা বারো ভাগে ভাগ করা—সময়ের বদলে সেখানে লেখা হয়েছে বারোটা রাশির নাম... এসব আগেই দেখেছে। এবার মনোযোগ দিল পিছনের ডায়ালের দিকে, ওটার সঙ্গে বোমার কানেকশন থাকায় ইতিপূর্বে উল্টে দেখতে পারেনি। ওপাশটায় একটামাত্র কাঁটা। ডায়ালের চারপাশে রয়েছে তিন শ’ ষাটটা খুদে দাগ—প্রত্যেক দাগ এক ডিগ্রি করে মাপ নির্দেশ করছে। ত্রিশ ডিগ্রি পর পর সংখ্যায় লেখা আছে ডিগ্রির হিসাব। হঠাৎ দেখায় ডায়ালটা কম্পাসের মত লাগে। কাঁটা ঘোরানোর নিয়ম শিখে গেছে ওরা, কিন্তু তিনটে ডায়ালের সাহায্য নিয়ে কীভাবে কী করতে হবে, তার কিছুই জানে না। তাই খুলে বসল কোডেক্স। ওর ভিতরে জিয়োলেবের গোমর লুকানো থাকতে পারে।

কোডেক্সের ইংরেজি অনুবাদ পড়ল রানা, রেমি পড়ল মূল গ্রিকটা। নানারকম ড্রয়িং আর গাণিতিক সূত্র পেল ওরা পাণ্ডুলিপিতে। আড়াই শ’ পৃষ্ঠার কোডেক্স, প্রতিটা পাতাই এক-একটা অমূল্য ধন। কিংবদন্তির পণ্ডিত আর্কিমিডিস যে কত বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ ফুটে উঠেছে এই হারানো কোডেক্সে। পুরোটা ভালমত স্টাডি করতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু তার জন্য প্রচুর সময় চাই। আপাতত জিয়োলেব এবং মাইডাস সংক্রান্ত অংশটায় মন দিল ওরা—আলাদা হেডিং দিয়ে ওটুকু চিহ্নিত করা আছে, তাও তার দৈর্ঘ্য কম নয়... প্রায় পঞ্চাশ পৃষ্ঠা। পড়তে পড়তে পরিষ্কার হয়ে গেল, মাইডাসের সমাধি খুঁজে বের করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছেন

আর্কিমিডিস। সোনার হাতটা তিনি নিজেও দেখেছিলেন।

মূল কোডেক্সটা এক দফা রিডিং দেবার পর রেমি জানাল, পাণ্ডুলিপিটা অসম্পূর্ণ। কিছু পাতা হারিয়ে গেছে, আবার এমনও হতে পারে, আর্কিমিডিস হয়তো লিখে শেষ করতে পারেননি। সবচেয়ে বড় কথা, জিয়োলেব ব্যবহারের বিস্তারিত নিয়মকানুন ওতে পাওয়া গেল না। গ্যারেটের পিঠ কেন দেয়ালে ঠেকে গিয়েছিল, তা বোঝা গেল এবার। আলোচনায় বসল রানা আর রেমি। কোডেক্স থেকে কয়েকটা সূত্র পাওয়া গেছে, তা নিয়ে যুক্তি-তর্ক হলো ওদের মাঝে। পরিচিত কয়েক জায়গায় ফোন করল রেমি, ফলে খুব শীঘ্রি পরিষ্কার হয়ে গেল—পরবর্তী পদক্ষেপ কী নিতে হবে।

সন্ধ্যা সাতটায় হাজির হলো মুরল্যাণ্ড। একাই ফিরেছে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'মি. রেডক্লিফ কোথায়? তোমার সঙ্গে আসেননি।'

'উনি এফবিআই ডিরেক্টরের সঙ্গে মিটিং করছেন,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ঘণ্টাখানেক পরে আসবেন।'

'এখুনি ঢাকঢোল না পেটাবার কথা বলে দিয়েছ তো? কেউ কোনও আভাস পেলে মুশকিল। বিশেষ করে রেমির বোন কিডন্যাপ হয়েছে শুনলে মিডিয়াতে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। আফটার অল, রেমি একজন বড়-সড় সিলেব্রিটি।'

'কিচ্ছু ভেবো না, মি. রেডক্লিফকে সব বুঝিয়ে বলেছি আমি। উনিও এফবিআই ডিরেক্টরকে তা-ই বলবেন। আমার দিকটাও কাভার দেয়া হয়েছে। নুমার প্রজেক্ট থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছি, যাতে ওখানকার লোকজন আমাকে না খোঁজে। রেমি, এখন শুধু আপনার খোঁজ না পড়লেই হয়।'

'তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই,' আশ্বস্ত করল রেমি। 'গ্রীষ্মকালীন ব্রেক চলছে আমার অনুষ্ঠানের। মাসখানেকের মধ্যে শুটিঙের কোনও শিডিউল নেই। আমিও একরকম ছুটিতেই

আছি।'

'গুড। তা হলে তো আর চিন্তা নেই।' বলল রানা। 'এসো, ববি। আমরা এতক্ষণ কী করেছি তোমাকে দেখাই।'

'আগে ডিনার। সকাল থেকে হট ডগ ছাড়া আর কিছুই পেটে পড়েনি।'

'ঘরে খাবার নেই,' জানাল রানা। 'একটু অপেক্ষা করতে পারবে? অর্ডার দিয়ে আনিয়ে নিচ্ছি।'

'কপালটাই মন্দ। কী আর করা। আনাও কী আনাবে। মুরগির রোস্ট যেন থাকে।'

'ক'টা?' হেসে জানতে চাইল রানা।

'মিনিমাম দুটো।'

বিশ মিনিটের মধ্যে চলে এল খাবার। ডিনার করতে করতে মুরল্যাণ্ডকে কোডেক্স আর জিয়োলেব সম্পর্কে যতটা জানতে পেরেছে, খুলে বলল রানা আর রেমি। খাওয়া শেষ হলে আবারও ডোরবেল বেজে উঠল। ঘরে ঢুকলেন মি. রেডক্লিফ, সঙ্গে ল্যারি কিং। রেমির সঙ্গে ওঁদেরকে পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

কুশল বিনিময় শেষে রানা জানতে চাইল, 'কিডন্যাপারদের ব্যাপারে কিছু জানা গেছে?'

'না,' মাথা নাড়লেন রেডক্লিফ। 'পাক্কা প্রফেশনাল, হোটেলের সিকিউরিটি ক্যামেরায় কিছুই রেকর্ড হতে দেয়নি। সব কাজ সেরেছে আড়ালে। দু'একবার যা-ও বা ক্যামেরার সামনে এসেছিল, মুখ নামিয়ে রেখেছে। চেহারা দেখা যায়নি। তবে এফবিআই সমস্ত ফুটেজ ভাল করে পরীক্ষা করছে। দেখা যাক কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না।'

'ওদের ট্রান্সপোর্টেশন সম্পর্কেও কিছু জানা যায়নি?'

'সম্ভবত ভ্যান নিয়ে এসেছিল। লাঞ্চ টাইমের পর পর অচেনা যানবাহন বলতে ওই একটা ভ্যানই বেরিয়ে গেছে হোটেলের

আণ্ডারগ্রাউণ্ড পার্কিং লট থেকে। গেটে লাইসেন্স নাম্বার নোট করা ছিল, তবে ডিএমভি ডেটাবেজে সার্চ করে ওই নাম্বারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। ভুয়া নাম্বার প্লেট ব্যবহার করেছে, নিশ্চয়ই ভ্যানটাও বিশেষত্বহীন। খুঁজলে গোটা ওয়াশিংটনে ওরকম কয়েক হাজার ভ্যান পাওয়া যাবে।'

'তারমানে এ-মুহূর্তে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে?'

মাথা ঝাঁকালেন রেডক্লিফ। 'তা তো বটেই। কিডন্যাপারের নাম জেনেও সুবিধে হচ্ছে না। অ্যান্থনি গ্যারেট নামে কোনও ক্রিমিনালের রেকর্ড নেই এফবিআই-এর ডেটাবেজে। এমন দুর্ধর্ষ লোক কোত্থেকে উদয় হলো, তা-ই ভেবে পাচ্ছে না ওরা।'

'এর অর্থ সে অত্যন্ত স্মার্ট... কখনও ধরা পড়ে না। কোনও সূত্রও ফেলে যায় না পিছনে,' গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'দুঃসংবাদ।'

'চিন্তা কোরো না,' ওকে আশ্বাস দিল ল্যারি। 'এফবিআই চেষ্টার ত্রুটি করবে না। অসুবিধা বলতে... ওদেরকে গোপনে কাজ করতে হবে, এ-ই আর কী। সময় একটু বেশি লাগবে।'

'ইয়ে... রানা...' ইতস্তত করে বললেন রেডক্লিফ। 'এফবিআই ডিরেক্টর এ-মুহূর্তে কিডন্যাপারদের দাবি মেনে নিতে বলেছেন। তার মানে...'

'মাইডাসের সমাধি খুঁজতে যেতে হবে আমাকে,' বলল রানা। 'জানি। আপনি বিব্রত হচ্ছেন কেন কথাটা বলতে?'

'না... মানে... এখানে তোমার তো কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আমরাও অনর্থক ঝুঁকি নিতে বলতে পারি না তোমাকে...'

'এসব বলে আমাকে আপনি অপমান করছেন, মি. রেডক্লিফ,' আহত গলায় বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন কিডন্যাপ হয়েছেন, আর তাঁকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে আমার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই? তা ছাড়া... আমার কারণেই এই বিপদে পড়েছেন তিনি। যদি তা না-ও হতো, অ্যাডমিরাল আমার বসের

বন্ধু... আমার কাছে পিতৃতুল্য... তাঁকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা আমি মনে করি আমার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে!'

'দুঃখিত, রানা,' লজ্জিত গলায় বললেন রেডক্লিফ। 'আমি আসলে তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য বলিনি কথাটা। প্লিজ, যেভাবে হোক, ফিরিয়ে আনো অ্যাডমিরালকে। তার জন্য পুরো নুমা তোমার পিছনে আছে।'

'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব,' কথা দিল রানা।

'তোমাদের মেলোড্রামা শেষ হয়েছে?' বেরসিকের মত বলে উঠল মুরল্যাণ্ড। সোফায় বসে জিয়োলেবটা নেড়েচেড়ে দেখছে সে। 'তা হলে একটা কাজের কথা বলতে পারি।'

ওর দিকে এগিয়ে গেল সবাই। 'কী কথা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ডিভাইসটা থেকে ইলেকট্রনিক এমিশন ডিটেক্ট করছি,' বলল মুরল্যাণ্ড। নিজের যন্ত্রপাতি নিয়ে এতক্ষণ জিয়োলেবটা পরীক্ষা করছিল ও, ইলেকট্রনিক একটা মিটার ধরল ওটার পাশে। 'এই দেখো। কিছু ট্রান্সমিট করছে এটা।'

বিস্ময় ফুটল সবার চোখে। রেমি জানতে চাইল, 'কী ট্রান্সমিট করছে?'

'লো এমিশন। অডিও বা ভিডিও সিগনাল হতে পারে না।' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমার ধারণা, জিপিএস ট্র্যাকার।'

'ওটার ভিতরে জিপিএস ট্র্যাকার আসবে কোত্থেকে?'

'নিশ্চয়ই গ্যারেট বসিয়েছে,' বলল রানা। 'অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে এখন। মনে আছে, আমরা ট্রাক থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে আসার পর বোমাটা ফাটিয়ে দিয়েছিল গ্যারেট? কী করে জানল আমরা তখনও ট্রাকে নেই? কাছাকাছি কোথাও ছিল না সে, থাকলে আমাদের সঙ্গেই লাইন ধরে ফেরিতে উঠতে হতো ওকে সিয়াটলে ফেরার জন্য। ওকে দেখতে পেতাম

আমরা। কিন্তু দেখিনি। তারমানে ব্রেমারটনে যায়নি সে, সিয়াটলে বসেই আমাদের লোকেশন দেখতে পাচ্ছিল জিপিএস ট্র্যাকার থেকে। ভবিষ্যতেও আমরা কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি, তাও জানতে পারবে ও একই পদ্ধতিতে।'

'বের করে নেবে ওটা?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'না-না,' মাথা নাড়ল রানা। 'তারচেয়ে ওটাকে আমাদের কাজে লাগানো যাক। ল্যারি, ব্যাকওয়ার্ড সার্চ করতে পারবে তুমি? সিগনালটা কোথায় রিসিভ হচ্ছে, সেটা বের করা যাবে না?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি,' বলল ল্যারি। 'কিন্তু সিগনালটা ডিকোড করতে হবে তার জন্যে।'

'কাজে লেগে পড়ো।'

'ডিভাইসটা নুমা হেডকোয়ার্টারে নেয়া যাবে না বোধহয়?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'উঁহুঁ। যা করার এখানেই করতে হবে। এবং খুব শীঘ্রি। আমরা বেশিক্ষণ ঘরে থাকতে পারব না, বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'অসুবিধে নেই, সিগনালটার অংশবিশেষ রেকর্ড করে নিয়ে কাজ করতে পারব আমি। কিন্তু তোমরা যাচ্ছ কোথায়?'

'কোডেক্সের ব্যাপারে একটা থিয়োরি খাড়া করেছে রেমি,' বলল রানা। 'অকশন হাউসে পাঠাবার আগে একটা মোমের ট্যাবলেট, মানে ফলকে মোড়ানো ছিল ওটা। আলাদা আইটেম হিসেবে বিক্রি করবার জন্য মোমফলকটা সরিয়ে নেয়া হয়। ওর ধারণা, জিয়োলেবের রহস্য ভেদ করবার সূত্র ওই ট্যাবলেটের গায়ে লেখা আছে।'

'ট্যাবলেটটা এখন কোথায়?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'ওটা নাহয় বিমানে ওঠার পরই জানাব।'

'বিমান! কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

মি. রেডক্লিফের দিকে ফিরল রানা। 'আপনাদের তরফ থেকে সব ধরনের সাহায্য দেবেন বলছিলেন না? গুড। নুমার একটা প্রাইভেট জেট নেব আমরা। ইংল্যাণ্ডে যেতে হবে আমাদেরকে।'

আঠারো

হাই তুলল গ্যারেট, থার্মোসের মুখ খুলে কফিতে চুমুক দিল, তারপর বিরক্ত চোখে তাকাল পাশের সিটে এলিয়ে পড়ে থাকা রেনফিল্ডের দিকে। বাল্টিমোর হারবারের কাছাকাছি এক নির্জন পার্কিং লটে গাড়িতে বসে আছে ওরা। বিমান ধরে ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পৌঁছেছে দু'জনে। যাত্রার পুরো পথটাই নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়েছে রেনফিল্ড। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ভাড়া করা গাড়িতে ওঠার পরেও ঘুম দূর হচ্ছে না তার। অথচ গতকাল থেকে সব মিলিয়ে আধঘণ্টাও বিশ্রাম পায়নি গ্যারেট। মেজাজ খিঁচড়ে আছে ওর।

'অ্যাই!' রেনফিল্ডের গায়ে একটা বক্সিং মারল গ্যারেট। 'আর কত ঘুমাবে? ওঠো বলছি!'

আড়মোড়া ভেঙে সিটের উপর সিধে হলো রেনফিল্ড। হাই তুলে জিজ্ঞেস করল, 'ক'টা বাজে?'

'আড়াইটা,' ঘড়ি দেখে বলল গ্যারেট।

'গভীর রাতের এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট আগামীকাল রাখা যেত না?' বিরক্ত গলায় বলল রেনফিল্ড। 'একদিনে ধকল একটু বেশিই হয়ে যাচ্ছে।'

'ঘুমাচ্ছ তো নাক ডাকিয়ে, তোমার আবার ধকল কীসের? ঘুমের আবার ধকল?' ধাতানি দিল গ্যারেট। 'আমাদের অপারেশনের এই পর্বটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিছিয়ে দিলে নিজেরাই সমস্যায় পড়ে যাব।'

'হুম।'

একটু পরেই অন্ধকার পার্কিং লট আলোকিত করে তুলল এক জোড়া হেডলাইট। মাঝারি আকারের একটা ট্রাক এসে ঢুকল লটে। গ্যারেটের ভ্যান থেকে সামান্য দূরে পার্ক করল ওটা। ইঞ্জিন বন্ধ করে নামল থলথলে শরীরের এক নিগ্রো ড্রাইভার। সস্তা দরের সিগার ফুঁকছে। হাত নাড়ল গ্যারেটের উদ্দেশে।

'ইটস্ টাইম,' রেনফিল্ডকে বলল গ্যারেট। দু'জনে নেমে পড়ল ভ্যান থেকে।

নীল রঙের কভারঅল পরে আছে নিগ্রো লোকটা—গ্যারেটের পূর্ব-পরিচিত... নাম, টেরি জ্যাকসন। তিন বছর হলো স্থানীয় এক শিপিং ওয়্যারহাউস থেকে গ্যারেটের হয়ে স্মাগলিং করা মালামাল বের করে আনছে সে। মোটা অঙ্কের বখরাও পাচ্ছে প্রতি চালান থেকে। তবে তার জানা নেই, আজকের পর শেষ হতে চলেছে ওদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক।

গ্যারেটের সঙ্গে রেনফিল্ডকে দেখতে পেয়ে চোখ সরু করে ফেলল জ্যাকসন। জিজ্ঞেস করল, 'এটা আবার কে?'

'আমার বন্ধু,' সংক্ষেপে বলল গ্যারেট।

'এর আগে তো কোনোদিন বন্ধুবান্ধব আনোনি তুমি?'

'ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল জ্যাকসন। 'বেশ, তুমি যদি তা-ই মনে করো!'

'মাল কি রেডি?' কাজের কথা পাড়ল গ্যারেট।

'হ্যাঁ।' রুমাল বের করে ঘর্মাক্ত মুখ মুছল জ্যাকসন। 'ঠিক যেভাবে চেয়েছিলে। তবে জান বেরিয়ে গেছে জিনিসগুলো

আলাদা করতে। পুরো দু'ঘণ্টা লেগেছে আমার। বাড়তি দু'হাজার ডলার দিতে হবে এর জন্য।'

'পাবে। কিন্তু কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

'নাহ্। হিট রেজিস্ট্যাণ্ট গ্লাভ ব্যবহার করবার কথা বলে ভাল করেছ। ক্যাপসুলগুলো ভীষণ গরম।'

'কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের জন্য অমন হয়। সাবধান না থাকলে এই ব্যাটারিগুলো সহজেই ওভারহিটেড হয়ে যেতে পারে। তোমাকে তো থারমাল-ইনসুলেশন কণ্টেইনার পাঠিয়েছিলাম, ওর ভিতরে ভরে সিল করেছ তো?'

'অবশ্যই!'

'চলো দেখি।'

ট্রাকের ঝাঁপ তুলে ফেলল জ্যাকসন। দেখা গেল তার পরিশ্রমের ফসল। ট্রেলারের পিছনদিকে শোভা পাচ্ছে কালো রঙের একটা বাক্স—ওটাই থারমাল ইনসুলেশন কণ্টেইনার। ডালার জোড়াগুলো সিলগালা করে দিয়েছে সে। কণ্টেইনারের পিছনে দুই টুকরো হয়ে রয়েছে জলপাই রঙের একটা সিলিণ্ডার সদৃশ বস্তু, গায়ে হাঙরের পাখনার মত কয়েকটা ফিন—গ্যারেটের দরকারি ক্যাপসুলগুলো ওটার ভিতর থেকেই বের করে এনেছে জ্যাকসন। সিলিণ্ডারটা চার ফুট উঁচু, গোড়ায় রাশান অক্ষরে গুটি গুটি করে অনেক কিছু লেখা। এ-ছাড়া পুরো অবয়বটার গায়ে বেশ কিছু ঝাঁঝরি আছে, পিছনে কুলিং ফ্যান—জিনিসটাকে ঠাণ্ডা রাখে ওগুলো।

রেনফিল্ডের কাঁধে একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ঝুলছে। সেটা থেকে মাইক্রোফোনের মত একটা জিনিস উঁচু করল সে। ধরল ট্রেইলারের দরজার সামনে।

'কী ওটা?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল জ্যাকসন।

'ইয়ে... টেম্পারেচার গজ,' মিথ্যে বলল রেনফিল্ড। 'নিশ্চিত

হয়ে নিচ্ছি, জিনিসটা ওভারহিটেড নয়।'

'কী বুঝছ? কোথাও ভুল করেছি আমি?' বিরক্ত গলায় জানতে চাইল জ্যাকসন। কেউ তার কাজে খুঁত খুঁজে বের করুক, তা পছন্দ করে না।

তার প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না রেনফিল্ড। হাতের গজটা কয়েক বার নাড়াচড়া করল মনোযোগের সঙ্গে। মৃদু আওয়াজ হলো যন্ত্রটায়। ডিসপ্লে দেখে গ্যারেটের দিকে ফিরল, 'সেফটি লিমিটের মধ্যে আছি আমরা।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল গ্যারেট। জ্যাকসনকে বলল, 'আমাদেরকে একটু সাহায্য করো, ফ্রেণ্ড। ভ্যানে তুলে দাও সবকিছু।'

'নিশ্চয়ই!' সানন্দে রাজি হলো নিগ্রো।

ট্রাক থেকে প্রথমে কালো রঙের কণ্টেইনারটা নামাল ওরা। ওটা ভীষণ ভারী, তিনজনে ধরবার পরেও রীতিমত যুঝতে হলো ভ্যান পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্য।

'বাপরে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জ্যাকসন। 'কীসের তৈরি এটা? সীসা?'

মৃদু হাসল গ্যারেট। নিগ্রো ড্রাইভারের অনুমান একদম ঠিক। তিন-ইঞ্চি পুরু সীসার আস্তরণ রয়েছে কণ্টেইনারের দেয়ালে। খানিক বিশ্রামের পর সিলিণ্ডারটা নিয়ে আসা হলো। সবকিছু ভ্যানে তুলবার পর দরজা আটকে দিল রেনফিল্ড।

জ্যাকসন তখন রুমাল দিয়ে আবারও ঘাম মুছছে। বলল, 'ওফ্, জান খারাপ করে দিল! কী ওটা, গ্যারেট? কোনও ধরনের ইঞ্জিন?'

হাসল গ্যারেট। এখন আর গোমরটা জ্যাকসনকে জানাতে সমস্যা নেই। বলল, 'ইঞ্জিন না। ওটা আসলে একটা রেডিও-আইসোটোপ থার্মো-ইলেকট্রিক জেনারেটর।'

‘খাইছে! নাম তো দেখি জবরদস্ত। কী কাজে লাগে?’

‘রিমোট লাইটহাউসগুলোয় পাওয়ার সাপ্লাই দেয় এই জেনারেটর। সম্পূর্ণ অটোমেটেড। মেইনটেন্যান্স ছাড়া একটানা চলতে পারে বিশ বছর।’ জ্যাকসনকে জ্ঞান দিতে পেরে ভাল লাগছে গ্যারেটের। ‘আর্কটিক মহাসাগরের এক পেনিনসুলা থেকে জিনিসটা আনিয়েছি আমি। বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে ওটা জোগাড় করতে।’ সোভিয়েত আমলের এসব টেকনোলজি এখন প্রায় বাতিলের খাতায় চলে গেছে, পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে রাশার উত্তর উপকূলের বহু লাইটহাউস। মোটামুটি কানেকশন থাকলেই জেনারেটরগুলো খুব সহজে কিনতে পারে যে-কেউ।

‘দেখে তো বেশ পুরনো মনে হয়েছে,’ মন্তব্য করল জ্যাকসন।

‘কমপক্ষে ত্রিশ বছর। আরও বেশিও হতে পারে।’

হেসে উঠল জ্যাকসন। ‘ত্রিশ বছরের পুরনো জেনারেটরের ব্যাটারি দিয়ে কী করবে তুমি? এ তো অচল মাল! যাক গে, তাড়াতাড়ি আমার পাওনা মিটিয়ে দাও।’ পেটে হাত বোলাল সে। ‘বদহজম হয়েছে বোধহয়, বাড়ি গিয়ে ওষুধ খেতে হবে।’

‘নিশ্চয়ই,’ বলে পকেটে হাত দিল গ্যারেট। টাকা নয়, বের করে আনল একটা পিস্তল।

দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল জ্যাকসনের। ‘হোয়াট দ্য...’

‘এই তো, তোমার পেমেন্ট।’

ছ’ফুট দূর থেকে নির্বিকার ভঙ্গিতে গুলি চালাল গ্যারেট। রক্তাক্ত শরীর নিয়ে তালগোল পাকিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল নিগ্রো চোরাকারবারি। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে আছাড় খাবার আগেই।

রেনফিল্ডও চমকে গেছে। হতভম্ব গলায় বলল, ‘যিসাস! ওকে গুলি করবে, এ-কথা আগে বলোনি তো?’

'আগে বললে কী লাভ হতো?' বিরক্তি ফুটল গ্যারেটের চোখে। নিজের জ্যাকেটের তলা থেকে কোকেন-ভরা একটা প্যাকেট বের করে গুঁজে দিল জ্যাকসনের কভারঅলের পকেটে। পুলিশ ভাববে ড্রাগ কেনা-বেচা করতে গিয়ে খুন হয়েছে লোকটা।

'এর আগে আমি কাউকে গুলি খেতে দেখিনি,' ভয়ার্ত চোখে লাশের দিকে তাকিয়ে আছে রেনফিল্ড।

'এবার তো অভিজ্ঞতা হলো। কনগ্রাচুলেশন্স!'

দ্রুত ট্রাকের পিছন থেকে ছুটোছাটা সমস্ত জিনিস সরিয়ে নিল দু'জনে। মুছে ফেলল নিজেদের উপস্থিতির সব চিহ্ন।

ভ্যানে চড়ার আগে ইলেকট্রনিক ডিভাইসটা আরেকবার অন করল রেনফিল্ড। ওটা আসলে গাইগার কাউন্টার—তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক যন্ত্র।

'রিডিং কত?' জানতে চাইল গ্যারেট। গাড়ি নিয়ে বহুদূর যেতে হবে ওদেরকে। রেডিয়েশনে অতটা সময় এক্সপোজড় থাকা বিপজ্জনক কি না, শিয়োর হয়ে নিতে চাইছে।

'বেশি না, দুই মিলির‍্যাড পার আওয়ার,' বলল রেনফিল্ড। 'আস্তানায় যখন ফিরব, ততক্ষণে একটা এক্স-রের চেয়েও কম রেডিয়েশন সইবে আমাদের শরীর।'

গাড়িতে উঠে বসল দু'জনে। ঘাড় ফিরিয়ে কালো কণ্টেইনারটার দিকে তাকাল গ্যারেট। ভিতরে চারশো ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপে টগবগ করছে স্ট্রনটিয়াম-৯০ এর প্যালেট। 'ডালা খুললে রিডিং কত হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'দু'হাজার র‍্যাডের কম নয়,' বলল রেনফিল্ড।

মাথা ঝাঁকিয়ে ইগনিশন ঘোরাল গ্যারেট। জ্যাকসনের ট্রাককে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল পার্কিং লট থেকে। ত্রিসীমানায় কোনও জনমনিষ্যি নেই। ফাঁকা রাস্তা ধরে হু হু করে গাড়ি ছোটাল সে। নিহত লোকটার জন্য বিন্দুমাত্র খারাপ লাগছে না। রেডিয়েশন

পয়েজনিঙের মৃত্যু অত্যন্ত কষ্টের এক মৃত্যু। ঘাম আর পেটের গড়বড় ছিল প্রাথমিক উপসর্গ। এরপর দেখা দিত বমি, ডায়রিয়া, চুল পড়া, এবং নিয়ন্ত্রণহীন রক্তপাত।

এক হিসেবে পুরনো বন্ধুটির উপকারই করেছে গ্যারেট। দু-দুটো ঘণ্টা রেডিও-অ্যাকটিভ ম্যাটেরিয়ালের সংস্পর্শে থাকার পর বাঁচার কোনও উপায় ছিল না জ্যাকসনের। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই অবর্ণনীয় কষ্ট পেয়ে মারা যেত। সেই কষ্ট সইতে হলো না তাকে।

উনিশ

ইংল্যাণ্ডে ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার গেছে রেমি, কিন্তু সে-সব যাত্রার অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর নয়। এয়ারপোর্টের হাজারটা ঝক্কি সামলে আট ঘণ্টার ফ্লাইটে হিথ্রো পৌঁছুতে হয়। স্বল্প সময়ের নোটিশে টিকেট পাওয়া তো আরও বড় ঝামেলা। কিন্তু এবার সেসবের কিছুই সইতে হলো না। জর্জ রেডক্লিফের কাছে নিজেদের চাহিদা জানাবার নব্বুই মিনিটের ভিতর সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। একটা প্রাইভেট জেটের গদি আঁটা আরামদায়ক সিটে বসে আছে ও এখন। এয়ারপোর্টের কোনও ফর্মালিটির ভিতর দিয়েই যেতে হয়নি ওকে—জবাব দিতে হয়নি ইমিগ্রেশনের হাজারটা প্রশ্নবাণের, বুকিং করতে হয়নি লাগেজ, লাইন ধরতে হয়নি বিমানে ওঠার জন্য, কিংবা মুখ লুকাতে হয়নি ভক্তরা কেউ ওকে চিনতে পেরে বিরক্ত করবে ভেবে।

এসব সম্ভব হয়েছে নুমা হেডকোয়ার্টারের সুবাদে। ওখান থেকে এয়ারপোর্টের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ফোন করে দিয়েছিলেন মি. রেডক্লিফ; ফলে ভিআইপি লাউঞ্জে মাত্র দশ মিনিট বসতে হয়েছে ওদেরকে। এর মাঝে এয়ারপোর্ট অফিশিয়ালরা নিজেরাই এসে সিল-ছাপ্পড় মেরে দিয়েছে পাসপোর্টে, তারপর এসকর্ট করে তুলে দিয়েছে নুমার এগজিকিউটিভ জেটে।

সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে মুগ্ধ চোখে বিমানের অভ্যন্তরে চোখ বোলাল রেমি। আয়েশী ভ্রমণের জন্য কোনও কিছুর অভাব নেই। একেকটা সিট লেদারে মোড়া, নরম; এত চওড়া যে ওর মত দু'জন বসতে পারবে অনায়াসে। প্রয়োজনে বিছানাও বানিয়ে ফেলা যায়। অটোমেটিক ম্যাসাজের ব্যবস্থাও আছে সিটে। পায়ের তলায় ঘাসের গালিচার মত পুরু কার্পেট, পোর্টহোল ঢেকে রেখেছে দামি পর্দা। বাল্কহেডের গায়ে ছাপান্ন ইঞ্চি পর্দার একটা এলইডি টিভি শোভা পাচ্ছে, সেই সঙ্গে আছে সাউণ্ড সিস্টেম। ছোট একটা বারও আছে বিমানের ভিতর। এতসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে শুধু ওরা তিনজন—রেমি, রানা আর মুরল্যাণ্ড।

'ওয়াও!' সবিস্ময়ে বলে উঠল রেমি। 'তোমরা কি সবসময় এভাবেই ট্র্যাভেল করো?'

'যখন নুমার অফিশিয়াল কাজে যাই,' বলল রানা। 'তবে কেবিনের চেয়ে আমি ককপিটেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।'

'তুমি বিমানও ওড়াতে পারো? জানতাম না তো!'

'তা হলে বলব রিসার্চে গলদ আছে তোমার। গাড়ি, বিমান আর জাহাজ... সবই চালাতে জানি আমি।'

'ওরে বাবা! এত কিছু?'

'আরও অনেক গুণ আছে ওর,' ফোড়ন কাটল মুরল্যাণ্ড। 'বাইরে থেকে যতই শক্ত দেখাক, মনটা ওর কাদার মত নরম।

রোমাণ্টিকও বটে। চুপি চুপি কবিতা পড়ে।'

'ববি!' কড়া গলায় ডাকল রানা।

হেসে ফেলল রেমি। 'আর আপনি? শুনেছি আপনি মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, এককালে নাকি রেঞ্জারও ছিলেন...'

'রেঞ্জার না, নেভি সিল,' শুধরে দিল মুরল্যাণ্ড। 'আর্মির কমাণ্ডোকে রেঞ্জার বলে। ওদের সঙ্গে আমাদের আদায় কাচকলায় সম্পর্ক। নেভি সিলকে রেঞ্জার বলে ডাকলে অপমান করা হয়।'

'সরি। কিন্তু আপনিও রানার মত সকল কাজের কাজী নাকি?'

'উঁহুঁ। ওর মত চিজ দুনিয়ায় দুটো পাবেন না।'

'থ্যাঙ্ক গড। আমি তো ভাবলাম ওভার-অ্যাচিভারদের ক্লাবে পৌঁছে গেছি।'

'ববির কথায় কান দিয়ো না,' রানা বলল। 'বিনয় করছে ও। ওর নিজের অ্যাচিভমেণ্ট কারও চেয়ে কোনও দিক দিয়ে কম নয়। দুনিয়ার সেরা ইঞ্জিনিয়ারদের একজন বলা যেতে পারে ওকে। ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে বেশ কিছু আবিষ্কারও আছে ওর, কিন্তু সেগুলোর কথা আগ বাড়িয়ে কাউকে বলতে যায় না।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল রেমি। 'এবার তো মনে হচ্ছে আপনারই ইণ্টারভিউ নিতে হবে আমার অনুষ্ঠানে।'

'ভুলেও ও-কাজ করতে যাবেন না,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমাকে সামনাসামনি দেখতে যতই সুন্দর লাগুক, আমার ক্যামেরা ফেস খুবই খারাপ। পর্দায় আমার চেহারা ভেসে ওঠামাত্র দর্শকরা টিভি সেটের সামনে থেকে পালাবে।'

'মিথ্যে কথা বলছ কেন?' ভুরু কোঁচকাল রানা। রেমির দিকে তাকাল। 'আসল ঘটনা ভিন্ন। ভুয়া নামে ফেসবুকে অন্তত দশটা অ্যাকাউণ্ট খুলেছে ও—মেয়েদেরকে পটাবার জন্য। টিভিতে সাক্ষাৎকার দিতে গেলে সত্যিকার পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।'

'কী-ই-ই!' রেগে গেল মুরল্যাণ্ড। 'আমি ভুয়া নামে মেয়ে পটিয়ে বেড়াচ্ছি?'

'চাইলে এখুনি হাতেনাতে প্রমাণ দেখাতে পারি,' বলল রানা। 'কিন্তু সময় নেই। আপাতত লণ্ডনে পৌঁছুবার পরে আমরা কী করব না করব, সেটা ঠিক করে ফেলা দরকার।'

কাঁধ ঝাঁকাল মুরল্যাণ্ড। 'বেশ, তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া নাহয় পরেই হবে।'

'কখন পৌঁছুব আমরা?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'আশা করছি দুপুর দুটোয়—লোকাল টাইম,' বলল রানা। 'বিকেল আর সন্ধ্যাটা কাজে লাগানো যাবে।'

'বিশ্রাম পাব না?' গোমড়ামুখে জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'সরি, বিশ্রাম যা নেবার বিমানেই নিয়ে নাও। আমাদের হাতে সময় কম। ইন ফ্যাক্ট... সময় বাঁচাবার জন্য লণ্ডনে নেমে দু'ভাগ হয়ে কাজ করবার কথা ভাবছি আমি।'

'ওখানে ছাই কীসের জন্য যাচ্ছি, তা-ই কিন্তু এখনও পরিষ্কার নয় আমার কাছে! একটু খুলে বলবে?'

'সংক্ষেপে শুনবে, নাকি বিস্তারিত?'

'এমনভাবে বলো, যাতে এখুনি ঘুমিয়ে না পড়ি। তুমি তো আবার সুযোগ পেলেই লেকচার দিতে শুরু করো।'

'আর তুমি বুঝি সুযোগ পেলেই ঘুমাও না?'

'ঝগড়া বন্ধ!' রানা আর ববির মাঝখানে নাক গলাল রেমি। 'আমিই ব্যাখ্যা করছি। ববি, আপনি অ্যাণ্টিকাইথেরা মেকানিজমের নাম শুনেছেন?'

'ওটা আবার কী?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড।

নিজের ল্যাপটপ কম্পিউটার অন করল রেমি। রওনা হবার আগেই ইণ্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত ডেটা ডাউনলোড করে এনেছে; সেখান থেকে একটা ছবি ওপেন করল। স্ক্রিনে ভেসে

উঠল ব্রোঞ্জে তৈরি একটা ক্ষয়ে-যাওয়া প্রাচীন ডিভাইস—তিন টুকরো হয়ে আছে। ভাঙা টুকরোগুলোর ভিতরে দেখা যাচ্ছে খাঁজকাটা ছোট-বড় বেশ কিছু গিয়ার।

'মনে তো হচ্ছে এটা পুরনো কোনও ঘড়ি,' মন্তব্য করল মুরল্যাণ্ড। 'কয়েক শ' বছর ধরে পড়ে ছিল মাটি-কাদার ভিতরে।'

'কয়েক শ' নয়... আসলে পড়ে ছিল দু'হাজার বছর,' বলল রানা। অ্যাণ্টিকাইথেরা মেকানিজম নামের এই বস্তুটির সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে আর্কিমিডিসের জিয়োলেবের। এই সাদৃশ্যের কথা মনে পড়ায় ইণ্টারনেট থেকে ছবি আর তথ্য নামিয়ে পড়াশোনা করে এসেছে ও আর রেমি।

'গ্রিক আইল্যাণ্ড অ্যাণ্টিকাইথেরার উপকূলে একটা শিপরেক থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে উদ্ধার করা হয় এই টুকরোগুলো,' বলল রেমি। 'শুরুতে বহু বছর কেউ গুরুত্ব দেয়নি এর; কিন্তু পরে এক আর্কিয়োলজিস্ট প্রমাণ করেন—যন্ত্রটা যে-আমলের, সে-আমলে খাঁজকাটা গিয়ারের অস্তিত্ব ছিল না। আমাদের জানামতে এই প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে মাত্র পাঁচ শ' বছর আগে! অথচ দু'হাজার বছরের পুরনো এই মেকানিজমে দেখা যাচ্ছে চাকাগুলো... ব্যাপারটা অনেকটা মধ্যযুগের ডানজনের ভিতর আইবিএম কম্পিউটার পাবার মত! আসলেও তাই। অনেকে মনে করেন, এটাই পৃথিবীর প্রথম অ্যানালগ কম্পিউটার।'

'কী কম্পিউট করে এটা?' আগ্রহী হয়ে উঠেছে মুরল্যাণ্ড।

'এ-নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে বেশিরভাগ এক্সপার্টের ধারণা, অ্যাস্ট্রোনমিকাল প্রেডিকশনের জন্য ব্যবহার হতো এই ডিভাইস। মানে, গ্রহ-নক্ষত্রের মুভমেণ্ট, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ইত্যাদি। প্রাচীনকালের চাষাবাদ আর ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সৌর-ক্যালেণ্ডারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সম্ভবত ওসবই ক্যালকুলেট করা হতো জিনিসটার সাহায্যে।'

বাটন টিপে ল্যাপটপের স্ক্রিনে আরেকটা ছবি তুলে আনল ও। কাঁচের কেইসে সাজানো চকচকে একটা ব্রোঞ্জের ডিভাইস দেখা যাচ্ছে ওতে। ঘড়ির মত দুটো ডায়াল আছে ওটার গায়ে, একপাশে একটা নব। ডায়ালে রয়েছে গ্রিক মার্কিং। কিনারগুলো স্বচ্ছ হওয়ায় চোখে পড়ছে কেসিঙের ভিতরের ছোট-বড় নানা আকারের গিয়ার।

'অ্যাথেন্সের ন্যাশনাল আর্কিয়োলজিকাল মিউজিয়ামে রাখা অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমের রেপ্লিকা এটা,' বলল রানা। 'শিপরেক থেকে পাওয়া টুকরোগুলোর আদলে রিপ্রোডাকশন করা হয়েছে।'

'দেখতে তো আমাদের জিয়োলেবের মতই লাগছে,' ভ্রূকুটি করল মুরল্যাণ্ড।

'হ্যাঁ, যথেষ্ট মিল আছে। তবে এটা অসম্পূর্ণ... নবও মাত্র একটা। কারণ গ্রিকরা এটা বানিয়েছে ভাঙাচোরা আর্টিফ্যাক্ট দেখে। কিন্তু আমাদেরটা বানাবার সময় ডিটেইলড্ ড্রয়িং ছিল গ্যারেটের হাতে। আমার তো মনে হয়, জিনিসটা অ্যান্টিকাইথেরা মেকানিজমেরই একটা ভার্শান।'

'তুমি কি বলতে চাইছ, কোডেক্সটা আসলে ওই জিনিস বানাবার ইন্সট্রাকশন ম্যানুয়াল?'

'অনেকটা সেরকমই,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, আর্কিমিডিস যে এই মেকানিজমের ডিজাইনার, সেটার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এই কোডেক্স থেকে।'

'আর্কিমিডিস?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'মানে যে-ভদ্রলোক ন্যাংটো অবস্থায় *ইউরেকা, ইউরেকা* বলে ছুট লাগিয়েছিলেন?'

ওর বলার ভঙ্গি শুনে একসঙ্গে হেসে উঠল রানা আর রেমি। আর্কিমিডিস সম্পর্কে প্রচলিত এক গল্প ওটা। সাইরাকিউজের রাজা তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন একটা সোনার মুকুটে কোনও খাদ

আছে কি না সেটা বের করবার। শর্ত ছিল, মুকুট না ভেঙে সে-কাজ করতে হবে। সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে অকূল পাথারে পড়ে যান আর্কিমিডিস। পরে একদিন বাথটাবে গোসল করতে নেমে আচমকা তিনি আবিষ্কার করে বসেন পানির প্রতিস্থাপন তত্ত্ব—পানিতে ডোবানো হলে যে-কোনও বস্তু তার ওজনের সম-পরিমাণ পানি প্রতিস্থাপিত করে। এই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত মুকুট-রহস্যের সমাধান করেন তিনি। বলা হয়ে থাকে, কৌশলটা আবিষ্কার করতে পেরে আর্কিমিডিস এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, বাথরুম থেকে দিগম্বর অবস্থায় বেরিয়ে এসেছিলেন... রাস্তায় দৌড়াতে দৌড়াতে চিৎকার জুড়েছিলেন *ইউরেকা*, অর্থাৎ *পেয়েছি* বলে।

'হ্যাঁ,' হাসতে হাসতে বলল রেমি। 'তিনিই।'

'ওই লোক তো বোধহয় ডেথ রে-ও আবিষ্কার করেছিল?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'তার কোনও সত্যিকার ভিত্তি নেই,' বলল রেমি। 'বলা হয়ে থাকে, দুই শ' চোদ্দ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের সময় রোমান-রা হামলা চালিয়েছিল গ্রিসে। আর্কিমিডিস তখন রাজার নির্দেশে ওদেরকে ঠেকাবার জন্য ডেথ রে, বা মরণরশ্মি নামের ভয়ঙ্কর এক অস্ত্র তৈরি করেন। লেন্সের সাহায্যে সূর্যের আলোকে ফোকাস করত ওই অস্ত্র। চোখের নিমেষে আগুন ধরিয়ে দিতে পারত যে-কোনও কিছুতে। তীরে ভেড়ার আগেই রোমানদের পুরো নৌ-বহর নাকি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল মরণরশ্মির সাহায্যে। তবে আধুনিক বিজ্ঞানীরা অনেক চেষ্টা করেও আর্কিমিডিসের ওই রশ্মি তৈরি করতে পারেননি। তাই ধরে নেয়া হয়, ওটা স্রেফ গল্প... সত্যি নয়। তাই বলে আর্কিমিডিসের যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ নেই কারও। অত্যন্ত প্রতিভাবান এক বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক ছিলেন তিনি—এ-কথা এক বাক্যে স্বীকার করে সবাই।'

'এই কোডেক্স দেখলেই সেটা বোঝা যায়,' যোগ করল রানা 'শুধু জিয়োলেব নয়, এর ভিতরে আরও অনেক যন্ত্র বানাবারই কৌশল লেখা আছে।'

'সন্দেহ নেই ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'কিন্তু আর্কিমিডিসের সঙ্গে রাজা মাইডাসের কী সম্পর্ক?'

'জিয়োলেবের সাহায্যে মাইডাসের সমাধিতে পৌঁছুবার ম্যাপ বা নকশা পাওয়া যাবে বলে ধারণা করছি আমরা।' কোডেক্সের প্রিণ্টআউটের একটা পাতা খুলল রেমি। 'এই যে, এখানে লেখা আছে: যার হাতে নকশা থাকবে, সে-ই পাবে মাইডাসের ঐশ্বর্য।'

'ঐশ্বর্য?' হাসি ফুটল মুরল্যাণ্ডের ঠোঁটে। 'হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা কাজের কথা শুনলাম। কীভাবে পাওয়া যাবে ওই নকশা?'

হতাশা ফুটল রেমির চেহারায়। 'জানি না। কোডেক্সটা অসম্পূর্ণ। জিয়োলেব সংক্রান্ত দুটি দরকারী ইন্সট্রাকশন নেই ওতে।'

'তোমার কেনা ওই সুইডিশ এণ্টারটেইনমেণ্ট সেণ্টার জোড়া দিতে গিয়ে কী সমস্যা হয়েছিল, মনে আছে?' বলল রানা। 'ইন্সট্রাকশন ম্যানুয়েলের কয়েকটা পাতা ছেঁড়া ছিল।'

'আরেকটু হলেই পুরো জিনিসটা উল্টো করে জোড়া লাগাচ্ছিলাম আমরা... সে-কথা কি ভোলা যায়?' মুখ কালো করে বলল মুরল্যাণ্ড।

'এখানেও অনেকটা একই সমস্যা।'

'কী রকম?'

'জিয়োলেবটা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, সেটা লেখা থাকার কথা ওই পাতাগুলোয়,' ব্যাখ্যা করল রেমি। 'কোডেক্স বলছে, ডিভাইসটার রহস্য ভেদ করতে হলে তিনটে সূত্র অনুসরণ করতে হবে। প্রথম সূত্র হলো, ক্যালিব্রেশন—জিয়োলেবের সবগুলো কাঁটা বারোটার পজিশনে আনতে হবে। তা আমরা

করেছি। কিন্তু এরপর কী করতে হবে, সেটা আর জানি না। পুরোটাই আসলে এক ধরনের সিকিউরিটি সিস্টেম, যাতে কোডেক্সের মালিক ছাড়া আর কেউ জিয়োলেব ব্যবহার করতে না পারে।'

'আজকাল পাসওয়ার্ড আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার দিয়ে যেভাবে যন্ত্রপাতির অবৈধ ব্যবহার ঠেকানো হয়, অনেকটা সে-রকম,' বলল রানা।

'দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝে নিই,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'এই কোডেক্স তা হলে শুধু জিয়োলেব তৈরির নিয়ম এবং ওটার ক্যালিব্রেশন শেখাচ্ছে আমাদেরকে?'

'বানাবার নিয়মটাই শুধু লেখা আছে পরিষ্কারভাবে,' রেমি বলল। 'ক্যালিব্রেশনের জন্য স্টোমাকিয়োনের ধাঁধা দেয়া হয়েছে। সেটা আমরা ভেদ করেছি। কিন্তু ডিভাইসটা অপারেট করবার জন্য বাকি দুটো সূত্র একান্তই জরুরি।'

'সূত্রদুটো কী কী?'

প্রিন্টআউটের আরেকটা পাতা উল্টাল রেমি। 'এই যে, এখানে লুকানো মেসেজের কথা লেখা আছে।' কাগজের এক জায়গায় আঙুল ঠেকাল ও। 'এই শব্দটা হলো *স্টেগানোস*... মানে লুক্কায়িত। আর এটা হচ্ছে *গ্রাফেইন*... মানে, লেখা।'

'স্টেগানোগ্রাফি?'

'সরাসরি মানে করলে দাঁড়ায়, লুকানো বার্তা। মেসেজটা যা-ই হোক না কেন, লুকানো অবস্থাতে আছে। আর আমি অনুমান করতে পারছি সেটা কোথায়।'

'কোডেক্সের সঙ্গে পাওয়া মোমফলক,' বলল রানা। 'ওটাই আমাদের দ্বিতীয় সূত্র।'

'এবার বুঝতে পারছি তোমাদের মতলব,' বড় করে শ্বাস ফেলল মুরল্যাণ্ড। 'ট্যাবলেটটা নিশ্চয় এখনও ইংল্যাণ্ডেই আছে,

তাই না?'

'হ্যাঁ। অকশন হাউস থেকে ভিএক্সএন ইণ্ডাস্ট্রিজ নামে এক কোম্পানি কিনেছে ওই মোমফলক। কেণ্টে ওদের একটা প্রাইভেট এস্টেট আছে।'

'ফলকটা ওরা আমাদেরকে দেখতে দেবে?'

'চেষ্টা করে দেখব। আজ বিকেলেই রেমিকে নিয়ে ওখানে যাচ্ছি আমি।'

'আর আমি তখন কী করব? লণ্ডনের পাবগুলোয় ঢুঁ মেরে বেড়াব? মন্দ হয় না তা হলে।'

'উঁহুঁ। তুমি যাবে তৃতীয় সূত্রের খোঁজে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে।'

'মিউজিয়াম?' এমনভাবে মুখ বাঁকাল মুরল্যাণ্ড, যেন ময়লা ঘাঁটতে বলা হয়েছে তাকে। 'কেন?'

'গ্যারেট বলছিল মাইডাসের সমাধি আছে নেপলস্ শহরের তলায়,' বলল রেমি। 'আর আর্কিমিডিসের কোডেক্স বলছে, সেটার সূত্র পাওয়া যাবে নিয়াপোলিসের পূর্বসূরিদের কামরায়। নেপলস্-এর গ্রিক নাম নিয়াপোলিস।'

'ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নেপলস্-এর পূর্বসূরিদের কামরা থাকে কী করে?' ঠাট্টা করল মুরল্যাণ্ড, 'মিউজিয়ামটা পুরনো... তাই বলে এত পুরনো, তা তো জানতাম না!'

'কামরা-টামরা না,' হাসি চেপে বলল রেমি। 'আপনি ওখানে যাবেন এলজিন মার্বলস-এর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে।'

'এলজিন মার্বলস্?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ফুটল মুরল্যাণ্ডের খোঁজে।

'আঠারো শতকের শুরুর দিকে গ্রিসের পার্থেনন থেকে লর্ড এলজিন বেশ কিছু মার্বেলের মূর্তি এবং খোদাই করা প্রস্তরখণ্ড উদ্ধার করে এনেছিলেন। ওগুলোকেই এলজিন মার্বলস্ বলে। ব্রিট্রিশ মিউজিয়ামের ডিসপ্লে-তে আছে ওগুলো।'

'তো?'

'আমার ধারণা, এটাও এক ধরনের ধাঁধা। নিয়াপোলিসের আদি-নাম ছিল পার্থেনোপ... তারমানে পার্থেনোপ-ই নিয়াপোলিসের পূর্বসূরি। তার অর্থ দাঁড়ায়, পার্থেনোপের কামরার কথা বলেছেন আর্কিমিডিস। পার্থেনোপের অর্থ হচ্ছে, কুমারী নগরী। কাজেই কুমারী নগরীর কামরাকে কুমারীর কামরাও বলা যেতে পারে অনায়াসে।'

'এখনও ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো না,' মুখ বাঁকা করে বলল মুরল্যাণ্ড। 'আপনি কিন্তু আমার মাথার ভিতরে জট লাগিয়ে দিচ্ছেন।'

'কুমারীর কামরাকে গ্রিক ভাষায় কী বলে, জানেন?' একটু হাসল রেমি। 'পার্থেনন!'

'পার্থেনন?' কপালে ভাঁজ পড়ল মুরল্যাণ্ডের। 'মানে অ্যাথেন্সের অ্যাক্রোপোলিসের ডগায় যে প্রাচীন মন্দিরটা দাঁড়িয়ে আছে, ওটার কথা বলছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রেমি। হাতের প্রিণ্টআউটের দিকে ইশারা করে বলল, 'এখানকার ধাঁধার সহজ-সরল অর্থ করলে দাঁড়ায়—জিয়োলেব নিয়ে পার্থেননে যাও... তা হলে হেরাক্লিসের আসন এবং আফ্রোদিতির পা তোমাকে পথ দেখাবে।'

'এটা সহজ-সরল অর্থ হয় কী করে? কী বোঝাতে চাইছেন আর্কিমিডিস?'

হতাশায় মাথা নাড়ল রেমি। 'জানি না। আমি ক্লাসিকাল লিটারেচারের বিশেষজ্ঞ, আর্কিটেকচারের নই। এ-জন্যই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে একজন এক্সপার্ট খুঁজে বের করতে হবে আপনাকে। কারণ... বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন... আর্কিমিডিসের ম্যাপের তৃতীয় সূত্রটা লুকিয়ে আছে পার্থেননে!'

বিশ

গ্যারাজ ডোর খুলে যাওয়ার বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের। হাতঘড়ি কেড়ে নিয়েছে কিডন্যাপাররা, কাজেই বুঝতে পারলেন না ক'টা বাজে। তবে প্রকোষ্ঠের ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার; ডিনার হিসেবে স্যাণ্ডউইচ খেয়েছিলেন, তা হজম হয়ে গিয়ে আবার খিদে পেতে শুরু করেছে; কাজেই আন্দাজ করলেন ভোর হতে বেশি দেরি নেই। বিছানা ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। ফোকরের ঢাকনা লাগানো, কিন্তু ওটা জং-ধরা। আঙুল দিয়ে খোঁচা দিতেই ছোট্ট একটা ফাটল দেখা দিল। সেখান দিয়ে বাইরে তাকালেন অ্যাডমিরাল।

ঢাকনাটার আসলে যে কী প্রয়োজন, তা এখনও বুঝতে পারছেন না তিনি। বন্দিদের দৃষ্টি থেকে কী লুকাতে চাইছে এরা? চেহারা নয়... কারণ অপহরণের সময় দুই কিডন্যাপারের চেহারা খুব ভালভাবেই দেখতে পেয়েছেন হ্যামিলটন। সেটাও একটা দুশ্চিন্তার বিষয়। চেহারা এবং নাম... দুটোই ফাঁস করেছে ওরা; তারমানে দুই ভিকটিমকে জ্যান্ত ছেড়ে দেবার কোনও প্ল্যান নেই ওদের।

পালানোটা তাই অতি জরুরি হয়ে উঠেছে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন এবং বন্দি মেয়েটির জন্য। ওর নামও ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন তিনি—র‍্যাচেল বলে ওকে ডাকছিল কিডন্যাপাররা। মেয়েটার কান্নার শব্দ পেয়েছেন অ্যাডমিরাল, তবে

সে-শব্দ জোরালো নয়। পাশের কামরায় নয়, একেবারে শেষ মাথার কামরায় রাখা হয়েছে ওকে, যাতে দুই বন্দি পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে। দেয়ালে টোকা দিয়ে কয়েক দফা মেয়েটার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছেন হ্যামিলটন, কিন্তু জবাব পাননি। কথা বলতে চাইলে গলা চড়িয়ে চেঁচাতে হবে, সেটা সম্ভব নয়। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।

ঢাকনার ফাটলে চোখ রাখতেই দ্বিতীয় একটা ভ্যানকে ব্যাক করে ওয়্যারহাউসে ঢুকতে দেখলেন অ্যাডমিরাল। প্রথম ভ্যানটার পাশে এসে থামল ওটা। ইঞ্জিন বন্ধ হলো, ক্যাব থেকে নেমে এল নতুন দু'জন মানুষ। শ্বেতাঙ্গ। একজন খানিকটা মোটাসোটা, গায়ে নোংরা পোশাক। দ্বিতীয়জন ছিপছিপে গড়নের, চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ। কেন যেন মনে হলো, এই লোকই এসব কর্মকাণ্ডের হোতা।

চোখ কচলাতে কচলাতে দুই নবাগতকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেল কাটনার আর বেনসন। ভ্যানের পিছনে মিলিত হলো সবাই। নিচু গলায় কুশল বিনিময়ের পর ভ্যানের পিছনের দরজা খুলে ধরল নোংরা পোশাক পরা লোকটা, বাকিরা গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকাল ভ্যানের ভিতরদিকে। কী আছে ওখানে কে জানে।

'জিনিসটা ধরা নিরাপদ তো, গ্যারেট?' জিজ্ঞেস করল কাটনার। আবছাভাবে তার গলা শুনতে পেলেন অ্যাডমিরাল।

'রেনফিল্ড,' নোংরা পোশাকধারীর দিকে ঘাড় ফেরাল গ্যারেট নামের লোকটা, 'ওদেরকে রিডিং দেখাও।'

এদিকে পিঠ দিয়ে রেখেছে রেনফিল্ড, কাজেই অ্যাডমিরাল দেখতে পেলেন না, তার হাতে কী আছে। কয়েক দফা হাত নাড়ল সে, তারপর ভোল্টেজ মিটারের মত একটা জিনিস দেখাল সঙ্গীদেরকে।

'দেখলে?' বলল রেনফিল্ড। 'কোনও সমস্যা নেই।'

'তাও ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না,' মাথা নাড়ল কাটনার।

'তা হলে কী পছন্দ তোমার? দুই মিলিয়ন ডলার?' বিরক্ত গলায় বলল গ্যারেট।

'সেটা কার না পছন্দ বলো?'

'এমনি এমনি পাচ্ছ না টাকাটা... বিপজ্জনক কাজের বিনিময়ে পাচ্ছ। কথা কম। জিনিসটা নামিয়ে আনো ভ্যান থেকে, টেবিলের উপর রাখো।'

একজনকেই দুই মিলিয়ন ডলার! ভ্রূকুটি দেখা দিল অ্যাডমিরালের কপালে। মুক্তিপণ হিসেবে কত টাকা পাবে বলে ভাবছে ওরা?

ভ্যানে উঠে গেল চার দুর্বৃত্ত। একটু পরেই ধরাধরি করে একটা কালো বাক্স নামিয়ে আনল। আকারে খুব বড় নয় ওটা, কিন্তু লোকগুলোকে বাঁকা হয়ে যেতে দেখে বোঝা গেল, জিনিসটা অত্যন্ত ভারী। কী আছে ভিতরে?

টেবিলের উপর বাক্সটা রেখে ঘিরে দাঁড়াল চারজনে। ফলে ওটার খুঁটিনাটি দেখতে পেলেন না অ্যাডমিরাল।

'আমাদের অতিথিদের খবর কী?' জানতে চাইল গ্যারেট।

'ভাল,' বলল বেনসন। 'অ্যাডমিরাল শুরুতে একটু তেড়িবেড়ি করতে চাইছিল, কিন্তু ওকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি আমরা। আর মেয়েটা এখনও ড্রাগের প্রভাবে নেতিয়ে পড়ে আছে। পুরোপুরি জেগে ওঠেনি।'

ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাডমিরালের দরজার দিকে তাকাল গ্যারেট। শঙ্কিত হয়ে উঠলেন তিনি, ফাটলটা দেখতে পাচ্ছে নাকি? কিন্তু এত সরু ফাটল তো অত দূর থেকে দেখা যাবার কথা নয়! তাঁর ধারণাই সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার সামনে তাকাল গ্যারেট। সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'হ্যামিলটনের

ব্যাপারে খুব সাবধান। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখবে। বুড়ো হলে কী হবে, খুবই চালু মাল।'

'কিচ্ছু ভেবো না,' তাকে আশ্বস্ত করল বেনসন। 'আমরাও কম চালু নই।' ভ্যানের দিকে ইশারা করল। 'বাকি জিনিসগুলোর কী হবে?'

'ওয়্যারহাউসের ওই মাথায় নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখো,' বলল গ্যারেট। 'বাইরে ফেলা ঠিক হবে না। কেউ খুঁজে পেলে সমস্যা হতে পারে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভ্যানে উঠে পড়ল কাটনার আর বেনসন। ইঞ্জিন চালু করে ওটাকে নিয়ে গেল ওয়্যারহাউসের এক প্রান্তে। ওখানে পৌঁছুনোর পর পিছন থেকে নানা রকম লোহার টুকরো, নাট-বল্টু, ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করল মেঝের উপরে।

গ্যারেটের দিকে মনোযোগ দিলেন অ্যাডমিরাল, রেনফিল্ডের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছে সে। গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফেলেছে দলনেতা, অল্প কয়েকটা শব্দ শুধু উদ্ধার করা গেল।

'ট্রাক... সোমবারের মধ্যে... যথেষ্ট ডাস্ট... ব্যাঙ্ক... ত্রিশ বছর...'

এইসময়ে আবার স্টার্ট নিল দ্বিতীয় ভ্যানের ইঞ্জিন—ওটাকে আগের জায়গায় নিয়ে আসছে কাটনার আর বেনসন। গ্যারেটের কণ্ঠ পুরোপুরি চাপা পড়ে গেল। ভ্যানটা সরে আসায় ওয়্যারহাউসের কোনায় ডাম্প করা জিনিসগুলো পরিষ্কার দেখতে পেলেন হ্যামিলটন।

দৃষ্টিশক্তি খুবই ভাল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের। বয়সের কারণে রিডিং গ্লাস ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু দূরের জিনিস আজও স্পষ্ট দেখতে পান তিনি। দুর্বৃত্তদের ফেলে রাখা জিনিসগুলোর মাঝে সিলিণ্ডারের মত একটা আকৃতি ধরা পড়ল তাঁর চোখে। পুরোপুরি সিলিণ্ডার বলা চলে না, ওটার গায়ে ফিন-ও

দেখতে পাচ্ছেন।

সবুজ রঙের অদ্ভুত জিনিসটা চেনা চেনা লাগছে অ্যাডমিরালের কাছে। একবার ভাবলেন অচেনা ডিজাইনের কোনও কম্প্রেশার হতে পারে, কিন্তু একটু পরেই বদলে গেল ধারণাটা। সিলিণ্ডারের গোড়ায় রাশান হরফ ফুটে আছে... আর তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুচ্চমকের মত মনে পড়ে গেল সব। এই জিনিসের ছবি তিনি আগেও দেখেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিটির অন্যতম সদস্য অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। শত্রু দেশের হাতে কী কী ধরনের মারণাস্ত্র থাকতে পারে, এবং তা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হলে কীভাবে ঠেকানো যাবে... সে-সব নিয়েই কাজ করে এই কমিটি। নিউক্লিয়ার, কেমিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল ওয়েপন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানও রাখেন তিনি। বছরদুই আগে কমিটি-সদস্য হিসেবে একটা সরকারি প্রতিনিধি-দলের সঙ্গে রাশায় যেতে হয়েছিল তাঁকে—রুশ সরকারের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের একটা মিটিং করবার জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর থেকে নিউক্লিয়ার সিকিউরিটি বলে আর কিছুই নেই রাশা ও তার প্রতিবেশী দেশগুলোয়। সোভিয়েত আমলের বহু অস্ত্র-শস্ত্র এবং নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল গায়েব হয়ে গেছে। টেরোরিস্টদের জন্য সে-সব জিনিস অত্যন্ত সহজলভ্য। যে-কোনও সময় চোরাই ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করে আণবিক বোমা বানাতে পারে ওরা, আমেরিকার মাটিতে পাচার করতে পারে। এ-ধরনের ঘটনা ঠেকানোর জন্য রুশ সরকারের সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন তাঁরা।

আলোচনার এক পর্যায়ে উঠে আসে ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়ামের বাইরে অন্যান্য নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়ালের প্রসঙ্গ। এ-ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটা রয়েছে রেডিও-আইসোটোপ

থারমাল জেনারেটর, সংক্ষেপে আরটিজি থেকে।

আর্কটিক সাগরে চলাচলকারী হাজারো জাহাজের নেভিগেশনে সাহায্য করবার জন্য রাশার বিশাল উপকূল এলাকায় রয়েছে কয়েক শ' লাইট হাউস ও সিগনাল স্টেশন। দুর্গম এলাকায় স্থাপিত এতসব স্টেশনে লোক নিয়োগ করা কঠিন... আরও কঠিন নিয়মিত ওসব জায়গায় ফিউয়েল পৌঁছানো কিংবা রক্ষণাবেক্ষণ করা। সোভিয়েত আমলে সে-কারণে অটোমেটেড করে ফেলা হয়েছিল এসব লাইটহাউস এবং সিগনাল স্টেশনকে। প্রায় সবগুলোতেই স্থাপন করা হয়েছিল আরটিজি, কারণ ওগুলো বছরের পর বছর কোনও ধরনের মেইনটেন্যান্স ছাড়াই চলতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, এবং পরবর্তী সময়ে মিলিটারি বাজেটে কাটছাঁট করবার কারণে এ-সব স্থাপনা পরিত্যক্ত হয়ে যায়, নিরাপত্তা ব্যবস্থাও হয়ে পড়ে অচল। ফলে স্থানীয় তস্করদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছে লাইটহাউস এবং সিগনাল স্টেশনগুলো। প্রায়ই লোহা বা অন্যান্য ইকুইপমেণ্ট চুরির জন্য হানা দেয় ওরা, কখনও কখনও নিজের অজান্তেই খোলস ভেঙে বের করে আনে জেনারেটরের অভ্যন্তরের পাওয়ার সোর্স হিসেবে ব্যবহৃত স্ট্রনটিয়াম-৯০ ভরা অতিমাত্রায় তেজস্ক্রিয় ক্যাপসুল। এ-ধরনের একটা ঘটনার উদাহরণও দেয়া হয় মিটিঙে।

বছর তিন আগে, জর্জিয়ার এক গ্রামের তিনজন শিকারি পরিত্যক্ত এক লাইটহাউস থেকে চুরি করে আনে কয়েকটা ক্যাপসুল, ভেবেছিল ক্যাম্পফায়ার না জ্বেলে ওগুলোর তাপেই শরীর গরম রাখবে। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভয়াবহ রেডিয়েশন পয়েজনিঙে আক্রান্ত হয় ওরা। একজন তৎক্ষণাৎ মারা পড়ে, বাকি দু'জনকে হাসপাতালে নেয়া হলেও সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘদিন নরকযন্ত্রণা ভোগ করবার পর ওরাও মারা

যায়। এ-রকম আরও ঘটনা আছে।

ওয়্যারহাউসের এককোণে পড়ে থাকা সবুজ সিলিণ্ডারটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। রুশ অথরিটির দেখানো আরটিজি-র ছবির সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে ওটা। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হলো, ওটা স্রেফ খোলস। ভিতরের জিনিস বের করে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এখন তিনি বুঝতে পারছেন, কেন কালো বাক্সটা এত ভারী। নিশ্চয়ই সীসার আবরণ রয়েছে ওর ভিতরে। আবরণের আড়ালে রাখা হয়েছে জেনারেটর থেকে বের করে নেয়া স্ট্রনটিয়াম-৯০।

পরিষ্কার বুঝতে পারছেন অ্যাডমিরাল, নিছক কিডন্যাপিঙের কবলে পড়েননি তিনি বা র‍্যাচেল নামের অচেনা মেয়েটি। আরও অনেক বড়... অনেক ভয়ঙ্কর কোনও পরিকল্পনা রয়েছে লোকগুলোর। যেভাবেই হোক, এ-খবর নুমা পর্যন্ত পৌঁছুতেই হবে তাঁকে। কিন্তু কীভাবে?

মাথা ঘামাতে শুরু করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। পালাবার চিন্তা করছেন না আর।

একুশ

জোরালো টেইলউইণ্ডের আনুকূল্য পাওয়ায় দুপুর দুটো বাজার বিশ মিনিট আগেই লণ্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করল নুমার গালফস্ট্রিম জেট। ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের ফর্মালিটি সারতে সময় লাগল আধঘণ্টা, এরপরেই এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল

রানা, মুরল্যাণ্ড আর রেমি। রানা এজেন্সির লণ্ডন শাখা থেকে একটা গাড়ি পাঠানো হয়েছে, সেটা নিয়ে রাজধানীর পশ্চিমে... কেন্টে যাবে রানা আর রেমি, ভিএক্সএন ইণ্ডাস্ট্রিজের প্রাইভেট এস্টেটে। বিমান থেকেই ওদেরকে ফোন করেছিল রানা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছিল এস্টেটের মালিকের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। কাঠখোট্টা স্বভাবের এক অ্যাসিসটেন্ট রিসিভ করেছিল সেই ফোন, বলে দিয়েছিল—তার বস অত্যন্ত ব্যস্ত; কারও সঙ্গে দেখা করবার সময় নেই তাঁর! এ-অবস্থায় রানার হাত থেকে ফোনের রিসিভার চেয়ে নেয় রেমি, নিজের সিলেব্রিটি ক্রিডেনশিয়াল ব্যবহার করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আদায় করে নিয়েছে সে। *চেজিং দ্য পাস্ট* ইংল্যাণ্ডেও অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি অনুষ্ঠান; সেই অনুষ্ঠানের উপস্থাপিকা বিশেষ কাজে এস্টেটে আসতে চাইছে শুনে আর গাঁইগুঁই করেনি অ্যাসিসটেন্ট। বসের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে বলে দিয়েছে—ওরা যদি তিনটে থেকে চারটার মধ্যে আসতে পারে, তা হলে দেখা করবেন তিনি।

মুরল্যাণ্ডের গন্তব্য উল্টো দিকে—একেবারে লণ্ডনের প্রাণকেন্দ্রে যেতে হবে ওকে, রাশ আওয়ারের ট্রাফিক ঠেলে। যানজট এড়াবার জন্য ট্যাক্সি নেবে না বলে ঠিক করেছে ও। বাস ধরে প্যাডিংটন স্টেশনে যাবে, সেখান থেকে পাতাল-রেলে চেপে হোলবর্ন। ব্রিটিশ মিউজিয়াম পর্যন্ত বাকি পথটুকু হেঁটেই চলে যেতে পারবে। রানা আর রেমির চেয়ে সহজে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে ও। কোডেক্সের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি... সেইসঙ্গে একটা পাতার ছবি ই-মেইল করতেই ড. টেরেন্স ফিলবি নামে জনৈক আর্কিয়োলজিস্ট সাগ্রহে রাজি হয়েছেন ওর সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রলোক ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পার্থেনন বিষয়ক রেসিডেন্ট এক্সপার্ট।

এজেন্সি থেকে পাঠানো রেঞ্জ রোভারের পিছনে জিয়োলেবটা

তুলল রানা, মোমফলক দেখবার সময় ওটা কাজে লাগতে পারে। মুরল্যাণ্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এরপর গাড়িতে উঠে বসল ও আর রেমি। রওনা হয়ে গেল কেন্টের উদ্দেশে।

গাড়ি থেকেই ল্যারি কিং-কে ফোন করল রানা, গ্যারেটের কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে কি না জানবার জন্য।

'হ্যালো?' দু'বার রিং হবার পর শোনা গেল ল্যারির ক্লান্ত গলা। ওয়াশিংটনে এখন ভোর ছ'টা।

স্পিকার অন করল রানা। 'ল্যারি, আমি রানা। কী ব্যাপার, রাতে ঘুমাওনি?' ততক্ষণে মোড় নিয়ে বেসিংস্টোক-অভিমুখী এম-থ্রি মোটরওয়েতে উঠে এসেছে রেঞ্জ রোভার।

'কাজের ফাঁকে ফাঁকে সামান্য জিরিয়ে নিয়েছি,' বলল ল্যারি। 'পরে ঘুমাব।'

'থ্যাঙ্কস, ল্যারি। কোনও খবর আছে?'

'উঁহুঁ। আমেরিকার সমস্ত ডেটাবেজ খুঁজে দেখেছে ভিনাস, কিন্তু তোমার অ্যান্থনি গ্যারেটের কোনও চিহ্ন খুঁজে পায়নি। লোকটাকে ভূত বললে কম বলা হয় না। ফিঙ্গারপ্রিন্টও নেই আমাদের কাছে, পিঠ তাই দেয়ালে ঠেকে গেছে বলতে পারো।'

সিয়াটল থেকে রওনা হবার আগেই ফিঙ্গারপ্রিন্টের খোঁজে ডাস্টিং করা হয়েছিল জিয়োলেবের গায়ে। কিন্তু তাতে কিছুই পাওয়া যায়নি। গ্যারেট অত্যন্ত সতর্ক, নিশ্চয়ই গ্লাভ ব্যবহার করেছে ডিভাইসটা নাড়াচাড়া করবার সময়।

'অকশন হাউসের ডাকাতি সম্পর্কে কী জানতে পারলেন?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'ওই রহস্যেরও কিনারা করতে পারেনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড,' ল্যারি বলল। 'ডাকাতদের তো ধরতে পারেইনি, খোয়া যাওয়া আর্টিফ্যাক্টগুলোও এখন পর্যন্ত উদয় হয়নি কোথাও।'

'ওগুলো কি তা হলে বিক্রি করেনি? হাতটা নাহয় রেখে দিল,

কিন্তু বাকি জিনিস বেচেই তো ক্যারিবিয়ানে রিটায়ারমেন্টে যেতে পারত গ্যারেট।'

'হয়তো টাকার পরিমাণটা যথেষ্ট মনে হয়নি তার কাছে। মাইডাস চেম্বার খুঁজে পেলে আরও অনেক বেশি ধনী হতে পারবে গ্যারেট। আমি এরই মধ্যে কিছুটা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি। ও বলেছে, সোনার মূর্তিটা ছ'ফুট বাই ছ'ফুট সাইজের একটা ব্লকের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাই না?'

'চেম্বারের দেয়ালগুলোও সোনার তৈরি,' যোগ করল রানা।

'দেয়ালের পুরুত্ব জানি না আমরা, কাজেই আপাতত ওগুলোর কথা থাক। শুধু মূর্তির ভিত-টা নিয়েই হিসেব করি। সোনার আনবিক ঘনত্ব খুবই বেশি, এ-কারণে ছ'ফুটের একটা নিরেট কিউবের ওজন হবে... যদি চব্বিশ ক্যারাটের সোনা ধরি... এক লক্ষ আঠারো হাজার কিলোগ্রাম। মানে প্রায় চল্লিশ লক্ষ আউন্স। বর্তমান রেটে খোলা বাজারে এই সোনার দাম দাঁড়াচ্ছে প্রায় ছয় বিলিয়ন ডলার।'

চোয়াল ঝুলে পড়ল রেমির। 'বিলিয়ন?'

'হ্যাঁ। রেটের তারতম্যের কারণে সামান্য এদিক-ওদিক হতে পারে, তবে বিলিয়নের হিসাবের নীচে কিছুতেই নামবে না।'

আর্কিমিডিসের ধাঁধা আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের চিন্তায় এতই ব্যস্ত ছিল রানা, সোনার হিসেব করবার কথা মাথাতেই আসেনি। এখন ল্যারির মুখে টাকার অঙ্কটা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল ছয় বিলিয়ন ডলার! তাও কি না শুধু মূর্তির পা'দানি-র দাম! সব মিলিয়ে তা হলে কত টাকার সোনা পাওয়া যাবে মাইডাস চেম্বারে? এর এক শ' ভাগের এক ভাগ টাকার জন্য আপন মা-বাপকে খুন করতে পারে অপরাধীরা... অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের অপহরণ তো সে তুলনায় কিছুই না! গ্যারেটকে আর পাগল বলে মনে হচ্ছে না ওর। কেন লোকটা মারাত্মক ঝুঁকি

নিয়েছে ওকে আর রেমিকে রিক্রুট করবার জন্য, তা বোঝা যাচ্ছে এবার। মাইডাস টাচ যদি না-ও পায়, চেম্বারের সোনাগুলোই গ্যারেটের সব ধরনের চাহিদা মেটাতে পারবে। বৈধ পথে কেন চেষ্টা করছে না, তা-ও পরিষ্কার। ওই সোনার পুরোটাই নিজের জন্য চায় গ্যারেট। ইটালিয়ান সরকারকে জানিয়ে যদি বৈধ এক্সপিডিশন চালায়, তা হলে উদ্ধারকারী হিসেবে নামমাত্র ট্রেজার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে তাকে।

'জিপিএস ট্র্যাকারটার কী খবর?' ল্যারির উদ্দেশে রানার পরের জিজ্ঞাসা।

'এখনও ওটা নিয়ে কাজ করছি আমরা। সিগনালটা এনক্রিপ্টেড... অন্তত আট-দশটা গ্লোবাল সার্ভার ঘুরে পৌঁছুচ্ছে রিসিভারে। একটু সময় লাগবে।'

'ঠিক আছে। যখনি কিছু জানতে পার, আমাকে খবর দিয়ো।'

'নিশ্চয়ই!' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল ল্যারি।

'ভদ্রলোককে খুব একটা আশাবাদী মনে হলো না,' মন্তব্য করল রেমি।

'ঠিক তার উল্টো,' বলল রানা। 'ল্যারি কখনও হতাশ হয় না। কোথাও কোনও সূত্র যদি থাকে, তা হলে সেটা ও বের করেই ছাড়বে।'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল রেমি। 'কিন্তু একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না—গ্যারেট যদি মাইডাস চেম্বারের স্বর্ণের পিছনেই লেগে থাকে, আমাদেরকে তা হলে মাইডাস টাচের আজগুবি গল্প শোনাতে গেল কেন?'

'গল্পটা আজগুবি না-ও হতে পারে,' বলল রানা। 'আর্কিমিডিসের কোডেক্স এ-ব্যাপারে কী বলছে?'

'হাতের কথা আছে,' স্বীকার করল রেমি। 'আর্কিমিডিস নিজ চোখে দেখেছেন ওটা। তারমানে হাত আর মূর্তি... দুটোই

কমপক্ষে দু'হাজার দুই শ' বছরের পুরনো।'

'তারমানে গ্যারেট একেবারে মিথ্যে বলেনি আমাদেরকে,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'আমি সায়েন্টিস্ট নই, তারপরেও হাতটা যথেষ্ট কনভিন্সিং বলে মনে হয়েছে আমার কাছে।'

'কিন্তু একটা রক্তমাংসের হাত সোনায় পরিণত হতে পারে না। জাদু ছাড়া সম্ভব নয় ওটা!'

'জাদুতে আমিও বিশ্বাস করি না। তবে ভাবতে দোষ নেই, আলকেমির এমন কোনও কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন মাইডাস, যা আজ পর্যন্ত আর কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি।'

'সেই কৌশল তা হলে আমরা খুঁজে বের করব কীভাবে?'

জবাব না দিয়ে নীরব হয়ে গেল রানা। এখন আর এ-নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আপাতত আর্কিমিডিসের ম্যাপ খুঁজে বের করা ওদের প্রধান কাজ। সমাধিটা খুঁজে পেলে নাহয় বাকিটা ভাবা যাবে।

যাত্রার বাকি সময়টায় আর কথা হলো না ওদের মাঝে। ত্রিশ মিনিট পর ভিএক্সএন-এর এস্টেটের ফটকে পৌঁছুল রেঞ্জ রোভার। গাড়ি থেকে নেমে দেয়ালে লাগানো বাযার চাপল রানা।

'কী চাই?' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খসখসে একটা কণ্ঠ শোনা গেল স্পিকারে। বলার ভঙ্গিতে কড়া ইটালিয়ান টান।

'মাসুদ রানা এবং ড. রেমি হ্যাডলি। আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'ও হ্যাঁ। প্লিজ, ভিতরে আসুন।'

মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে খুলে গেল ফটকের দশ ফুট উঁচু পাল্লাদুটো। গাড়ি নিয়ে আগে বাড়ল রানা। ফটকের ওপাশে একটা চওড়া শান-বাঁধানো পথ চলে গেছে ভিতরদিকে, দু'পাশে সারি বেঁধে দাঁড়ানো শানদার ওক গাছগুলো দেখেই বোঝা গেল—চমৎকার আবহাওয়া, উদয়াস্ত পরিচর্যা এবং একনিষ্ঠ

চেষ্টার ফসল ওগুলো।

আধ-মাইল দীর্ঘ এই রাস্তাটার শেষে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদোপম একটা প্রাচীন ম্যানশন। এলিজাবেথিয়ান রীতিতে গড়া, কত বছর আগে তৈরি করা হয়েছে কে জানে। তবে নিয়মিত মেরামত এবং রেস্টোরেশনের ফলে ঝকঝক করছে বাড়িটা। হাঁ হয়ে গেল রানা ও রেমি। রাজপ্রাসাদ বললে ভুল বলা হয় না, এমনই বাড়িটার চেহারা।

উঠোনটা পাকা, সেখানে সার বেঁধে রাখা হয়েছে বেশ কিছু দামি গাড়ি। রানা নিজে গাড়ির সমঝদার, স্বভাবতই চোখ চলে গেল ওদিকে, একটা গাড়ি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওর। লাল রঙের একটা *ফেরারি ফোর-ফাইভ-এইট ইটালিয়া,* দুনিয়ার সবচেয়ে দামি গাড়িগুলোর একটা। টপ স্পিড ঘণ্টায় দুই শ' মাইল! এই গাড়ির ছবিই শুধু দেখেছে ও, চালানোর সৌভাগ্য হয়নি।

ইটালিয়ার মুখোমুখি রেঞ্জ রোভার পার্ক করল রানা। সদর দরজায় টোকা দেবার আগে কাছ থেকে একবার দেখে নিতে চায় ওটাকে। গাড়ি থেকে নেমে ইটালিয়ার দিকে এগিয়ে গেল ও। ঘুরে ঘুরে দেখল চারপাশ থেকে।

খানিক পরে পিছন থেকে ভেসে এল ঘোড়ার খুরের খটখটানি। এক সঙ্গে ঘুরল রানা আর রেমি। সওয়ারী নিয়ে খয়েরি রঙের একটা টগবগে ঘোড়া দুলকি চালে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

ঘোড়াটাকে দেখেই সভয়ে পিছিয়ে গেল রেমি। আশ্রয় নিল রানার শরীরের পিছনে।

'কী হয়েছে?' ভ্রূকুটি করে জানতে চাইল রানা।

'ঘোড়া পছন্দ করি না আমি,' অস্বস্তিমাখা কণ্ঠে জানাল রেমি।

'সে কী! কেন?'

'এত বড় একটা জানোয়ার... কিন্তু মেজাজ-মর্জির কোনও

ঠিক নেই।'

'কে বলেছে? ঘোড়ার মত শান্ত আর বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাবের ক'টা প্রাণী আছে, বলো?'

'এসব বলে লাভ নেই। ঘোড়া দেখলেই ভয় করে আমার।'

'ঘোড়াকে ভয়!' অবাক হলো রানা। 'তুমি না খামারে বড় হয়েছ? ওখানে ঘোড়া ছিল না?'

'ছিল। ঘোড়াকে ভয় পেতেও শুরু করেছি ওখানেই।' সংক্ষেপে বলল রেমি। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় গেল না।

আর কিছু বলবার সুযোগ পেল না রানা। ঘোড়াটা থমকে দাঁড়িয়েছে ওদের কয়েক গজ সামনে। কারুকাজ করা দামি স্যাডলে বসে আছে তার সওয়ারী। অত্যন্ত সুন্দরী এক মেয়ে, বয়স ত্রিশের কোঠায়। টানা টানা চোখ, পুরুষ্ট ঠোঁট, আর মাথায় কাজল-কালো কেশ... এ-মুহূর্তে ঝুঁটি করে বেঁধে রেখেছে। আঁটসাঁট রাইডিং ড্রেসের তলায় বন্দি থাকতে চাইছে না উদ্ভিন্ন যৌবন, আত্মপ্রকাশ করতে চাইছে সুডৌল স্তনযুগল ও নিতম্ব। সুগঠিত দেহ আর অপরূপ চেহারা মিলে নিখুঁত নারী-ই বলা যেত, যদি দু'চোখের দৃষ্টি শীতল না হতো। মেয়েটির চোখের মণিতে বাসা বেঁধেছে রাজ্যের কাঠিন্য; কমনীয়তার সামান্যতম চিহ্নও নেই ওখানে।

দুই অতিথির দিকে তাকিয়ে হাসল সে সুন্দর করে। বলল, 'শি'জ আ বিউটি! তাই না?'

নার্ভাসনেস সামলে রানার পাশে এসে দাঁড়াল রেমি। হাবভাবেই বোঝা যাচ্ছে, মেয়েটি এস্টেটের মালিকপক্ষের কেউ হবে। তার সামনে স্বাভাবিক থাকা দরকার। পাল্টা একটু হেসে ও বলল, 'হ্যাঁ, ঘোড়াটা সত্যিই চমৎকার।'

'ঘোড়াটা শি নয়, হি।' রেমির ভুল ধরিয়ে দিল মেয়েটি। 'মনে হচ্ছে আপনি ঘোড়া সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না।' আদর

করে ঘোড়ার ঘাড়ে হাত বোলাল। 'এ হচ্ছে জিয়োসেপ্পি... আমার খাস অ্যারাবিয়ান বাহন। বিউটি বলতে আমি গাড়িটাকে বোঝাচ্ছিলাম। আপনারা খুব আগ্রহ নিয়ে দেখছিলেন ওটাকে—আমি লক্ষ করেছি।'

'হ্যাঁ, ওটারও তুলনা নেই,' বলে উঠল রানা। 'ঘোড়ার কথাই যদি তোলেন, ইটালিয়ার ভি-এইট ইঞ্জিনের ভিতর পাঁচশো ষাটটা ঘোড়া বাস করছে... মানে, ফাইভ হানড্রেড অ্যাণ্ড সিক্সটি হর্সপাওয়ার–সোজা কথা নয়! চালিয়ে নিশ্চয়ই খুব মজা!'

তীক্ষ্ণ চোখে রানাকে আপাদমস্তক দেখে নিল মেয়েটি। মনে হলো যেন কেনার আগে যাচাই করে নিচ্ছে কোনও জিনিস। কয়েক মুহূর্ত পর চোখ টিপে বলল, 'হ্যাঁ, মজা তো বটেই। চাইলে আপনাকে এক চক্কর ঘুরিয়ে আনতে পারি, মিস্টার...'

'মাসুদ রানা।' ইশারাটা না বোঝার ভান করল রানা। কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে, এই মেয়ে পুরুষখেকো। 'ইনি ড. রেমি হ্যাডলি।'

'আপনার ফ্রেণ্ড মনে হচ্ছে ঘোড়া পছন্দ করে না, মি. রানা,' রেকাবে পা ঠেকিয়ে এক লাফে মাটিতে নামল মেয়েটি।

'সবাই কি আর সব জানোয়ার পছন্দ করে?' হালকা গলায় বলল রানা। 'ড. হ্যাডলির পছন্দ বেড়াল।' শেষ কথাটা বানিয়ে যোগ করল।

'আমি আবার মেনিমুখো প্রাণী সহ্য করতে পারি না। আমার জানোয়ারকে হতে হবে তাগড়া... তেজি!' বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটি। 'ঠিক আপনার মত।'

'প্রশংসা করছেন, নাকি অপমান... ঠিক বুঝতে পারলাম না,' নীরস গলায় বলল রানা।

জোরে হেসে উঠল মেয়েটি। 'আপনি রসিক লোক, মি. রানা। বলুন, কীভাবে আপনাদের সেবা করতে পারি?'

'আমরা আসলে এখানকার মালিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'আমিই।' বলল মেয়েটি। 'আমার বাড়িতে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে। আমি মায়া লরেঞ্জো।' হাত বাড়িয়ে দিল সে।

অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল রেমির মুখ দিয়ে। রানাও অবাক হয়েছে, তবে সেটা প্রকাশ হতে দিল না। মায়া নামটা গতকালই শুনেছে ওরা গ্যারেটের মুখে। আর্কিমিডিসের পাযল সমাধানের দ্বিতীয় সূত্র খুঁজতে গিয়ে ঠিক একই নামের একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা কাকতালীয় হতে পারে না।

শান্ত ভঙ্গিতে মায়ার সঙ্গে হাত মেলাল ও, কিন্তু মাথার ভিতরে বইছে চিন্তার ঝড়। কোনও সন্দেহ নেই, এই মেয়ের সঙ্গেই নেপলসের প্রাচীন টানেলে মাইডাসের সমাধি খুঁজে পেয়েছিল গ্যারেট... এর ব্যাপারেই ওদেরকে সতর্ক করে দিয়েছে সে।

বাইশ

ট্রেন থেকে হোলবর্ন স্টেশনে নেমে ঘড়ি দেখল মুরল্যাণ্ড, ওর কাঁধে ঝুলছে একটা ব্যাকপ্যাক, তাতে আর্কিমিডিস কোডেক্সের ইংরেজি অনুবাদ। যতটা ভেবেছিল, তারচেয়ে বেশিই সময় ব্যয় হয়ে গেছে পাতাল-রেলে। ড. ফিলবির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। ভিড়ের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিল ও, ভূগর্ভস্থ স্টেশন থেকে উঠে এল লণ্ডনের ব্যস্ত রাস্তায়। দ্রুত পা চালাল ব্রিটিশ মিউজিয়ামের উদ্দেশে।

অনেকদিন পর লণ্ডনে এসেছে ও। ইচ্ছে হলো প্রিয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে, কিন্তু সময় নেই। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব ওর কাঁধে, এখন তার ডান-বাম করা চলবে না।

দশ মিনিটের ভিতর ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সামনের চত্বরে পৌঁছুল মুরল্যাণ্ড, লাইন ধরে ঢুকে পড়ল প্রবেশপথ পেরিয়ে। মিউজিয়ামে ঢুকতে টিকেট লাগে না, তবে ছোট একটা নোটিশ টাঙিয়ে রাখা হয়েছে স্বেচ্ছায় ডোনেশন দেবার অনুরোধ জানিয়ে। ডলার ভাঙানোর সময় পায়নি মুরল্যাণ্ড, তাই ডোনেশন বক্সের স্লটে একটা বিশ ডলারের নোট গুঁজে দিল। তারপর পা বাড়াল গ্রেট কোর্টের দিকে।

বিশাল হলঘরটা লোকে লোকারণ্য, তবে কাঁচের তৈরি উঁচু ছাদের কারণে গুমোট ভাবটা আসেনি, আলো-বাতাস আসা-যাওয়া করতে পারছে। হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে তাকাল মুরল্যাণ্ড—দেশ-বিদেশের হাজারো টুরিস্ট এসেছে পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা দেখতে। প্রতিটা ডিসপ্লের সামনে বিশাল ভিড়। মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তারা তাকিয়ে আছে দুনিয়ার প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোর দিকে।

ইনফরমেশন ডেস্কে গিয়ে আরেক দফা লাইন ধরতে হলো। মুরল্যাণ্ডের ঠিক সামনেই দাঁড়িয়েছে বেকুব টাইপের এক আমেরিকান লোক—জানতে চায়, কুইডিচ কাপে হ্যারি পটারের ব্যবহার করা জাদুর ঝাড়ু কোথায় ডিসপ্লে করা হচ্ছে। ডেস্কে বসা তরুণী তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারছে না, হ্যারি পটার আসলে রূপকথা, জাদুর ঝাড়ু বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই।

বেচারির করুণ দশা দেখে দু'পা এগোল মুরল্যাণ্ড। লোকটার কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, 'ভাই, আপনি তো ভুল জায়গায় এসেছেন। ব্রিটিশ মিউজিয়াম না, আপনাকে যেতে হবে হগওয়ার্ট মিউজিয়ামে।'

'হগওয়ার্ট মিউজিয়াম! সেটা আবার কোথায়?'

'যেখানে হ্যারি পটার লেখাপড়া করেছে... সেই হগওয়ার্ট স্কুলে!'

'ওখানে যাওয়া যায়?' বোকা বনে গেছে লোকটা।

'যাবে না কেন? কিংস ক্রস স্টেশনে, *পৌনে দশ* নম্বর প্ল্যাটফর্মে গেলেই হগওয়ার্ট এক্সপ্রেস ধরতে পারবেন। বইয়ে পড়েননি বুঝি?'

'কী?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে লোকটা।

'এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান, যান, নইলে ট্রেন মিস করবেন।' ধাক্কা দিয়ে ব্যাটাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড। নিচু স্বরে গাল দিয়ে চলে গেল সে। এতক্ষণে টের পেয়েছে, তার সঙ্গে ফাজলামি করেছে মুরল্যাণ্ড।

'থ্যাঙ্কস!' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল ইনফরমেশন ডেস্কের মেয়েটি।

'ও কিছু না,' হাসল মুরল্যাণ্ড। 'পাগল-ছাগল এভাবেই সামলাতে হয়।'

'আপনি দেখছি কাজটায় এক্সপার্ট! বলুন, কীভাবে উপকারের প্রতিদান দিতে পারি?'

'ডিনারের প্রস্তাব দিতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু সেটা সম্ভব নয় সময়স্বল্পতার কারণে। আপাতত ড. টেরেন্স ফিলবি-র অফিসটা দেখিয়ে দিলে খুশি হব। আমার নাম ববি মুরল্যাণ্ড। ওঁর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।'

'একটু ধরুন।' ইন্টারকমে কথা বলে নিল মেয়েটা। খানিক পরেই হাজির হলো এক জুনিয়র অ্যাসিসটেন্ট। মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে অনুসরণ করল মুরল্যাণ্ড।

মিউজিয়ামের অলিগলি পেরিয়ে একবারে পিছন দিককার অফিস কমপ্লেক্সে ওকে নিয়ে যাওয়া হলো। ছোট একটা কামরায়

ঢুকে দেখা পাওয়া গেল ড. ফিলবির। ষাটের কাছাকাছি বয়স, মাথায় মস্ত বড় টাক, নাকের উপর ঝুলছে ভারী পাওয়ারের চশমা। পোশাকে হাজার-হাজার ভাঁজ। আত্মভোলা পণ্ডিতের চেহারা যা হয় আর কী। রুমটাও তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে এলোমেলো হয়ে আছে। শুধু টেবিল নয়, মেঝেতেও স্তূপ হয়ে আছে অসংখ্য বই।

'গুড আফটারনুন, ড. ফিলবি!' সম্ভাষণ জানাল মুরল্যাণ্ড।

অ্যাসিসটেন্টকে বিদায় দিয়ে টেবিল থেকে উঠে এলেন ফিলবি। হাত মিলিয়ে বললেন, 'মি. ববি মুরল্যাণ্ড... রাইট?' তীক্ষ্ণ চোখে দেখলেন অতিথিকে। বোঝা গেল, গাঁট্টাগোট্টা শরীরের রেসলার টাইপ কাউকে আশা করেননি। 'এত লোক থাকতে আমার কাছে আসায় ধন্যবাদ।'

'আপনাকেও ধন্যবাদ... এত অল্প সময়ের নোটিসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার জন্য।'

'নট অ্যাট অল। আপনার ওই ম্যানুস্ক্রিপ্টের স্যাম্পল দেখার পর আমি নিজেও আগ্রহী হয়ে উঠেছি।'

রেমির কানেকশন ধরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে যোগাযোগ করেছিল মুরল্যাণ্ড, নিজের পরিচয় দিয়েছে *চেঞ্জিং দ্য পাস্ট*-এর কনসালট্যান্ট হিসেবে। প্রাচীন এক গ্রিক পাণ্ডুলিপির ব্যাপারে আলোচনা করতে চায় বলে জানিয়েছিল। পর পর কয়েকজন আর্কিয়োলজিস্ট অনাগ্রহ প্রকাশের পর ফিলবি-ই খানিকটা উৎসাহ দেখান। মূল কোডেক্সের একটা পাতার ফটোগ্রাফ এরপর ই-মেইল করেছিল মুরল্যাণ্ড, দ্রুত ভদ্রলোকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবার আশায়। পাতাটায় আর্কিমিডিস বা মাইডাসের উল্লেখ নেই, তবে হেরাক্লিস আর অ্যাফ্রোদিতির কথা আছে। ক্যাটালগ হবার আগেই অকশন হাউস থেকে কোডেক্সটা চুরি করেছিল গ্যারেট, কাজেই মুরল্যাণ্ডের পাণ্ডুলিপি আর চোরাই

কোডেক্স যে একই জিনিস, সেটা সন্দেহ করবার কোনও অবকাশ নেই ফিলবির।

'প্লিজ, বসুন।' চেয়ার দেখিয়ে দিলেন ফিলবি। নিজেও আসন গ্রহণ করলেন।

মুখোমুখি বসে কোডেক্সের সংক্ষিপ্তসার ডক্টরকে শোনাল মুরল্যাণ্ড। হেরাক্লিসের আসন আর আফ্রোদিতির পায়ের ব্যাপারটার উপর জোর দিল একটু। বলল, এক কালেক্টরের কাছ থেকে পাওয়া গেছে পাণ্ডুলিপিটা; তিনি ধাঁধাটার জবাব জানতে চান। এরপর ফিলবিকে কোডেক্সের ধাঁধার অংশটার অনুবাদ পড়তে দিল ও।

প্রিন্ট করা কাগজগুলো কয়েক দফা পড়লেন ফিলবি। তাঁর চেহারায় উত্তেজনার ছাপ ফুটল। শেষ পর্যন্ত মুখ তুলে তিনি বললেন, 'ইটস্ রিমার্কেবল!'

'ধাঁধার অর্থ বের করতে পারবেন আপনি?' সাগ্রহে জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'হয়তো। কিন্তু তার আগে এলজিন মার্বলসের কয়েকটা অংশ আবার দেখে নিতে হবে আমাকে। ওখান থেকেই নিতে হবে রেফারেন্স।'

'এখুনি দেখা যায় না?'

'নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু হাতের কাজটা শেষ না করে নড়তে পারব না আমি। বেশি সময় লাগবে না অবশ্য। এক কাজ করুন না কেন, আপনি চলে যান ওখানে। যে-পথ ধরে এখানে এসেছেন, সে-পথে ফিরলেই ডুভিন গ্যালারির সাইনবোর্ড দেখতে পাবেন। আমি একটু পরেই আসছি।'

'ঠিক আছে। তা-ই করি।'

ফিলবির অফিস কামরা থেকে বেরিয়ে এল মুরল্যাণ্ড। দ্রুত পায়ে হেঁটে চলল ডুভিন গ্যালারির উদ্দেশে। ওখানে কী পাওয়া

যাবে কে জানে! উত্তেজনা অনুভব করছে ও। আত্মভোলা আর্কিয়োলজিস্ট এখন দেরি না করলেই হয়।

মুরল্যাণ্ড বেরিয়ে যাবার পর কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইলেন ফিলবি। ওকে সময় দিলেন অফিস থেকে দূরে চলে যাবার। এরপর পকেট থেকে সেলফোন বের করলেন তিনি, চাইছেন না কলটা মিউজিয়ামের সুইচবোর্ড হয়ে যাক। সেটের ফোনবুকে নাম নেই, আছে স্রেফ এটা নাম্বার... ওটা সিলেক্ট করে ডায়াল প্রেস করলেন। বেশ ক'দিন আগেই এই নাম্বারটা পেয়েছেন তিনি; তাঁকে বলা হয়েছে—পার্থেনন সংক্রান্ত প্রাচীন কোনও ডকুমেন্টের সন্ধান পেলেই এই নাম্বারে জানাতে হবে। তা হলে মিলবে মোটা পুরস্কার।

ববি মুরল্যাণ্ডের জানা নেই, ওর সাহায্যের আবেদন ড. ফিলবির টেবিলে এমনি এমনি আসেনি। তিনি নিজেই জুনিয়র এক আর্কিয়োলজিস্টের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছেন কাজটা। প্রাচীন গ্রিক ম্যানুস্ক্রিপ্টের ব্যাপারে জনৈক আমেরিকান যোগাযোগ করেছে শুনেই হামলে পড়েছিলেন তিনি।

দু'বার রিং হতেই ওপাশ থেকে রিসিভ করা হলো কল। 'কী খবর, ডক্টর?'

গলা কাঁপছে ফিলবির। উত্তেজিত ভঙ্গিতে বললেন, 'সুসংবাদ! আপনি যা খুঁজছেন, সেটার খোঁজ সম্ভবত পেয়ে গেছি আমি!'

তেইশ

ম্যানশনের স্টাডিতে অপেক্ষা করছে রানা ও রেমি। কামরাটার অবস্থান বাড়ির একেবারে পিছনদিকে। আকারে বড়-সড়, দেয়াল কাঠের প্যানেলে ঢাকা। বুকশেলফে শোভা পাচ্ছে হাজার হাজার বই, এ ছাড়া দেয়ালে ঝুলছে দুর্লভ বেশ কিছু পেইন্টিং। একপাশে চওড়া জানালা, সেখান দিয়ে বাড়ির পিছনের বিশাল আস্তাবল এবং আস্তাবলের পিছনের অবারিত সবুজ মাঠ চোখে পড়ছে। মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। পরিবেশটাও চমৎকার। স্টাডির ফায়ারপ্লেসে গনগন করে জ্বলছে আগুন, ছড়িয়ে দিচ্ছে আরামদায়ক উত্তাপ। তবু স্বস্তিতে নেই রানা। বিপদের আশঙ্কা করছে প্রতি মুহূর্তে। বুদ্ধিমানের কাজ হতো, যদি একটা অজুহাত দেখিয়ে এস্টেট থেকে বেরিয়ে পড়তে পারত। কিন্তু আর্কিমিডিসের ধাঁধা সমাধানের জন্য মোমফলকটা না দেখলেই নয়। অগত্যা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করে থাকতে হচ্ছে এখানে।

ঘোড়া আস্তাবলে রেখে পোশাক বদলে আসবে বলে চলে গেছে মায়া। রোদে পোড়া, পেশিবহুল শরীরের এক লোক রানা আর রেমিকে নিয়ে এসেছে স্টাডিতে। বলা হয়েছে সে মায়ার অ্যাসিসটেন্ট; কিন্তু অভিজ্ঞ চোখে রানা বুঝতে পেরেছে, লোকটা মাস্‌ল্‌ম্যান ছাড়া আর কিছু না। বড়জোর বডিগার্ড হতে পারে, কিংবা সিকিউরিটির লোক—উটকো ঝামেলা সামলাবার জন্য একে চাকরিতে রেখেছে মায়া। সম্ভবত খালিহাতে মানুষের

হাড়গোড় গুঁড়ো করতে পারে বলেই।

কপালের ভাঁজ গভীর হয়েছে রানার। এ-ধরনের লোককে কোনও ভাল মানুষ কাজে লাগায় না। কে এই মায়া লরেঞ্জো? মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছে—ভালমত খোঁজখবর নিয়ে আসা উচিত ছিল। আর কিছু না হোক, মায়া লরেঞ্জো যে ভিএক্সএন ইণ্ডাস্ট্রিজের মালিক, সেটা জানতে পারত। আরেকটু সতর্ক হতে পারত সেক্ষেত্রে।

স্টাডির দরজার দিকে চোখ চলে গেল ওর। পাল্লা ভেজিয়ে রাখা হয়েছে; তবে সন্দেহ নেই বাইরে পাহারা দিচ্ছে মায়ার মাস্‌ল্‌ম্যান। আড়িও পাতা হতে পারে।

রানার দিকে একটু ঝুঁকল রেমি। ফিসফিসিয়ে বলল, 'কী মনে হয় তোমার, রানা? গ্যারেট কি জানে, ওয়্যাক্স ট্যাবলেটটা ওর বান্ধবী মায়ার দখলে?'

'জানা তো উচিত,' বলল রানা। 'এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লু স্রেফ কো-ইনসিডেন্সের বশে ওর হাতে আসতে পারে না। বিশেষ করে ওরা দু'জন যখন একই জিনিস খুঁজছে।'

'জানা থাকলে বলল না কেন?'

'কী জানি! ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করেছে বলে তো মনে হয় না। হয়তো ট্যাবলেটটার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি গ্যারেট। ওটা যে ধাঁধা সমাধানের দ্বিতীয় সূত্র... এটাই বোধহয় ধরতে পারেনি।'

'কিন্তু এখন আমরা কী করব? মায়া যদি বুঝে ফেলে, আমরা কেন এসেছি এখানে?'

'আপাতত অভিনয় চালিয়ে যাওয়া যাক। দেখি, ওকে বোকা বানিয়ে কাজ উদ্ধার করা যায় কি না। ট্যাবলেটটা দেখেই কেটে পড়ব এখান থেকে।'

'আর ও যদি সব বুঝে ফেলে?'

'বিপদ!' থমথমে গলায় বলল রানা।

গ্যারেটের সতর্কবাণী মনে পড়ে যাচ্ছে ওর। মায়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর মেয়ে... স্বার্থ হাসিলের জন্য খুনখারাপি করে ফেলতে পারে। সামনাসামনি দেখা হবার পর কথাটা বিশ্বাস করছে ও। মেয়েটাকে একেবারেই ভাল লাগেনি ওর। মানুষকে পড়তে জানে রানা, তাই বুঝতে পেরেছে, মায়ার ভদ্রতার মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে আছে নিষ্ঠুর এক সত্তা। হাসতে হাসতে কঠোর নির্যাতন করতে পারে এই মেয়ে।

দরজা খোলার আওয়াজে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে মায়াকে স্টাডিতে ঢুকতে দেখল ওরা। রাইডিং ড্রেসের বদলে গায়ে এখন ধূসর রঙের প্যান্টসুট—ওর দেহসৌষ্ঠবের সঙ্গে মানানসই ভাবে তৈরি করা। স্নিগ্ধ-সতেজ দেখাচ্ছে তাকে—সম্ভবত গোসল করে এসেছে। ভেজা চুল ছড়িয়ে দিয়েছে কাঁধের উপর, তার মাঝে হালকা মেকাপে ঢাকা সুন্দর মুখটা ঝলমল করছে। সব মিলিয়ে অত্যন্ত আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে তাকে। রূপ তো বটেই... ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও।

স্টাডির একপ্রান্তে নিজের ডেস্কে গিয়ে বসল মায়া। ভদ্রতা দেখাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল রানা আর রেমি; ওদেরকে বসবার ইশারা করল।

'সরি, বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো আপনাদের,' বিনয় প্রকাশ করল সে। রানার উপর আটকে আছে তার চোখ। রেমিকে যেন দেখেও দেখছে না। 'চা-নাশতা কিছু খেয়েছেন?'

'কফি দিয়েছিল... ওটাই যথেষ্ট,' বলল রানা। 'ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন বলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ও কিছু না। আমার অ্যাসিসটেন্ট বলল, আপনারা একটা প্রাচীন মোমফলক দেখতে চাইছেন... যেটা আমি ছ'মাস আগে লণ্ডনের এক নিলাম থেকে কিনেছি। কিছু মনে করবেন না, ওটার

ব্যাপারে আপনাদের আগ্রহ কীজন্য, জানতে পারি?'

রানা জবাব দেবার আগেই গলা খাঁকারি দিল রেমি। সিলেব্রিটি ও—কারও উপেক্ষা পেতে অভ্যস্ত নয়। ওর প্রতি মায়ার নিরাসক্তি দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বলল, 'মাফ করবেন, আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারেননি। আমি ড. রেমি হ্যাডলি। টিভিতে *চেজিং দ্য পাস্ট* নামে একটা অনুষ্ঠান করি আমি—আর্কিয়োলজিকাল এবং হিস্টোরিকাল বিভিন্ন ইণ্টারেস্টিং বিষয়ের উপর। সামনের একটা এপিসোডে আপনার ওই ওয়্যাক্স ট্যাবলেট নিয়ে একটা সেগমেণ্ট করব বলে ভাবছি। আপনার একটা সাক্ষাৎকারও থাকবে ওতে।'

টোপটা মন্দ নয়, মনে মনে ভাবল রানা। টিভিতে চেহারা দেখাতে কে না চায়! এ এক দুর্নিবার মোহ।

মায়ার মধ্যে অবশ্য সেই মোহ প্রকাশ পেল না। চেহারা রুক্ষ হয়ে উঠল তার। চাঁছাছোলা গলায় বলল, 'আপনার বিষয়ে আমার জানা আছে, ড. হ্যাডলি। বেশ বিখ্যাত মানুষ আপনি।' রানার দিকে তাকাল। 'আর আপনি, মি. রানা? *চেজিং দ্য পাস্ট*-এর আপনার কী সম্পর্ক?'

'আমি স্রেফ একজন উপদেষ্টা, আর কিছু না,' বলল রানা।

'ট্যাবলেটের ব্যাপারে আপনাদের আগ্রহটা এখনও কিন্তু পরিষ্কার হলো না, ড. হ্যাডলি।'

'আমাদের ধারণা, আপনার ওই ট্যাবলেট গ্রিক ইতিহাসের একটা বিশেষ সময়ের উপর আলোকপাত করতে পারবে,' বলল রেমি। 'সেকেণ্ড পিউনিক ওয়ারের কথা বলছি আমি। খ্রিস্টপূর্ব দুই শ' আঠারো থেকে দুই শ' এক সাল পর্যন্ত চলেছিল ওই যুদ্ধ—রোমান রিপাবলিক এবং কার্থেজের মধ্যে। ট্যাবলেটটা ওই সময়কার।'

'হুম। আপনি তা হলে আর্কিয়োলজিস্ট?'

'জী না। আমি একজন ক্লাসিসিস্ট—গ্রিক সভ্যতার উপর স্পেশালাইযেশন আছে আমার। ডিউক ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করেছি।'

'ইম্প্রেসিভ,' মন্তব্য করল মায়া। 'মোমফলকটার ভিডিও করতে চান আপনারা?'

'আজ নয়,' বলল রেমি। 'আজ আমরা এসেছি প্রাথমিক ইন্সপেকশনের জন্য। যাতে শিয়োর হতে পারি... যেটা খুঁজছি, আপনার ট্যাবলেট সেটাই কি না। আপাতত এক নজর দেখতে পেলেই খুশি হব।'

'তাতে কোনও সমস্যা দেখছি না। ওটা এখানেই আছে।'

টেবিলের তলার একটা গোপন বোতাম চাপল মায়া। মৃদু আওয়াজ তুলে ফাঁক হয়ে গেল ডানদিকের দেয়ালে কাঠের প্যানেলের একাংশ। কাঁচের একটা ডিসপ্লে কেইস উন্মুক্ত হয়ে পড়ল তাতে। কেইসের ভিতরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে কিছু আর্টিফ্যাক্ট—দুটো প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, ব্রোঞ্জের তৈরি একটা খাটো তলোয়ার, ছোট ছোট কয়েকটা মূর্তি... এবং একটা মোমফলক। ফলকটা বেশি বড় নয়—পাশাপাশি রাখা দুটো হার্ডকাভার বইয়ের সমান।

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল রেমি। মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেল ডিসপ্লে-র দিকে। রানা অনুসরণ করল ওকে। মায়াও চেয়ার ছাড়ল। রানার পাশে এসে হাত ধরল সে। ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল রানা। জবাবে মদির হাসি হাসল মেয়েটা, চোখ টিপল। চক্ষুলজ্জার ধার ধারছে না, সরাসরি বুঝিয়ে দিচ্ছে—রানাকে ওর মনে ধরেছে।

যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে হাত ছাড়িয়ে নিল রানা। তাকাল ট্যাবলেটের দিকে। কাঠের ফ্রেমে বাঁধাই করা দু'টো মোমের ব্লক, কালের প্রবাহে সবুজাভ হয়ে এসেছে। মাঝখানে চৌকো খাঁজ,

ওর ভিতরে রাখা হতো কোডেক্স। ফ্রেমদুটো আবার কবজা দিয়ে আটকানো, যাতে বাক্সের মত বন্ধ করে রাখা যায় ফলকের দুই অংশ। একেবারে ঝকঝক করছে জিনিসটা, মনেই হচ্ছে না দু'হাজার বছরের পুরনো। আরেকটু এগিয়ে ভালমত দেখল ও। মোমের মাঝে স্পষ্টভাবে খোদাই করা আছে গ্রিক হরফের সারি। উত্তেজনায় দম আটকে এল ওর। স্বয়ং আর্কিমিডিসের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে আছে ও।

রেমিও মুগ্ধ, তবে অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে ফলকটা নিরীখ করছে সে। রানা জানতে চাইল, 'লেখাটা পড়তে পারছ?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রেমি। 'এখানে বলা হচ্ছে: *সত্যকে যে বরণ করে নেবে, সে-ই পাবে অতুল ঐশ্বর্য। বাইরে নয়, তার জন্য নিজের ভিতরে অনুসন্ধান করো। আকাশ, তারা, চন্দ্র, সূর্য আর গ্রহ-নক্ষত্র... সব তোমার হবে। পার্থেননে লুকিয়ে আছে তার চাবিকাঠি।*'

হাততালি দিয়ে উঠল মায়া। 'চমৎকার, ড. হ্যাডলি। আমার এক্সপার্টও ঠিক একই অনুবাদ করেছে। তবে ওর সময় লেগেছে অনেক বেশি। এনিওয়ে... এখানে কীসের কথা বলা হয়েছে, সে-ব্যাপারে কোনও ধারণা করতে পারেন?'

রানার সঙ্গে চকিতে দৃষ্টি-বিনিময় করল রেমি। তারপর বলল, 'না, দুঃখিত। হেঁয়ালির মত লাগছে আমার কাছে। অবশ্য তাতে ক্ষতি নেই। আমার দর্শকরা পুরনো আমলের অমীমাংসিত রহস্যই দেখতে চায়।'

কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল মায়া। তারপর ফিরে গেল ডেস্কে। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল, 'প্লিজ, ড. হ্যাডলি... আমার সঙ্গে নাটক করবার কোনও প্রয়োজন নেই। সবই জানি আমি। আমার সামনে এসে বসো। কিছু কথা বলব। কথাগুলো শোনার প্রয়োজন আছে

তোমাদের।'

মুহূর্তের ভিতর চেহারা পাল্টে গেছে মেয়েটার। সম্বোধন পাল্টে গেছে... ভদ্রতার খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে বিষাক্ত এক কালনাগিনী। মাথার ভিতর পাগলাঘণ্টি বেজে উঠল রানার—যা ভয় করছিল, তাই ঘটতে চলেছে। বিপদ! রেমির দিকে তাকাল। তরুণী ডক্টরের মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। কিন্তু কিছু করার নেই। আপাতত মায়ার কথা মেনে নেয়াই ভাল। মেয়েটার মুখোমুখি আবার আসন নিল ওরা।

'আমার ধারণা, প্রাচীন একটা পাণ্ডুলিপি দেখে এসেছ তোমরা,' বলল মায়া। 'ওই পাণ্ডুলিপিতে রাজা মাইডাসের গুপ্তধন খুঁজে পাবার সূত্র আছে। রাইট?'

'এমন অদ্ভুত ধারণা তোমার মাথায় এল কেন?' শান্ত গলায় জানতে চাইল রানা। মায়া যেহেতু ভদ্রতা দেখাচ্ছে না, ও-ও তা দেখাবার প্রয়োজন বোধ করছে না।

'কারণ আমার অ্যাসিসটেন্টের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাইবার সময় আর্কিমিডিসের নাম উচ্চারণ করেছে ড. হ্যাডলি। আমার ট্যাবলেট আর আর্কিমিডিসকে একত্র করলে হারানো ওই কোডেক্স ছাড়া আর কোনও কিছুর কথা ভাবা যায় না।'

'আমার তো মনে হয় স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলছ তুমি।'

'মোটেই না।' বড় করে শ্বাস নিল মায়া। 'এগারো বছর বয়সে একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় আমার... সে ছিল আমার খালাতো ভাই। বেড়াতে এসেছিল আমাদের নেপলসের বাড়িতে। দু'জনে খুব ঘোরাঘুরি করতে পছন্দ করতাম। তা-ই করতে গিয়ে একদিন এক পরিত্যক্ত অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের ভাঁড়ার ঘরে পুরনো এক গুপ্তপথ খুঁজে পাই আমরা... ওটা ধরে পৌঁছে যাই মাটির তলার প্রাচীন এক টানেল নেটওয়ার্কে। ওখানে দু'জন

ড্রাগ-ডিলারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আমাদের—লোকদুটো মাটির তলায় তাদের অবৈধ মালের গুদাম বানিয়েছিল। যা হোক, আমাদেরকে ধাওয়া করে ওরা। আমরাও পালাবার জন্য ছুট লাগাই। মাটির নীচের ওই অন্ধকার সুড়ঙ্গে দিক ঠিক রাখা কঠিন, ফলে খুব শীঘ্রি পথ হারাই আমরা। এলোমেলোভাবে ছুটতে ছুটতে শেষ পর্যন্ত বিশাল একটা গুহায় পৌঁছে যাই...'

নড়েচড়ে বসল রানা। এই কাহিনি গ্যারেটের মুখে শুনেছে ওরা, তবে মায়া বলছে অনেক বেশি বিস্তারিতভাবে। কৌতূহল জেগে উঠেছে ওর।

'গুহায় ঢোকার পর চমকে উঠি আমরা,' বলে চলল মায়া। 'কারণ ওটা আসলে ঠিক গুহা নয়, নিখুঁত কিউবের আকারে বানানো একটা চেম্বার। আরও বেশি অবাক করা ব্যাপার হলো, চেম্বারের পুরোটাই ছিল সোনায় গড়া। বাড়িয়ে বলছি না, ওখানকার দেয়াল আর ভিতরের সবকিছুই ছিল সোনা দিয়ে তৈরি।'

'কী ছিল ওখানে?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'চেম্বারের ঠিক মাঝখানে ছ'ফুট উঁচু একটা পেডেস্টালের উপর দাঁড়ানো ছিল নিখুঁত একটি নারীমূর্তি... ডান হাতটা কব্জি থেকে কাটা ছিল ওটার। চেম্বারের এক কোনায় ছিল একটা হট পুল—পানি টগবগ করছিল সারাক্ষণ। বাষ্পে ভরে ছিল চেম্বারের অভ্যন্তর। এ ছাড়া কামরার আরেক প্রান্তে... মঞ্চের উপর রাখা ছিল একটা সোনালি কফিন—রাজা মাইডাসের!'

'মাইডাস?' জিজ্ঞেস করল রেমি। 'কী করে বুঝলেন?'

'বলছি। একটু ধৈর্য ধরো।' চেয়ারে হেলান দিল মায়া। 'একটা সিঁড়ি ধরে নামতে হয় ওই চেম্বারে, ওটার তলায় লুকিয়েছিলাম আমরা। একটু পরেই আমাদের পিছু পিছু ওখানে হাজির হলো দুই ড্রাগ ডিলার। ভয়ে আত্মারাম শুকিয়ে গিয়েছিল

আমাদের, জানতাম ধরা পড়ে যাব। পালাবার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু চেম্বারে ঢুকে থ হয়ে গেল লোকদুটো। সোনা দেখে মাথা খারাপের মত অবস্থা। আমাদের কথা যেন ভুলেই গেল। তার বদলে আলোচনা শুরু করল দু'জনে—সোনা কীভাবে উদ্ধার করবে... কীভাবে সেই সোনা তাদের বসের অলক্ষে বিক্রি করবে... এইসব আর কী। খানিক পর একজন যখন পিঠ ফেরাল, অন্যজন হাতের শাবলের বাড়ি মেরে ফাটিয়ে দিল তার মাথা—খুন করে ফেলল! চেম্বারের সব সোনা একাই ভোগ করতে চাইছিল সে। সঙ্গীকে খুন করে মঞ্চে গিয়ে উঠল লোকটা। কফিনের ডালা ফাঁকা করে ভিতরে হাত ঢোকাল, বোধহয় ভাবছিল সোনার মোহর-টোহর পাবে। কিন্তু তার বদলে যা ঘটল, সেটা অবিশ্বাস্য! হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সে। ঝটকা দিয়ে বের করে আনল হাত। দেখলাম টকটকে লাল হয়ে গেছে চামড়া, অসহ্য ব্যথায় কাতরাচ্ছে লোকটা। পিছাতে গিয়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল গরম পানি ভরা পুলের ভিতর। ক্ষণিকের জন্য ডুবে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর যখন হাঁচড়ে-পাঁচড়ে ভেসে উঠল, চমকে গেলাম আমরা। দুই হাত সোনায় পরিণত হয়েছে তার। আমাদের চোখের সামনে আস্তে আস্তে গলাও সোনা হয়ে যেতে দেখলাম। একটু পর পানিতে ডুবে গেল সে।'

'নিজ চোখে রক্তমাংসের একজন মানুষকে সোনার মূর্তি হয়ে যেতে দেখেছেন আপনারা?' হতভম্ব গলায় বলল রেমি। 'এ কীভাবে সম্ভব?'

'একটাই ব্যাখ্যা হতে পারে এর,' বলল মায়া। 'মাইডাস টাচের শিকার হয়েছিল লোকটা। কফিনটা কেন রাজা মাইডাসের বলে ভাবছি, তা আশা করি বুঝতে পারছ এবার?'

শব্দ করে শ্বাস ফেলল রানা। এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিল মায়ার কাহিনি। তবে ওটাকে কাহিনি ছাড়া আর কিছু ভাবতে

পারছে না। যে-অভিজ্ঞতার কথা বলছে মেয়েটা, তা সত্যি হতে পারে না। ভয়ার্ত দুটি কিশোর-কিশোরী উত্তেজনার বশে ভুলভাল দেখেছে—এমনটা হবারই সম্ভাবনা বেশি।

'ইন্টারেস্টিং গল্প,' মন্তব্য করল ও। 'তোমরা পরে আবার ওখানে ফিরে যাওনি কেন?'

'বিশ্বাস করো, সেদিনের পর থেকে আমি ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি,' বলল মায়া। 'টানেল থেকে বহু কষ্টে বেরিয়ে আসি আমরা। সঠিক পথটা খুঁজে পেতে সেদিনের পুরো রাত লেগে যায়। বাড়ি ফেরার পর যখন বাবা-মা'কে গোল্ডেন চেম্বারের কথা বলি, বিশ্বাস করেননি ওঁরা। রাতভর বাইরে থাকায় ভীষণ খেপে গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন শাস্তি এড়াবার জন্য মিথ্যে গল্প ফেঁদে বসেছি। এর কিছুদিন পরেই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সটা ভেঙে ফেলা হয়, সেই জায়গায় তোলা হয় ইটালির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটা নতুন বিল্ডিং। কনস্ট্রাকশন শেষ হবার পর একবার আমি ওটার বেজমেন্টে ঢুকেছিলাম। দেখলাম, ফাউণ্ডেশনের কংক্রিটের কারণে টানেলে যাওয়ার গুপ্তপথটা বন্ধ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কোনও রাস্তা ছিল না ওখানে ঢোকার।'

'হুম,' মাথা দোলাল রানা। 'গল্প তো ভালই শোনালে, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ওটার একবর্ণও বিশ্বাস হয়নি আমার।'

'মিথ্যে কথা!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল মায়া। 'বিশ্বাস যদি না-ই করবে, তা হলে মাইডাসের সমাধি খুঁজে বের করতে চাইছ কেন? কত টাকা পাচ্ছ এর জন্যে?'

'টাকা? কার কাছ থেকে?'

'সেটাও বলে দিতে হবে? সেই লোক, যে আমার কাছ থেকে কোডেক্সটা চুরি করেছে!'

'কোডেক্সটা তোমার?'

'অবশ্যই! সোনার হাতটাও... যেটা মাইডাসের সমাধি থেকে

খোয়া গিয়েছিল। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আমিই খোঁজ বের করেছিলাম ওগুলোর। ভেবেছিলাম অকশন হবার আগেই কবজা করে নেব... যাতে জিনিসদুটোর গুরুত্ব আর কেউ জানতে না পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাকে ধোঁকা দিয়ে ওগুলো হাতিয়ে নিয়েছে তোমাদের নিয়োগকর্তা। গত ছ'মাসে বহু খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনও সন্ধান পাইনি আমি। ভেবেছিলাম মারা গেছে সে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, লোকটা বহাল তবিয়তেই তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।'

চেহারায় কপট বিস্ময় ফোটাল রানা। 'কী সব কোডেক্স আর সোনার হাতের কথা বলছ... আমরা কিন্তু এ-সবের কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমার সঙ্গে অভিনয় কোরো না, রানা!' হিসিয়ে উঠল মায়া। 'তার ফল ভাল হবে না। আমি খুব ভাল করেই জানি, হারানো জিনিসদুটোর খোঁজ তোমাদের কাছে আছে।'

'এ তোমার কল্পনা।'

'তা-ই?' মুখ বাঁকা করল মায়া। 'খানিক আগে একটা ফোন পেয়েছি আমি। জনৈক ভদ্রলোক ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গেছেন প্রাচীন একটা গ্রিক কোডেক্স... যেটার সঙ্গে পার্থেননের সম্পর্ক আছে... সেটার ব্যাপারে ওখানকার এক্সপার্টের সঙ্গে পরামর্শ করতে। ওই ভদ্রলোক নিজেকে ড. রেমি হ্যাডলির অনুষ্ঠানের কনসালট্যান্ট হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। বলতে চাও ওকে তোমরা চেনো না?'

পেটের ভিতরটা শূন্য মনে হলো রানার, ওখানে যেন প্রজাপতি উড়ছে। মুরল্যাণ্ডের কথা বলছে মায়া!

ওদেরকে বাগে পাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল মেয়েটা। বলল, 'হারানো কোডেক্সের কপি তোমাদের হাতে রয়েছে; এর অর্থ একটাই—যে-লোক ওটা চুরি করেছে, তার হয়ে কাজ করছ

তোমরা। ওর নামটাও বলে দিতে পারি। অ্যান্থনি গ্যারেট, তাই না? আমার খালাতো ভাই... বড় হয়ে মস্ত বড় ক্রিমিনালে পরিণত হয়েছে ও। ও-ই ধোঁকা দিয়েছে আমাকে... আর এর জন্য যথোপযুক্ত শাস্তিও পাবে। ওকে খুন করব আমি!'

চব্বিশ

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ডুভিন গ্যালারিতে পায়চারি করছে মুরল্যাণ্ড। বিশাল এই গ্যালারি স্থাপন করা হয়েছে শুধুই এলজিন মার্বলসের ডিসপ্লের জন্য। লম্বা হলঘরটার দু'পাশের দেয়াল ঘেঁষে একসারিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্রস্তরখণ্ডগুলো। সঠিক টার্ম হলো *মেটোপি*, তবে বাস্তবে ওগুলো এক ধরনের নকশাদার টালি—পার্থেননের বাইরের রিং-টার ডগায় লাগানো ছিল ডেকোরেশন পিস হিসেবে। ডিসপ্লে-তে রাখা বেশিরভাগ টালিই ক্ষত-বিক্ষত—১৬৮৭ সালে পার্থেননে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণে নষ্ট হয়েছে। বয়সের ভারে ভেঙে-চুরে গেছে, কিংবা তুলে আনার সময় ড্যামেজ হয়েছে... এমন টালির সংখ্যাও কম নয়।

গ্যালারির দু'প্রান্তে রাখা হয়েছে পার্থেনন থেকে উদ্ধার করা বেশ কিছু লাইফ-সাইজ পাথুরে মূর্তি। ওখানকার পেডিমেণ্ট, অর্থাৎ ছাতের তেকোনা প্রান্তদেশে বসানো ছিল মূর্তিগুলো। তবে *মেটোপি*-র মত এগুলোও অক্ষত নয়। বেশিরভাগ মূর্তিরই মাথা আর হাত নেই... কবে-কীভাবে ভেঙে গেছে কেউ জানে না...

মুণ্ডুহীন ভূতের অবয়ব পেয়েছে ওগুলো। গ্যালারির আবছায়া পরিবেশে ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করেছে এইসব প্রাচীন মূর্তি।

'ম্যাগনিফিশেণ্ট! কী বলেন?'

কানের কাছে ড. ফিলবির কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল মুরল্যাণ্ড। একদল টুরিস্টের পিছু পিছু গ্যালারিতে ঢুকেছেন তিনি, ও দেখতে পায়নি।

'তা তো বটেই,' চমক সামলে নিরাসক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। সত্যি বলতে কী, ভাঙাচোরা মূর্তিগুলো মোটেই মুগ্ধ করেনি ওকে। কীসের যেন অভাব অনুভব করেছে। 'ক্যাপশনে দেখলাম পার্থেননে বিস্ফোরণের কথা লেখা আছে। কী ঘটেছিল?'

'আর্কিয়োলজিকাল দিক থেকে চিন্তা করলে—ওটা বিশাল এক ট্র্যাজেডি,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ফিলবি। 'নির্মাণ হবার পর... প্রথম দু'হাজার বছরে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় পার্থেনন, কারণ শাসনকালের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওটাকে চার্চ আর মসজিদে রূপান্তর করা হয়েছিল। তারপরেও মৌলিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন ছিল ওটার—অ্যাথেনার মন্দির হিসেবে তখনও চেনা যেত ওটাকে। কিন্তু ১৬৮৭ সালে ঘটল ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ওটোম্যান তুর্কিরা দখল করে নিল অ্যাথেন্স, যুদ্ধ বাধাল ভেনিসের সঙ্গে। কী কারণে জানি না, অ্যাক্রোপোলিসে গান-পাউডার ম্যাগাজিন স্থাপন করে ওরা। ভেনিশিয়ানরা হামলা চালায় ওখানে। দূর থেকে ছুঁড়তে থাকে একের পর এক মর্টার শেল... শেষ পর্যন্ত সেগুলোর একটা আঘাত হানে তুর্কিদের অ্যামিউনিশনের গুদামে। ব্যস... ভয়াবহ এক বিস্ফোরণ ঘটল। গুদাম-টুদাম তো গেলই, সেইসঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল পার্থেননের বেশিরভাগ স্তম্ভ ও ভাস্কর্য।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মুরল্যাণ্ড। নেভিতে কাজ করবার সুবাদে বিস্ফোরক সম্পর্কে ভাল জ্ঞান আছে ওর। জানে, সুরক্ষিত জায়গায় অ্যামিউনিশন না রাখা হলে সেটা কত বড়

বিপদের কারণ হতে পারে। দুর্ঘটনা-জনিত বিস্ফোরণের কাহিনিও জানা আছে ওর। নিউক্লিয়ার বোমার কথা বাদ দিলে মানব-ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ ঘটেছিল কানাডার হ্যালিফ্যাক্স হারবারে—১৯১৭ সালে। দুটো জাহাজের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছিল, যার একটার হোল্ডে ছিল প্রায় তিন কিলোটন টিএনটি। ভয়াবহ সেই বিস্ফোরণে জাহাজের আরোহী ছাড়াও বন্দরের দু'পাশে বসবাসকারী প্রায় দু'হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল, ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল পুরো এলাকা। পার্থেননেও নিশ্চয়ই তেমনই কিছু ঘটেছিল। ভাঙাচোরা আর্টিফ্যাক্টগুলোর দিকে তাকাল ও। এগুলো যে সেই তাণ্ডবের পরও টিকে আছে, সেটাই আশ্চর্য!

'দুঃখজনক,' মন্তব্য করল মুরল্যাণ্ড।

'হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন।' সায় দিলেন ফিলবি।

'এগুলোই কি শুধু উদ্ধার করা গেছে পার্থেনন থেকে?' ডিসপ্লে-র দিকে ইশারা করল মুরল্যাণ্ড।

'উঁহুঁ। লর্ড এলজিন মাত্র অর্ধেক ভাস্কর্য আনতে পেরেছিলেন। বাকিগুলো এখন রয়েছে অ্যাথেন্সের নিউ অ্যাক্রোপোলিস মিউজিয়ামে। অবশ্য ওরা সবগুলোই ওখানে রাখতে চাইছে, কিন্তু আমরা রাজি হচ্ছি না। চিঠি চালাচালি চলছে সরকারি পর্যায়ে। দেখা যাক কতদিন ঠেকানো যায় ওদেরকে।'

'আপনাদের জিনিস ওরা চাইছে কেন? ব্রিটিশ মিউজিয়াম নিশ্চয়ই অবৈধ উপায়ে আর্টিফ্যাক্টগুলো নিয়ে আসেনি?'

'লর্ড এলজিনের কাছ থেকে এগুলো পেয়েছি আমরা। কিন্তু গ্রিকদের দাবি, তুর্কিরা অন্যায়ভাবে ওগুলো বিক্রি করেছিল তাঁর কাছে। বক্তব্যটা একেবারে অন্যায্য নয়। তা ছাড়া আরেক দেশের জাতীয় সম্পদ আমরা জোর করে রেখে দিতে পারি না। তারপরেও এতদিন আমরা বলে আসছিলাম, ভাস্কর্যগুলো ওখানে পাঠানো হলে নষ্ট হবে... এখানেই বরং বেশি নিরাপদে আছে

ওগুলো; তবে সম্প্রতি নতুন একটা উইং খাড়া করেছে নিউ অ্যাক্রোপোলিস মিউজিয়াম, ভাস্কর্য সংরক্ষণের অত্যাধুনিক সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে ওতে। কাজেই গ্রিকরা কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছে সব ফেরত পাবার জন্য।'

'আপনার কী মনে হয়? ফেরত পাঠানো কি উচিত?'

'সন্দেহ নেই, মুভমেণ্টে যথেষ্ট ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে... তবে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না। এসব সরকারি সিদ্ধান্তের ব্যাপার, আমার মাথা না ঘামালেও চলে।'

'হুম!' প্রসঙ্গ বদলাল মুরল্যাণ্ড। 'মার্বলসের যে-অংশটা আমাদের দরকার, সেটা কি আছে এই গ্যালারিতে?'

'আমার ধারণা, আছে। হেরাক্লিসের আসন আর আফ্রোদিতির পায়ের কথা বলা হয়েছে পাণ্ডুলিপিতে, তাই না? হেরাক্লিসের আরেক নাম হারকিউলিস, তা জানেন তো?'

'এখন জানলাম,' বিব্রত কণ্ঠে বলল মুরল্যাণ্ড। গ্রিক পুরাণের বিষয়ে ওর জ্ঞান খুবই কম।

এলিয়ে বসে থাকা একটা নগ্ন পুরুষ-মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করলেন ফিলবি। মাথা আস্ত আছে, তবে হাত নেই মূর্তিটার। গায়ের তলায় জড়ো হয়ে আছে আলখাল্লা। জিজ্ঞেস করলেন, 'থাবাটা দেখতে পাচ্ছেন?'

চোখ পিট পিট করল মুরল্যাণ্ড। আলখাল্লার ভাঁজের মাঝ থেকে বেরিয়ে আছে একটা বেড়াল জাতীয় প্রাণীর থাবা।

'আমাদের বিশ্বাস, ওটা সিংহের থাবা,' বললেন ফিলবি। 'তারমানে এটা হারকিউলিসের মূর্তি। পুরাণে আছে, নিমিয়ান সিংহকে হত্যা করেছিল সে—শুনে থাকবেন হয়তো। এবার এদিকে আসুন।'

মুরল্যাণ্ডকে ডানদিকে নিয়ে গেলেন তিনি। দুটো নারীমূর্তি দেখা যাচ্ছে ওখানে—স্রেফ ধড়, মাথা ভেঙে গেছে বহুকাল

আগে। একটার গায়ে অন্যটা হেলান দিয়ে বসে আছে।

ফিলবি বললেন, 'এদের পরিচয় সম্পর্কে আজ পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারিনি আমরা। তবে অনেকের ধারণা, এখানে আফ্রোদিতি তার মা ডায়োনের গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমিও সেটা সমর্থন করি।'

...হেরাক্লিসের আসন এবং আফ্রোদিতির পা তোমাকে পথ দেখাবে...

কোডেক্সের হেঁয়ালিটা মনে পড়ে গেল মুরল্যাণ্ডের। তীক্ষ্ণ চোখে মূর্তিগুলোর নীচের দিকে তাকাল ও। মিউজিয়াম ডিসপ্লে-র মার্বেল-বেইসের উপর বসে আছে ওগুলো।

'মূর্তির নীচে অরিজিন্যালি কী ছিল?' জিজ্ঞেস করল ও।

'পেডিমেণ্টের বিম,' বললেন ফিলবি। 'পিলারের উপর সেই বিমের সাহায্যে বসতো গোটা কাঠামো।'

'হুম। তা হলে ধরে নিচ্ছি, হেরাক্লিসের আসন এবং আফ্রোদিতির পা আসলে রেফারেন্স পয়েণ্ট। কিন্তু কীসের?'

'আপনি আসলে কী খুঁজছেন, সেটা আমাকে বললে হয়তো সাহায্য করতে পারব।'

দ্বিধায় ভুগল মুরল্যাণ্ড, মাইডাসের সমাধির কথা বলতে চাইছে না। কিন্তু একেবারে কিছু না বললেও মুশকিল, ভদ্রলোক সন্দিহান হয়ে উঠতে পারেন। ইতস্তত করে ও বলল, 'ইয়ে... আমাদের ধারণা, এগুলো প্রাচীন একটা ম্যাপ খুঁজে বের করবার সূত্র। সম্ভবত পার্থেননের আর্কিটেকচারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ব্যাপারটার।'

'ম্যাপ? ভারি ইণ্টারেস্টিং তো! আপনার তা হলে গোল্ডেন রেক্ট্যাঙ্গলের দিকে নজর দেয়া দরকার।'

'সোনালি আয়তক্ষেত্র?' একটু অবাক হলো মুরল্যাণ্ড। 'সেটা আবার কী?'

'সবচেয়ে নিখুঁত আয়তক্ষেত্র... অন্তত আর্কিটেক্টরা তা-ই মনে করে। পার্থেননের ডিজাইনে আপনি প্রচুর গোল্ডেন রেক্ট্যাঙ্গল দেখতে পাবেন। *পাই* সিম্বল... যেটা গোল্ডেন রেশিও-কে রিপ্রেজেন্ট করছে, সেটার নাম এসেছে পার্থেননের নির্মাতা পাইডিয়াসের নাম থেকে। দাঁড়ান, আপনাকে দেখাচ্ছি।'

পকেট থেকে নোটবুক আর কলম বের করে একটা সরলরেখা আঁকলেন ফিলবি। সেটার মাঝে এমন এক জায়গায় বিন্দু দিলেন, যাতে গোটা রেখাকে তিনভাগ করলে একপাশে দু'ভাগ, আর অন্যপাশে এক ভাগ থাকে। লম্বা অংশটার পাশে লিখলেন *এ*, আর ছোট অংশটার পাশে *বি*।

'গোল্ডেন রেশিও-তে,' বললেন তিনি, '*এ*-কে *বি* দিয়ে ভাগ করলে যে ফল পাওয়া যাবে, তা হবে দুটোর যোগফলকে *এ* দিয়ে ভাগ করবার ফলের সমান।' এবার একটা আয়তক্ষেত্র আঁকলেন তিনি। লম্বা বাহুদুটো আগে আঁকা সরলরেখার সমান, আর ছোট বাহুদুটো শুধু *এ*-র সমান। 'এটাই গোল্ডেন রেক্ট্যাঙ্গল। বাহুগুলো গোল্ডেন রেশিও-র অনুপাতে তৈরি। সে-কারণেই দেখতে খুব ভাল লাগে।'

'পার্থেনন কি এই লে-আউটে বানানো হয়েছিল?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'লে-আউট না। ইমারতের সম্মুখভাগ... বা, ফাসাডগুলো সোনালি আয়তক্ষেত্রের মত। কলামগুলোর মাঝে যে-ফাঁকা জায়গা আছে, সেখানেও একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।'

তথ্যটা কীভাবে ওদের কাজে লাগবে, তা বুঝতে পারছে না মুরল্যাণ্ড। শ্রাগ করে ও বলল, 'ধন্যবাদ, ড. ফিলবি। যথেষ্ট উপকার করলেন আমার।' হাত মেলাল ও। 'পরে কোনও প্রশ্ন জাগলে আপনাকে ফোন করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই!' নিজের সেলফোন নাম্বার দিলেন ফিলবি। 'যখন

খুশি যোগাযোগ করবেন। নির্দ্বিধায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরতে গেল মুরল্যাণ্ড, কিন্তু প্রবীণ আর্কিয়োলজিস্ট ওর হাত ছাড়লেন না। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, মি. মুরল্যাণ্ড, কোডেক্সটা কবে নাগাদ জনসমক্ষে ডিসপ্লে করা হবে, জানতে পারি? গ্রিক ইতিহাস ও সভ্যতার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানা যাবে ওটা থেকে।'

'দুঃখিত, আমি ওটার মালিক নই,' হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল মুরল্যাণ্ড। 'কাজেই বলতে পারছি না ওটা নিয়ে কী করা হবে।'

'উপযুক্ত স্কলারদের ওটা স্টাডি করতে না দেয়া হলে মস্ত বড় অন্যায় করা হবে। এখানে... এই মিউজিয়ামেই ওটা দান করে দিচ্ছেন না কেন আপনারা? আমাদের মত যত্ন আর কেউ করবে না ওটার।'

'আমি নিশ্চিত, শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই ভাল কোনও জায়গায় স্থান পাবে জিনিসটা।'

'ইয়ে... আরেকটা কথা। কোডেক্সটা যদি বিক্রি করতে আগ্রহী হন আপনারা... আমার হাতে একজন ভাল ক্রেতা আছে।'

'কী বলতে চান?'

'না, মানে... বলতে চাইছিলাম যে... যদি ওটা আপনারা কোনও মিউজিয়ামে দান না করেন আর কী।'

ফিলবি হঠাৎ বিক্রির প্রসঙ্গ তুলছেন কেন? ক্রেতাই বা পেলেন কোথায়? চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল মুরল্যাণ্ডের। একটাই অর্থ হতে পারে এর।

খপ্ করে ড. ফিলবির বাহু চেপে ধরল ও। 'আপনি কোডেক্সটার কথা কাউকে বলেছেন?'

অস্ফুট আওয়াজে ককিয়ে উঠলেন ফিলবি, মুরল্যাণ্ডের আঙুল বসে গেছে তাঁর পেশিতে। কিন্তু ছাড়া পেলেন না। দুর্বল গলায় বললেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মি. মুরল্যাণ্ড। কিন্তু আমার ওই

কণ্ট্যাক্ট বহুদিন থেকে খুঁজছেন এই কোডেক্সটা। টাকার পরিমাণ বড় নয় তাঁর জন্য... যা চাইবেন, তা-ই পাবেন। কিন্তু জিনিসটা তাঁর চাই-ই চাই।'

'অমন একটা আর্টিফ্যাক্ট বিক্রির প্রস্তাব আপনার মুখে অন্তত শোভা পায় না, ড. ফিলবি,' কঠিন গলায় বলল মুরল্যাণ্ড।

মাথা নিচু করে ফেললেন প্রবীণ আর্কিয়োলজিস্ট। 'আপনার কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। মিউজিয়ামের চাকরিতে নামমাত্র বেতন পাই আমি। কিছুদিন আগে ডিভোর্স হয়ে গেছে আমার স্ত্রী-র সঙ্গে, ওর খোরপোষ দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাচ্ছি আমি। এখন পর্যন্ত উকিলের ফি-ও পুরোটা শোধ করতে পারিনি। সেজন্যেই...'

ভদ্রলোকের দুঃখের কাহিনি শুনবার আগ্রহ বোধ করল না মুরল্যাণ্ড। বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কখন আপনার কণ্ট্যাক্টকে জানিয়েছেন আমার কথা?'

'ইয়ে... আপনি আমার অফিস থেকে বের হয়ে যাবার পর। কিন্তু বিশ্বাস করুন... আমার মনে কোনও কুমতলব ছিল না।'

কুমতলব ড. ফিলবির হয়তো নেই, কিন্তু তাঁর কণ্ট্যাক্টের ব্যাপারে সে-কথা বলা যায় না। আর্কিয়োলজিস্টকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি চারদিকে নজর বোলাল মুরল্যাণ্ড। বোঝার চেষ্টা করল, কেউ ওর উপর নজর রাখছে কি না।

'কে এই ক্রেতা?'

ঠোঁট কামড়ালেন ফিলবি। 'ভদ্রমহিলার নাম মায়া লরেঞ্জো। নামকরা বিজনেস টাইকুন। আমাকে বলে রেখেছিলেন, কোডেক্সটার ব্যাপারে চোখ-কান খোলা রাখতে। যদি ওটা জোগাড় করে দিতে পারি, তা হলে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দেবেন। যদি কোনও ভুল করে থাকি, তার জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, মি. মুরল্যাণ্ড। আশা করি আপনার কোনও অসুবিধে

করে ফেলিনি?'

নামটা শোনামাত্র বুঝে ফেলল মুরল্যাণ্ড, কার কথা বলছেন ভদ্রলোক। এ নিশ্চয়ই গ্যারেটের সেই খালাতো বোন, যে মাইডাসের সমাধি খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে... যার সঙ্গে ছোটবেলায় সে নেপলসের টানেলে ঢুকেছিল।

পকেট থেকে সেলফোন বের করল মুরল্যাণ্ড, রানাকে সতর্ক করে দেবার জন্য। কিন্তু ডায়াল করবার আগেই দৃষ্টি আটকে গেল গ্যালারির একজন বিশালদেহী দর্শনার্থীর উপর। ধূসর রঙের সুট পরে আছে সে, হাতে একটা গাইড বই। ভাব করছে যেন গাইড বইয়ের সঙ্গে মেলাচ্ছে ডিসপ্লের আর্টিফ্যাক্টগুলো। কাঁচা অভিনয়। তা ছাড়া মিউজিয়ামের সাধারণ চেহারা-সুরতের টুরিস্টদের মাঝখানে গুণ্ডামার্কা এই ব্যাটাকে একেবারেই মানাচ্ছে না। মুরল্যাণ্ডকে আড়চোখে দেখার চেষ্টা করতেই ধরা পড়ে গেল সে।

দাঁতে দাঁত পিষল মুরল্যাণ্ড। বিশালদেহী ওই গরিলার সঙ্গে এখন বোঝাপড়া করতে হবে তাকে।

পঁচিশ

স্টাডিতে চুপচাপ বসে মায়ার কথা শুনে চলেছে রানা ও রেমি। গ্যারেটের সঙ্গে নিজের ইতিহাস খুলে বলছে মায়া। যত শুনছে, ততই শঙ্কিত হয়ে উঠছে রানা। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, দু'জনের মধ্যকার বৈরি সম্পর্কের স্বরূপ। তা ছাড়া ইতিমধ্যে ওদেরকে গ্যারেটের দলে ফেলে দিয়েছে মেয়েটা। এর ফল ভাল

হতে পারে না।

মায়া আর গ্যারেটের মায়েরা ছিলেন চাচাতো বোন। কলেজের পড়া শেষ হবার পর গ্যারেটের মা আমেরিকায় যান গ্র্যাজুয়েশন করবার জন্য। সেখানেই গ্যারেটের বাবার সঙ্গে পরিচয় এবং বিয়ে। এরপর আমেরিকাতেই স্থায়ী হন তিনি। স্বামী-সন্তানকে নিয়ে শুধু একবার বেড়াতে এসেছিলেন ইটালিতে, গ্যারেটের বয়স তখন বারো। সে-বারই মায়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ওর। দু'জনে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে আবিষ্কার করে বসে মাইডাসের সমাধি।

সেই ঘটনার পর বাবা-মায়ের সঙ্গে আমেরিকায় ফিরে যায় গ্যারেট, আর কখনও নেপলসে ফেরা হয়নি ওদের। কয়েক বছর পেরিয়ে যাবার পর মায়া শুনেছিল, গ্যারেটের বাবা আত্মহত্যা করেছেন... কিছুদিন পর খবর পেয়েছে মারা গেছেন ওর মা-ও। কেন ওই অবস্থায় গ্যারেটকে ইটালিতে তার আত্মীয়-স্বজনের কাছে পাঠায়নি আমেরিকান সরকার, তা মায়ার অজানা। হতে পারে গ্যারেট নিজেই হয়তো আসতে চায়নি। আসল ঘটনা যা-ই হোক, ছেলেটার সঙ্গে তার আত্মীয়স্বজনের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বড় হবার পর যখন মায়া মাইডাসের সমাধি খুঁজে বের করবার উদ্যোগ নিল, তখন খালাতো ভাইকে ট্র্যাক করবার কোনও উপায় ছিল না তার।

বছর চারেক আগে হঠাৎ করেই বদলে গেল সেই পরিস্থিতি। ইয়োরোপে হাজির হলো গ্যারেট, নিজেই যোগাযোগ করল মায়ার সঙ্গে। প্রস্তাব দিল মাইডাসের সমাধিতে ফিরে যাবার। মায়াও তা-ই চায়, পুরনো বন্ধুকে পাওয়ায় আগ্রহটা বেড়ে যায় আরও। দু'জনে আলোচনায় বসে। পুরনো অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের জায়গায় তৈরি হওয়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ভবনটার কথা গ্যারেটকে জানায় মায়া। গুপ্তপথটা ফাউণ্ডেশনের কংক্রিটে বুজে গেছে। ওটা

রি-ওপেন করতে গেলে বড় ধরনের ডেমোলিশন চালাতে হবে, পুরো বিল্ডিং ধসে পড়বার ঝুঁকি আছে। তা ছাড়া ওখান দিয়ে ঢুকলেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। পুরো টানেল নেটওয়ার্কের ম্যাপিং না করে মাইডাসের চেম্বার খুঁজে বের করা যাবে না। তাতে বহু সময়ের প্রয়োজন, খরচাপাতিও পড়বে মেলা। গোলকধাঁধার মত ওই জায়গাটা ঠিকমত ম্যাপিং করা আদৌ সম্ভব কি না, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। সোজা কথায় ওভাবে মাইডাস চেম্বারে পৌঁছুনো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। তাই নানা দিক ভেবে দু'জনে একমত হয়—বিকল্প পথে অগ্রসর হওয়াই সবচেয়ে ভাল।

পরবর্তী তিন বছর গবেষণা করে কাটায় ওরা। মাইডাস বা প্রাচীন গ্রিস সংক্রান্ত যত ধরনের রেফারেন্স আছে, সব ঘেঁটে দেখেছে। কিন্তু কোথাও মাইডাসের সমাধি বা তার গোল্ডেন চেম্বার বিষয়ক কোনও তথ্য পায়নি। হতাশ হয়ে পড়ল দুজনে।

হঠাৎ করেই বছরখানেক আগে এক প্রয়াত ইংরেজ লর্ডের প্রাইভেট কালেকশনে পাওয়া গেল আর্কিমিডিসের হারানো কোডেক্স এবং একটা সোনার হাত। অ্যাকাডেমিক সার্কেলে মাতামাতি পড়ে গেল এ-নিয়ে। নিজস্ব কণ্ট্যাক্টের মাধ্যমে মায়া এবং গ্যারেটও খবর পায় ওগুলোর। সোনার হাতটার ছবি দেখে দুজনে নিশ্চিত হয়ে যায়, ওটা সেই গোল্ডেন চেম্বারে দেখা মূর্তিটার হাত। সেই সঙ্গে এ-ও জানতে পারে, কোডেক্সে মাইডাসের ঐশ্বর্য নিয়ে কী যেন লিখে রেখে গেছেন আর্কিমিডিস। ব্যস, ওরা নিশ্চিত হয়ে যায়—ওই কোডেক্সই ওদেরকে মাইডাসের সমাধিতে পৌঁছে দিতে পারবে।

একটা ব্যাপার দু'জনে খুব ভাল করে বুঝতে পারছিল—কোডেক্স এবং ওই হাতটা নিলাম হবার আগেই কবজা করতে হবে ওদেরকে। যাতে এক্সপার্টরা জিনিসদুটো নিয়ে

গবেষণার সুযোগ না পায়। তা হলে মাইডাস চেম্বারের খবর ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই দুর্ধর্ষ এক পরিকল্পনা করে ওরা—অকশন হাউসের ভল্ট থেকে কোডেক্স এবং সোনার হাতটা চুরি করবার। এ-কাজ নিজ হাতে সারবার দায়িত্ব নেয় গ্যারেট; মায়া জুগিয়েছে খরচ ও লোকবল। সহকারী হিসেবে গ্যারেটকে পিন্টো ও মাযিনি নামে নিজের দুজন বিশ্বস্ত লোক দিয়েছিল সে, ওদের দায়িত্ব ছিল গোপনে কাজের অগ্রগতি ও গ্যারেটের গতিবিধির খবর মায়ার কাছে পৌঁছে দেয়া। নিয়মিত রিপোর্ট পাঠিয়েছে ওরা... তবে সেটা অকশন হাউসে অপারেশন চালাবার আগের রাত পর্যন্ত। এরপর যেন পৃথিবীর বুক থেকে গায়েব হয়ে গেছে লোকদুটো... এবং গ্যারেটও!

অকশন হাউসে গ্যারেটের অপারেশন যে সফল হয়েছে, তা পত্র-পত্রিকা ও টিভির খবর মারফত জানতে পেরেছে মায়া। কিন্তু এরপর যে কোথায় হারিয়ে গেল ওরা, কিছুতেই বুঝতে পারেনি। চোখকান খোলা রেখেছে মায়া, লোক লাগিয়ে রেখেছে বিভিন্ন জায়গায়, তবে কোথাও উদয় হয়নি অকশন হাউস থেকে খোয়া যাওয়া আর্টিফ্যাক্টগুলো। গ্যারেট যে বেঈমানী করতে পারে, এ-আশঙ্কা করেছে ঠিকই; কিন্তু টানা ছ'মাস কোনও খোঁজখবর না পেয়ে ভাবছিল পালাবার সময় সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সাগরে ডুবে গেছে তার খালাতো ভাই।

'শেষ চেষ্টা হিসেবে মোমফলকটা কিছুদিন পরে কিনি আমি,' কাহিনির শেষে বলল মায়া। 'কোডেক্সের সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছিল ওটা, কিন্তু মূল নিলামে তোলা হয়নি। ডাকাতি হবার পর অকশন হাউসের উপর থেকে আস্থা উঠে গিয়েছিল লর্ডের পরিবারের, ফলে সরাসরি ওদের কাছ থেকে চড়া দামে ওটা কিনে নিতে অসুবিধে হয়নি আমার। ভেবেছিলাম মোমফলক থেকে জরুরি কোনও সূত্র পাব, কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। হতাশা গ্রাস করছিল

আমাকে... তবে আজ তোমাদেরকে দেখে বুঝতে পারছি, এখনও সব শেষ হয়ে যায়নি। অ্যান্থনি বেঁচে আছে!'

বড় করে শ্বাস নিল রানা। বলল, 'ইন্টারেস্টিং গল্প। কিন্তু আমাদের সঙ্গে এ-সবের সম্পর্ক আছে তা ভাবছ কেন?'

'কারণ আর্কিমিডিসের কোডেক্সের কপি আছে তোমাদের বন্ধুর কাছে,' বলল মায়া। 'একটা উপায়েই সেটা তোমরা পেতে পারো—অ্যান্থনি গ্যারেটের কাছ থেকে! ডাকাতির রাতে যদি ও মারা গিয়ে থাকে, কীভাবে সেটা সম্ভব, বলো? ওই কোডেক্সের ক্যাটালগিং হতে দিইনি আমরা, কারও হাতেও পড়তে দিইনি। তার আগেই সরিয়ে নিয়েছি অকশন হাউস থেকে।'

'গ্যারেট কেন তোমার সঙ্গে বেঈমানী করবে? আত্মীয় তোমরা... ছোটবেলার বন্ধু। তোমাকে ঠকিয়ে কী লাভ ওর?'

'সোনার লোভ, রানা। সোনার লোভের সামনে আত্মীয়তার কোনও মূল্য নেই। তা ছাড়া অ্যান্থনি একটা লোভী বদমাশ। প্রায় তিন বছর ওর সঙ্গে কাজ করেছি আমি, পদে পদে দেখেছি ওর নীচতা। পার্টনার নয়, আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীর মত আচরণ করেছে ও সবসময়। সাবধান করে দিয়েছিলাম, আমার সঙ্গে যেন ছলচাতুরি না করে, কিন্তু পাত্তা দেয়নি। মাইডাসের সমস্ত সোনা একা হজম করবার লোভে বেঈমানী করেছে ও, খুন করেছে আমার দুজন বিশ্বস্ত লোককে। এর শাস্তি পেতেই হবে ওকে।'

স্টাডির দরজা খুলে গেল এই সময়। মায়ার গাঁট্টাগোট্টা অ্যাসিসটেন্ট হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে ঢুকল ভিতরে। রানার ব্যাগ... ওটার ভিতরেই জিয়োলেবটা রেখেছে ও। রেঞ্জ রোভারের ট্রাঙ্ক থেকে ব্যাগটা নিয়ে আসা হয়েছে। মায়ার সামনে ওটা নামিয়ে রাখল লোকটা, ভিতর থেকে বের করে আনল জিয়োলেব।

চকচক করে উঠল মায়ার চোখ। 'চমৎকার ডিভাইস,' হাসল

সে। 'নিশ্চয়ই মাইডাসের সমাধি খোঁজার কাজে লাগবে এটা?'

কিছু বলল না রানা বা রেমি। মুখ কালো হয়ে গেছে ওদের।

জিয়োলেবটা ব্যাগের ভিতরে আবার ঢুকিয়ে রাখল মায়া। সঙ্গীর হাতে তুলে দিয়ে ইটালিয়ান ভাষায় হড়বড় করে কিছু বলল।

'সি, সেনিয়রা,' মাথা ঝাঁকাল অ্যাসিসটেন্ট। ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল স্টাডি থেকে।

মনে মনে পরিস্থিতি যাচাই করল রানা। আটকা পড়ে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। কামরার ভিতরে কেউ অস্ত্র দেখাচ্ছে না বটে, কিন্তু এখান থেকে বেরুতে চাইলেই বাধা দেবে মায়ার লোকজন। তারচেয়ে কথাবার্তা বলে মেয়েটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা ভাল। শান্ত গলায় ও জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তুমি আমাদের কাছে?'

'অ্যান্থনির খোঁজ দেবে তোমরা আমাকে,' শীতল গলায় বলল মায়া। 'স্বেচ্ছায় যদি না দাও, টর্চার চালানো হবে!'

'ব্যস, এ-ই? মাইডাসের চেম্বার খোঁজায় সাহায্য চাও না আমাদের?'

'তার কোনও প্রয়োজন নেই, রানা। অন্যের উপর নির্ভর করা ছেড়ে দিয়েছি আমি। কঠিন হলেও সরাসরি রাস্তাই ব্যবহার করব বলে ঠিক করেছি। তার জন্য কোনও গ্রিক স্পেশালিস্ট বা শৌখিন আর্কিয়োলজিস্ট প্রয়োজন নেই আমার। প্রয়োজন শুধু টাকা এবং লোকবলের। দুটোই যথেষ্ট আছে আমার কাছে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

চেয়ারে হেলান দিল মায়া। 'স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ওই বিল্ডিং আমি কিনে নিয়েছি, রানা। হ্যাঁ, কলকাঠি নাড়তে হয়েছে... ইটালিয়ান সরকারের বেশ কিছু পকেটে ঘুষ দিতে হয়েছে... কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজটা করে ছেড়েছি আমি। আগামী সোমবারেই

ওটার দখল বুঝে পাব, আর তারপরেই আমার ডেমোলিশন টিম ওই বিল্ডিঙের ফাউণ্ডেশন ভেঙে টানেলে ঢোকার গোপন পথটা রি-ওপেন করবে। ভিতরে ঢুকে চিরুনি-তল্লাশি শুরু করব, তাতে যত লোক লাগে লাগুক। চেম্বারটা বের করে ছাড়ব আমি। আর্কিমিডিসের কোডেক্স বা তোমাদের সাহায্য কেন চাইছি না, তা বুঝতে পারছ আশা করি? এখন শুধু অ্যান্থনিকে শাস্তি দিতে পারলেই আমার মনের আশা পূর্ণ হয়।'

আচমকা সব পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে। কেন চারদিনের মধ্যে মাইডাসের সমাধি খুঁজে বের করতে চাইছে গ্যারেট, সেটা বুঝতে পারছে। সোমবারের পর থেকে টানেলের ভিতর মায়া তল্লাশি চালাবে। তখন আর ওখানকার ছায়াও মাড়াতে পারবে না সে। তাই মায়ার আগেই ওখানে পৌঁছুতে চাইছে।

'সাহায্য করতে পারলে খুশিই হতাম,' মায়ার উদ্দেশে বলল রেমি। 'কিন্তু গ্যারেট যে কোথায়, সেটা জানা নেই আমাদের।'

'মিছে কথা বলে লাভ হবে না, ড. হ্যাডলি।' ডেস্কের উপর দু'হাত রেখে সামনে ঝুঁকল মায়া। 'ভায়োলেন্স পছন্দ নয় আমার। তাই সহজ একটা সুযোগ দিচ্ছি। অ্যান্থনির খোঁজ দেবার বিনিময়ে টাকা দেব তোমাদেরকে। বলো কত চাও?'

ঠোঁট কামড়াল রানা। এ-ধরনের প্রস্তাব একবারই পাওয়া যায়। রাজি না হবার অর্থ মৃত্যু। ইতিমধ্যে বলে দিয়েছে মায়া, যেভাবে হোক, গ্যারেটের খবর ওদের কাছ থেকে বের করে নেবে সে। একবার ভাবল মেয়েটার সঙ্গে হাত মেলাবে কি না, কিন্তু পরক্ষণে নাকচ করে দিল ভাবনাটা। গ্যারেট যদি টের পেয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে খুন করবে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ও র‍্যাচেলকে।

'তুমি যে কথা রাখবে, তার গ্যারাণ্টি কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার মুখের কথায় আস্থা রাখতে হবে তোমাদেরকে,' বলল মায়া। 'ইউ সি, তেমন কোনও বিকল্প নেই তোমাদের হাতে। হয় অ্যান্থনির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সব খোয়াও, অথবা আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে কামিয়ে নাও নগদ টাকা। বলো কোন্‌টা পছন্দ?'

কয়েক মুহূর্ত ভাববার ভান করল রানা। তারপর বলল, 'বেশ। তিন মিলিয়ন ডলার। জনপ্রতি।'

ঝট্‌ করে ওর দিকে তাকাল রেমি। দৃষ্টি বিস্ফারিত। 'কী বলছ তুমি এ-সব?'

ওকে চোখের ইশারা করল রানা। 'খামোকা ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ কী, বলো? গ্যারেট আমাদেরকে এক মিলিয়ন দেবে বলেছে; এখন মায়া যদি তার তিনগুণ দিতে রাজি থাকে... ওর সঙ্গে হাত মেলানো ভাল না? তা ছাড়া আমার ধারণা, আমাদের পারিশ্রমিক মেটাবার আগেই খতম হয়ে যাবে গ্যারেট।'

ইশারা বুঝতে পেরেছে রেমি। ছোট্ট করে মাথা ঝোঁকাল।

'তিন মিলিয়ন?' পালা করে ওদের দুজনের দিকে তাকাল মায়া। 'ঠিক আছে। পাবে। এখন তা হলে বলো, অ্যান্থনি কোথায়?'

'ড. হ্যাডলি মিথ্যে বলেনি, আমরা সত্যিই জানি না গ্যারেট এ-মুহূর্তে কোথায় আছে,' বলল রানা। 'তবে তুমি যদি একটু ধৈর্য ধরো, ওর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারব। আমাদের পরবর্তী মিটিঙের লোকেশন খুব শীঘ্রি জানাবে ও। তখন নাহয় খবর দেব তোমাকে।'

তীক্ষ্ণ চোখে রানার মুখভঙ্গি যাচাই করল মায়া, কিন্তু তাতে কোনও ভণিতা খুঁজে পেল না। ডেস্কের তলায় হাত দিয়ে বেল টিপল সে।

অ্যাসিসটেন্ট ফের ঢুকল স্টাডিতে। মায়ার ইশারা পেয়ে কোটের ভিতর থেকে পিস্তল বের করল সে। তাক করল রানা

আর রেমির দিকে।

'এসবের মানে কী!' রাগী গলায় বলল রেমি। 'আমরা তো রাজি হয়েছি তোমার প্রস্তাবে!'

'কিছু মনে কোরো না,' বলল মায়া। 'আমার এখানে আতিথ্য গ্রহণ করতে হচ্ছে তোমাদেরকে। যতক্ষণ না অ্যান্থনির খোঁজ দিতে পারছ, ততক্ষণ আমিও তোমাদেরকে ছাড়তে পারছি না।'

'আর টাকা?' ভুরু নাচাল রানা।

'সেটাও অ্যান্থনিকে ধরিয়ে দেবার পর পাবে। কাজ খতম না হলে পেমেন্ট করি না আমি।'

রানা আর রেমিকে দাঁড় করিয়ে দক্ষ হাতে দেহতল্লাশি করল মায়ার অ্যাসিসটেন্ট। কেড়ে নিল সেলফোন। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের আর উপায় থাকছে না ওদের।

রানা বলল, 'এসব কিন্তু চরম বাড়াবাড়ি।'

'উঁহুঁ, স্রেফ সতর্কতা।' ঘড়ি দেখল মায়া। 'আমাকে জরুরি একটা কাজে যেতে হচ্ছে, ফিরে এসে আবার কথা বলব। আপাতত রবার্তোর জিম্মায় রেখে যাচ্ছি তোমাদেরকে। ও তোমাদের কামরা দেখিয়ে দেবে। যাও, বিশ্রাম নাও। লাগেজ-টাগেজ বোধহয় নেই তোমাদের সঙ্গে। জামা-কাপড় আর অন্যান্য টুকিটাকি যা প্রয়োজন, রবার্তোকে জানালে ও আনিয়ে দেবে।'

রবার্তো নামের অনুচরটিকে ইটালিয়ানে কিছু নির্দেশ দিল সে। মাথা ঝাঁকিয়ে রানা আর রেমির দিকে পিস্তলের ইশারা করল লোকটা। 'চলুন।'

'গুডবাই, মি. রানা। গুডবাই, ড. হ্যাডলি।' বিদায় জানাল মায়া। 'লক্ষ্মী ছেলে-মেয়ের মত থেকো। ডান-বাম করতে গেলে নিজেদেরই ক্ষতি হবে।'

স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল মায়া। খানিক অপেক্ষা করে

রবার্তোও বেরুল রানা আর রেমিকে নিয়ে। পিস্তল হাতে পিছনে রইল সে, ওদেরকে ইশারা করল সামনে এগোতে। করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে রেমি ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এবার কী?'

'আমরা পালাচ্ছি,' সংক্ষেপে জানাল রানা।

'কীভাবে?'

'এখনও ভাবছি।'

'তাড়াতাড়ি ভাবো!'

পিছন থেকে ধমকে উঠল রবার্তো। মুখ বন্ধ রেখে দ্রুত পা চালাতে বলছে।

খানিক পরেই মার্বেলপাথরে মোড়া চওড়া একটা সিঁড়ির সামনে পৌঁছে গেল ওরা। রবার্তোর নির্দেশে ওটার ধাপ বেয়ে উঠে এল দোতলায়। ল্যাণ্ডিঙের দেয়াল ঘেঁষে, কাঠের একটা স্ট্যাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে আছে অতিকায় এক পোর্সেলিন ভাস, গায়ে হাজারো নকশা—নিঃসন্দেহে জিনিসটা প্রাচীন কোনও আর্টিফ্যাক্ট।

মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল রানার। ভাসের দিকে ইশারা করে রেমিকে বলল, 'সাবধান!'

বিরক্ত চোখে ওর দিকে তাকাল রেমি। 'সাবধান মানে? আমি তো আর...'

কথা শেষ করতে পারল না ও। কোমরের হালকা ধাক্কায় ওকে ভাসের দিকে ঠেলে দিল রানা। তৈরি ছিল না রেমি, বেসামাল হয়ে সোজা গিয়ে পড়ল ভাসটার গায়ে। স্ট্যাণ্ডের উপর নড়ে উঠল ওটা, পড়ে যেতে শুরু করল।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল রেমি। সবকিছু ভুলে হাত বাড়িয়ে দিল ভাসটা ধরবার জন্য। ইনস্টিঙ্কটের বশে একই কাজ করতে গেল রবার্তোও। আর সেখানেই করল ভুল।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। এগোতে থাকা রবার্তোকে

এক ধাক্কায় দেয়ালের উপর নিয়ে ফেলল ও। সে কিছু বুঝে ওঠার আগেই খামচে ধরল চুল, মাথাটা ঠুকে দিল হার্ডউডের প্যানেলের গায়ে। ককিয়ে উঠল রবার্তো। পরক্ষণে কবজির উপর একটা কারাতে চপ পড়তেই মুঠো থেকে ছেড়ে দিল পিস্তল। ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড এক রদ্দা মেরে লোকটাকে সিঁড়ির দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। গড়াতে গড়াতে সে নেমে গেল নীচে। নীচতলার ল্যাণ্ডিঙে যখন আছড়ে পড়ল, তখন জ্ঞান হারিয়েছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা, তাকাল সঙ্গিনীর দিকে। ভাসটা দু'হাতে ধরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেমি।

'এসো,' বলে রবার্তোর পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল রানা। নেমে এল নীচতলায়। অজ্ঞান লোকটার পকেট হাতড়ে তিনটা সেলফোন পেল—ওর, রেমির, আর রবার্তোর নিজের। রেমির ফোনটা ফিরিয়ে দিয়ে বাকি দুটো জ্যাকেটের পকেটে ভরে ফেলল রানা। তারপর পা বাড়াল স্টাডির দিকে।

'কোথায় যাচ্ছ?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল রেমি। 'পালাবে না?'

'ট্যাবলেটটা ছাড়া নয়,' বলল রানা।

স্টাডিতে ঢুকে মায়ার ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল ও। লুকানো বোতামটা খুঁজে বের করে চাপ দিল ওতে। প্যানেল সরে গিয়ে আবারও উন্মুক্ত হলো ডিসপ্লে কেইস। পিস্তলের বাটের আঘাতে ভেঙে ফেলল কাঁচ। মোমের ফলকটার দিকে হাত বাড়াতেই বাধা পেল রেমির কাছ থেকে।

'আমি নিচ্ছি ওটা,' বলল মেয়েটা। 'জিনিসটা খুব নাজুক। সাবধানে হ্যাণ্ডেল করা দরকার।'

'আমি হ্যাণ্ডেল করতে পারব না ভাবছ?'

'আপাতত আমাদের নিরাপত্তার দিকটা হ্যাণ্ডেল করো তুমি।'

ভাঙা ডিসপ্লে কেইস থেকে সাবধানে মোমফলকটা বের করে

আনল রেমি। ঢুকিয়ে ফেলল পোশাকের তলায়। ওকে নিয়ে দরজার দিকে এগোল রানা। হাতল ঘোরাতে যাবে, এমন সময় বাইরে শোনা গেল উত্তেজিত হৈ-চৈ। রবার্তোকে খুঁজে পেয়েছে কেউ।

'যাশ্ শালা!' খেদোক্তি বেরিয়ে এল রানার মুখ দিয়ে।

'কী করব এখন?' ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল রেমি।

স্টাডির বিশাল কাঁচের জানালার দিকে ইশারা করল রানা। 'দরজা দিয়ে বেরোনো যাবে না, অতএব ওটাই আমাদের এগজিট। তবে তার আগে ছোট্ট একটা কাজ সেরে নেয়া দরকার।'

রবার্তোর ফোনটা বের করে স্মৃতি থেকে একটা নাম্বার ডায়াল করল ও। একবার রিং হতেই জবাব ভেসে এল ওপাশ থেকে।

'ল্যারি কিং।'

'ল্যারি, আমি রানা।'

'রানা? এটা আবার কার নাম্বার...'

'কথা বলার সময় নেই। কুইক, এই কলটা রেকর্ড করতে থাকো। লাইনটা যতক্ষণ জ্যান্ত থাকবে, রেকর্ড চালিয়ে যাওয়া চাই। কিছুতেই বন্ধ কোরো না।'

'ঠিক আছে,' দ্বিরুক্তি না করে রাজি হয়ে গেল ল্যারি।

ফোনটা স্টাডির বইয়ের তাকের মাঝে গুঁজে রাখল রানা, যাতে সহজে খুঁজে না পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে জানালার পাল্লা খুলে ফেলেছে রেমি, হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে। ওর দিকে পা বাড়াতেই শোনা গেল অ্যালার্মের আওয়াজ—পুরো এস্টেট জুড়ে বাজছে। শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা। রবার্তোর মত কত লোক আছে সিকিউরিটিতে, কে জানে। ছোটখাট একটা বাহিনী উদয় হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। তাড়াতাড়ি কেটে পড়া দরকার।

চৌকাঠ টপকে ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে বাইরের লনে নামল

দু'জনে। ঘাপটি মারল একটা বড় ঝোপের পিছনে। উঁকি-ঝুঁকি মেরে আশপাশ দেখে নিল রানা, তারপর রেমির হাত ধরে ছুট লাগাল বাড়ির পিছনদিকে।

'ওদিকে যাচ্ছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রেমি। 'আমাদের গাড়ি তো সামনে!'

'ওখানে আমাদের অপেক্ষায় থাকবে মায়ার লোকজন,' বলল রানা। 'বিকল্প বাহন দরকার।'

'কিন্তু আমাদের জিয়োলেব?'

'আপাতত ওটার কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। আগে প্রাণটা তো বাঁচাই!'

আস্তাবলের সামনে পৌঁছে গেল দু'জনে। এদিকটায় কেউ নেই। দরজা খুলে বিশাল বিল্ডিংটার ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। দ্রুত আস্তাবলের অভ্যন্তরে চোখ বোলাল রানা। মাঝখান দিয়ে হাঁটাচলার রাস্তা, দু'পাশে ঘোড়া রাখার স্টল। সবগুলোতেই ঘোড়া আছে, তবে কোনও মানুষজন নেই এ-মুহূর্তে। দুই নবাগতের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকটা ঘোড়া অস্থির ভঙ্গিতে পা ঠুকল। শোনা গেল মৃদু হ্রেষারব।

'এখানে কেন এলে?' বিরক্ত গলায় বলল রেমি। 'এখানে তো কোনও গাড়ি নেই।'

'গাড়ির জন্য তো আসিনি!' বলল রানা।

চোখ পিট পিট করল রেমি। কথাটার অর্থ বুঝবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফারিত হয়ে গেল দৃষ্টি। ঘোড়া নিয়ে পালাতে চাইছে রানা!

ছাব্বিশ

ড. ফিলবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দ্রুত পা ফেলছে মুরল্যাণ্ড, বেরিয়ে এসেছে ডুভিন গ্যালারি থেকে। আড়চোখে লক্ষ করেছে, গরিলাও পিছু নিয়েছে ওর। সেলফোনে রানার কাছে একটা মেসেজ পাঠাল ও—সতর্ক করে দেবার জন্যে। একটু পরেই পেল জবাব।

খবর পাঠাতে একটু দেরি করে ফেলেছ, বন্ধু। অলরেডি ঝামেলায় জড়িয়ে গেছি। চেষ্টা করছি এখান থেকে বের হতে। হিথ্রোতে চলে যাও। ওখানেই দেখা করব।

রানা আর রেমির জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে মুরল্যাণ্ডের, কিন্তু করার কিছু নেই। আপাতত নিজের ঝামেলা সামলাতে হবে। পিছু নেয়া লোকটাকে নিয়ে বিশেষ ভয় পাচ্ছে না। মারামারি বাধলে ব্যাটাকে শুইয়ে ফেলতে পারবে বলে বিশ্বাস আছে ওর। কিন্তু অমন কিছু করতে গেলে পুলিশি হাঙ্গামায় জড়িয়ে যাবে। তাতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। কাজেই লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে সটকে পড়তে হবে।

ব্যাকপ্যাকটা ভাল করে টেনে পিঠের সঙ্গে আটকে নিল মুরল্যাণ্ড। ম্যাপ বের করে দেখে নিল অবস্থান। ডুভিন গ্যালারি থেকে একশো গজ সরে এসেছে ও। এখান থেকে বেরুবার পথ

দুটো। একটা পিছনে—ওটা ধরে গ্রেট কোর্টে বেরুতে পারবে। অন্যটা সামনের দিকে... মিউজিয়ামের গিফট শপের ভিতর দিয়ে।

ব্যাকট্র্যাকিং পছন্দ করে না মুরল্যাণ্ড, তাই সামনে এগোবারই সিদ্ধান্ত নিল। মিউজিয়াম থেকে বের হতে পারলেই হয়। লণ্ডনের ভিড়বাট্টার মাঝে পিছনের লোকটাকে খসিয়ে ফেলতে কষ্ট হবে না। ওর থেকে ত্রিশ ফুট পিছনে থাকছে সে সবসময়। ডিসপ্লে কেইসের কাঁচে তার প্রতিফলন দেখে নিয়েছে মুরল্যাণ্ড।

রুক্ষ চেহারার একজন মানুষ, ভুরু জোড়া অস্বাভাবিক রকমের পুরু। নাক ভাঙা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সুদর্শন তো নয়ই, সরাসরি কুৎসিত বলা চলে অনায়াসে। তবে চেহারার দৈন্য ঘুচিয়ে দিয়েছে তার শরীরের কাঠামো। মুরল্যাণ্ডের চেয়ে অন্তত চার ইঞ্চি লম্বা লোকটা, বুকের ছাতিও বড়। হাতদুটো মুগুরের মত। উদ্ধত ভঙ্গিতে হাঁটছে, যেন দুনিয়ার কাউকেই পরোয়া করে না। বোঝা গেল, গায়ের জোর খাটিয়ে এবং মানুষকে ভয় দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করায় সে অভ্যস্ত। কৌশল খাটাতে জানে না। এ-ধরনের লোককে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয়, তা মুরল্যাণ্ড জানে। কিন্তু সমস্যা হলো, লোকটার সঙ্গী-সাথী থাকতে পারে আশপাশে। সবার সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব হবে না। কাজেই সময় থাকতেই কেটে পড়া ভাল।

পরের আর্চওয়েতে পৌঁছে মোড় নিল মুরল্যাণ্ড। বাড়িয়ে দিল চলার গতি। দুটো গ্যালারি আর সবশেষে গিফট শপ পেরিয়ে পৌঁছে গেল মিউজিয়ামের ফ্রন্ট এন্ট্রান্সের কাছাকাছি। দুপুর বেলায় ভিড় কম, আঙিনার মত জায়গাটা মোটামুটি ফাঁকাই পাওয়া গেল। খুশি হয়ে উঠল ও। রাস্তায় নেমে তিন ব্লক গেলেই আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টেশন। দূরত্ব খুব বেশি নয়।

কিন্তু বিধি বাম।

গেট পেরুতেই একটা বিএমডব্লিউ গাড়ি এসে ব্রেক কষল পেভমেন্টের পাশে। কালো পোশাক পরা দু'জন লোক নামল ওটা থেকে। ডানে-বামে কোথাও তাকাল না, সরাসরি মুরল্যাণ্ডের উপর নিবদ্ধ হলো ওদের দৃষ্টি। এগিয়ে আসতে শুরু করল আগ্রাসী ভঙ্গিতে। বদখত চেহারা দু'জনেরই—একজন শুকনো-পাতলা, নাকের তলায় শোভা পাচ্ছে সরু এক টুকরো গোঁফ... সময় নিয়ে যত্ন করে ছাঁটা... গোঁফটা শয়তানি ভাব এনে দিয়েছে চেহারায়। দ্বিতীয়জন মাঝারি গড়নের, ক্লিন-শেভড্, মাথায় লম্বা চুল... পিছনে ঝুঁটি করে বেঁধে রেখেছে। গরিলার উপযুক্ত সঙ্গীই বটে!

থমকে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড। ঘাড় ফেরাতেই দেখল, বিশালদেহী লোকটা ওর দশ ফুটের মধ্যে এসে গেছে। তিনদিক থেকে ওকে ঘিরে দাঁড়াল শত্রুরা। কোথাও যাবার উপায় নেই।

গোঁফঅলা লোকটা গরিলার উদ্দেশে ইটালিয়ানে কিছু বলল। কথাগুলো বুঝতে পারল না মুরল্যাণ্ড, শুধু এটুকু বুঝল, গরিলার নাম টমি।

'*সি*,' সঙ্গীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল টমি। তারপর মুরল্যাণ্ডের দিকে ফিরল। 'মি. ববি মুরল্যাণ্ড, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

একে একে তিন প্রতিপক্ষের দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'যদি যেতে না চাই?'

কোটের একটা পাশ সরিয়ে শোল্ডার হোলস্টারে রাখা পিস্তল দেখাল টমি। বুঝিয়ে দিল, কথা না শুনলে ওকে গুলি করা হবে।

'তুমি কি জানো, লণ্ডনে বেআইনী অস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ?' হালকা গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'পুলিশের হাতে যদি অ্যারেস্ট হও ওই কামান-সহ, তা হলে কিন্তু বিরাট গাড্ডায় পড়বে।'

'এ-মুহূর্তে আপনিই গাড্ডার মধ্যে আছেন,' নীরস গলায়

বলল টমি।

'মায়া লরেঞ্জো পাঠিয়েছে তোমাদেরকে, তাই না?'

নামটা শোনামাত্র একটু কেঁপে উঠল টমির চোখের পাতা। কঠিন গলায় বলল, 'কথা কম। গাড়িতে উঠুন!'

'সত্যি ঝামেলা করতে চাও?'

বিভ্রান্তি ভর করল টমির চোখের তারায়। তার হুমকির সামনে এই প্রথম কাউকে অটল থাকতে দেখছে। 'উঠুন বলছি!' ধমকে উঠল সে।

'পারলে ওঠাও।'

দৃষ্টি বিনিময় করল তিন গুণ্ডা। তারপর একযোগে আগে বাড়ল।

পেশি শক্ত করে ফেলল মুরল্যাণ্ড, শত্রুরা পাঁচ ফুটের মধ্যে পৌঁছুতে বলল, 'মস্ত ভুল করছ। এখনও সময় আছে, চলে যাও।'

'ধর্ ব্যাটাকে!' বলে উঠল টমি।

দু'পাশ থেকে গোঁফঅলা আর ঝুঁটিঅলা হাত বাড়াল মুরল্যাণ্ডের হাত ধরার জন্য। এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল ও। বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। নিমেষে ঝড় বয়ে গেল।

এরা স্রেফ রাস্তার গুণ্ডা, আনআর্মড্ হ্যাণ্ড-টু-হ্যাণ্ড কমব্যাটের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ, নইলে এভাবে বোকার মত নিজেদের অরক্ষিত করে ফেলত না। সামান্য ঘুরে গিয়ে গোঁফঅলার ঘাড়ে বিরাশি সিক্কার এক রদ্দা বসাল মুরল্যাণ্ড। প্রায় একই সময়ে অন্যহাতের কনুই চালাল ঝুঁটিঅলার নাক বরাবর। গোঁফঅলা ইতিমধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে, দু'হাতে ভাঙা নাক ধরে কাতরে উঠল ঝুঁটিঅলা। আঙুলের ফাঁক দিয়ে অঝোর ধারায় নামছে রক্ত। সোলার-প্লেক্সাসে ভয়ানক এক গুঁতো খেতেই খাবি খেতে খেতে বসে পড়ল হাঁটু মুড়ে।

ক্ষণিকের জন্য থমকে গিয়েছিল টমি, সংবিৎ ফিরতেই

হোলস্টার থেকে দ্রুত বের করে আনল পিস্তল। কিন্তু মুরল্যাণ্ডের নাগালের মধ্যে থেকে মস্ত ভুল করেছে সে। কবজির উপর কারাতে চপ পড়তেই ককিয়ে উঠে মুঠো ছেড়ে দিল। সাইডওঅকের উপর খটমট করে পড়ে গেল পিস্তলটা। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল, মনের সাধ মিটিয়ে তার উরুসন্ধিতে একটা পেনাল্টি কিক ঝাড়ল মুরল্যাণ্ড। জান্তব গোঙানি বেরিয়ে এল গরিলার মুখ দিয়ে। তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেল সে কংক্রিটের উপর। দু'হাতে আহত স্থানটা চেপে ধরে কুণ্ডলী পাকিয়ে ফেলল শরীর। বেশ কিছুটা সময়ের জন্য লড়াইয়ের ক্ষমতা হারিয়েছে।

এতকিছু ঘটে গেছে মাত্র চার সেকেণ্ডের মধ্যে। পরাজিত প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল মুরল্যাণ্ড, ব্যাপারটা এত সহজ হবে ভাবেনি। বোকার দল, ওকে আণ্ডার-এস্টিমেট করেছিল। ঝুঁকে লোক-তিনটের কোটের ভিতর থেকে পিস্তল বের করে নিল ও। ম্যাগাজিন খুলে ফেলল, আলাদা করে ফেলল স্লাইডগুলো; তারপর অচল অস্ত্রগুলো ছুঁড়ে ফেলল পেভমেণ্টের উপর।

দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটার উপর নজর পড়ল ওর। খামোকা হাঁটার দরকার কী? তা ছাড়া গাড়ি না থাকলে ওর পিছুও নিতে পারবে না এরা। বিএমডব্লিউ-র ড্রাইভিং সিটে উঠে পড়ল ও। আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টেশন পর্যন্ত আরামে চলে যাবে। তারপর গাড়িটা ওখানকার পার্কিং লটে ফেলে রাখলেই হলো।

ইঞ্জিন বন্ধ করেনি গুণ্ডারা, গিয়ার দিল মুরল্যাণ্ড। চলতে শুরু করবার আগে খোলা জানালা দিয়ে তাকাল পড়ে থাকা লোকগুলোর দিকে। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'একটা উপদেশ দিচ্ছি, টমি। আগামীতে আরও বেশি লোক এনো!'

ব্রেক রিলিজ করে গাড়িকে সামনে বাড়াল ও। পিছন থেকে চিৎকার করে উঠল টমি, ইটালিয়ানে গালাগালির তুবড়ি

ছুটিয়েছে। তবে ততক্ষণে এগিয়ে গেছে মুরল্যাণ্ড, গালিগুলো ওর কানে পৌঁছুল না।

সাতাশ

'আমি ওটার পিঠে চড়ছি না,' বলে উঠল রেমি।

আস্তাবলের দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। ভয়ার্ত চোখে দেখছে, মায়ার অ্যারাবিয়ান ঘোড়াটার পিঠে স্যাডল চাপাচ্ছে রানা। ঘন ঘন ঢোঁক গিলল ও।

'এত ভয় পাচ্ছ কেন?' বিরক্ত গলায় বলল রানা। হাতে সময় নেই, যে-কোনও মুহূর্তে ওদের খোঁজে আস্তাবলে তল্লাশি চালাতে আসবে শত্রুরা। 'ঘোড়ায় চড়তে বলছি তোমাকে, বাঘ বা সিংহের পিঠে নয়। তা ছাড়া... আর কোনও বাহনও নেই আমাদের হাতে।'

'তুমি যাও। আমি নাহয় চেষ্টা করে দেখি, গাড়িটা উদ্ধার করা যায় কি না।'

'এবার কিন্তু বোকার মত কথা বলছ। কীভাবে উদ্ধার করবে গাড়ি? তাও আবার একা!'

'আ... আমি ঘোড়ায় চড়তে চাই না!'

'কেন... রাইডিং জানো না? এর আগে কোনোদিন চড়োনি?'

'চড়েছি... প্রায় বিশ বছর আগে। আর সে-কারণেই বুঝতে পারছি, ঘোড়ার চেয়ে মায়ার গুণ্ডাদের ডিল করা সহজ।'

'কিছুই ডিল করতে হবে না তোমাকে। আমার পিছনে

চড়বে।'

'তা-ও...'

ইতিমধ্যে পরিস্থিতি নিয়ে এক দফা আলোচনা হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে। ওদের গাড়িটা রয়েছে বাড়ির সামনে—ধরা না পড়ে ওখানে পৌঁছুনো সম্ভব নয়। পুলিশে ফোন করেও লাভ হবে না। পুলিশ আসা পর্যন্ত যদি লুকোচুরি করে টিকেও থাকতে পারে... তেমন সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ... মায়া সরাসরি অস্বীকার করবে সমস্ত অভিযোগ। উল্টো পুলিশের কাছে নালিশ জানাবে, রানা আর রেমি ওর বাড়ির ভিতরে ভাঙচুর করেছে, ওর বডিগার্ডকে আহত করেছে। তার প্রমাণও দেখাতে পারবে সে। এর অর্থ, ওদেরকে গ্রেফতার করবে পুলিশ। তাতে জীবন নিয়ে এই এস্টেট থেকে বেরুনো গেলেও আটকা পড়তে হবে হাজতে। কিছুতেই গ্যারেটের দেয়া ডেডলাইনের ভিতর কাজ শেষ করতে পারবে না। অগত্যা পলায়ন ছাড়া গতি নেই।

দ্রুত ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপানো শেষ করল রানা, লাগাম পরাল। স্ট্র্যাপের বাঁধন পরীক্ষা করে ফিরল সঙ্গিনীর দিকে।

'আমি রেডি। এসো।'

'আ... আমি পারব না, রানা।'

'পারতেই হবে!' ধৈর্য ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না রানার পক্ষে। রেমির দিকে এগিয়ে গেল ও। খপ্ করে ধরল ওর একটা বাহু। কড়া গলায় বলল, 'শোনো, তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নেই আমার। আমার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়বে তুমি... আর ঘোড়ায় চড়েই এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা। ক্লিয়ার?'

আপত্তি জানাবার জন্য কিছু বলতে যাচ্ছিল রেমি, বাধা পেল বাইরে থেকে গুলিবর্ষণের আওয়াজ ভেসে আসায়। ওকে জাপটে ধরে মাটিতে ডাইভ দিল রানা, পরক্ষণে দরজার পুরনো কাঠ ফুটো করল কয়েকটা বুলেট।

গাল দিয়ে উঠল রানা, ওদের খোঁজ পেয়ে গেছে শত্রুরা। দরজার তক্তার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। অস্ত্র উঁচিয়ে ছুটে আসছে চারজন লোক।

'মুভ!' এক টানে রেমিকে দাঁড় করাল রানা। নিয়ে গেল ঘোড়ার কাছে।

স্যাডলের সামনে হাতড়াল রেমি। 'এখানে একটা শিঙের মত জিনিস থাকে না? ওটা কোথায়?'

গ্রিপের কথা জানতে চাইছে ও। রানা বলল, 'ওই জিনিস আমেরিকান স্যাডলে থাকে। এটা ব্রিটিশ স্যাডল।'

'সে কী! পড়ে যেতে গেলে আমি তা হলে কী ধরব?'

'আমাকে,' সংক্ষেপে বলল রানা। এক লাফে চড়ে বসল স্যাডলে, স্টিরাপে পা বাধিয়ে টান দিয়ে রেমিকে তুলে নিল নিজের পিছনে। জুতোর হিল দিয়ে খোঁচা মারল ঘোড়ার পেটে।

আস্তাবলের পিছন দিকে ছুটে গেল প্রাণীটা। ওদিকে আরেকটা দরজা আছে, সেটার ছিটকিনি আগেই খুলে রেখেছে রানা। ঘোড়ার পায়ের লাথিতে হাট হয়ে খুলে গেল পাল্লা। সেখান দিয়ে জ্যা-মুক্ত তীরের মত ছিটকে বেরুল প্রাণীটা। ছুটতে শুরু করল প্রাণপণে।

পঞ্চাশ গজ যেতেই পিছনে শোনা গেল হৈচৈ। ঘাড় ফেরাল রানা। আস্তাবলের পিছনে উদয় হয়েছে মায়ার লোকেরা। একজন রাইফেল উঁচিয়ে গুলি করতে গেল, কিন্তু ট্রিগার চাপার আগেই কোত্থেকে যেন ছুটে এল মায়া। থাবা দিয়ে নামিয়ে দিল রাইফেলের ব্যারেল।

'ওর দাম তোমার চেয়ে অনেক বেশি!' ইটালিয়ানে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, দূর থেকেও তার গলা পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। প্রিয় ঘোড়াটার আহত হবার ঝুঁকি নিতে চাইছে না সে।

তাই বলে হাল ছাড়ল না ওরা। আরও কিছুদূর এগোবার পর

শোনা গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ। দুটো জিপ চলে এসেছে বাড়ির সামনে থেকে। আস্তাবলের সামনে দাঁড়িয়ে তুলে নিল মায়া ও তার সঙ্গীদের, তারপর ধাওয়া করল রানা আর রেমিকে।

ডানদিকে জঙ্গল দেখতে পেয়ে সেদিকে ঘোড়া ছোটাল রানা। গাছগাছালির ভিতরে ওদের পিছু নিতে পারবে না জিপদুটো। ঘাড় ফিরিয়ে রেমিকে দেখে নিল। ওকে মাকড়সার মত জাপটে ধরে রেখেছে মেয়েটা, চোখ বন্ধ... তবে পড়ে যাবার ভয় নেই। সন্তুষ্ট হয়ে ঘোড়াকে আরও জোরে ছোটাল রানা।

জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। গাছপালা খুব ঘন নয়, যে-রকম আগাছা আর ঝোপঝাড় থাকার কথা মাটিতে, তা-ও নেই। বোঝা গেল, এটা আসলে কৃত্রিম জঙ্গল—পরিকল্পিতভাবে তৈরি করা হয়েছে এস্টেটের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য। অবশ্য তারপরেও জায়গাটা রানার উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য যথেষ্ট। গাছপালার মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে চলল ও। পিছনে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে এল জিপের আওয়াজ।

দম ফেলবার ফুরসত পেয়ে রেমিকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'হচ্ছে না মানে!' মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল রেমি। 'পুরোটাই তো অসুবিধে!'

হাসল রানা। 'একটু ধৈর্য ধরো, খুব শীঘ্রি ওদেরকে খসিয়ে ফেলব পিছন থেকে।'

হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল জঙ্গল। ঘাসে ঢাকা বিস্তীর্ণ একটা মাঠে বেরিয়ে এল ওরা। আড়াআড়ি পথে মাঠ অতিক্রম করবার জন্য ঘোড়া ছোটাল রানা। কিন্তু কিছুদূর যেতেই কানে ভেসে এল ইঞ্জিনের গর্জন। জঙ্গলের কিনার থেকে উদয় হলো জিপদুটো। ঘুরপথে চলে এসেছে।

নিচু গলায় ভাগ্যকে গালমন্দ করল রানা। খসানো যায়নি

প্রতিপক্ষকে। একটা রাইফেল গর্জে উঠল, ঘোড়ার দশ গজ দূর দিয়ে ছুটে গেল বুলেট।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল রেমি। 'ওরা গুলি করছে, রানা!'

'করুক,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ভয় দেখিয়ে থামাতে চাইছে আমাদের। ঘোড়ার গায়ে গুলি লাগার ভয়ে নিশানা করতে পারছে না। এটা একটা প্লাস পয়েন্ট।'

নির্দয় ভঙ্গিতে ঘোড়ার পেটে গুঁতো মারল ও। হ্রেষারব করে প্রাণপণে ছুট লাগাল অ্যারাবিয়ান। পিছনে রৈ রৈ করে ছুটে এল মায়া ও তার চ্যালা-চামুণ্ডারা। আরেকটা গুলি হলো, রানা আর রেমির মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল ওটা।

মিনিটপাঁচেক চলল দৌড় প্রতিযোগিতা, তারপরেই রানা টের পেল, হার হতে চলেছে ওদের। জিপের গতি ঘোড়ার চেয়ে বেশি, ওদের বিশ গজের ভিতর পৌঁছে গেছে যান্ত্রিক বাহনদুটো, ধরে ফেলবে এক্ষুণি। লাগাম টানল ও, যেন ব্রেক কষল ঘোড়াটা। থেমে গেল। একই সঙ্গে মায়ার চিৎকার ভেসে এল পিছন থেকে। ঘোড়ার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে তার জিপ।

বন বন করে স্টিয়ারিং ঘোরাল ড্রাইভার। ডান দিকের দুই চাকার উপর প্রায় খাড়া হয়ে গেল গাড়িটা। কোনোমতে সংঘর্ষ এড়িয়ে পাশ কাটাল ঘোড়াকে। কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে ব্রেক কষল, থমকে দাঁড়াল। ঝাঁকিতে বেসামাল হয়ে গেছে আরোহীরা। সঙ্গে সঙ্গে তীরবেগে ঘোড়াকে আগে বাড়াল রানা। জিপের পাশ দিয়ে যাবার সময় সাপের মত ছোবল মারল ওর হাত, অসতর্ক এক গুণ্ডার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল রাইফেল। একেবারেই তৈরি ছিল না লোকটা, অস্ত্র হারিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল।

দ্বিতীয় জিপটা চলে এসেছে কাছে, ওটার দিকে এবার মনোযোগ দিল রানা। ইচ্ছে করেই গতি কমাল বাহনের, যাতে

ওদেরকে নাগালে পায় প্রতিপক্ষ। রেমি চেঁচিয়ে উঠল, 'কী করছ তুমি? ওদেরকে কাছে আসতে দিচ্ছ কেন?'

জবাব দিল না রানা। জিপটা পাশে আসতেই নড়ে উঠল। এতক্ষণ শরীরের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল রাইফেল, এবার ওটা তুলে তাক করল জিপের দিকে। টিপে দিল ট্রিগার।

বিকট শব্দে ফাটল জিপের টায়ার। ছুটন্ত অবস্থায় হোঁচট খাবার ভঙ্গিতে ঝাঁকি খেলো গাড়িটা। মাতালের মত নাক ঘুরে গেল... ব্যালান্স নষ্ট হয়ে গেছে। আঘাত সামলে নেবার আগেই চুপসানো চাকাটা আচমকা আটকে গেল মাটিতে। গতিবেগের কারণে বাকি তিনটে চাকা উঠে গেল শূন্যে, চোখের পলকে খাড়া হয়ে গেল গাড়িটা। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য স্থির রইল, তারপরেই কাত হয়ে পড়ে গেল একপাশে।

ততক্ষণে প্রথম জিপটা আবার ধাওয়া শুরু করেছে। ঘোড়ার মুখ ঘোরাল রানা। মাঠের একপ্রান্তে ছোট্ট একটা নদী দেখতে পেয়েছে, অন্য পারে চরে বেড়াচ্ছে ভেড়ার পাল। সংকীর্ণ একটা ফুটব্রিজ চলে গেছে নদীর উপর দিয়ে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ওদিকে। মায়ার জিপ ওদের নাগাল পাবার আগেই পৌঁছে গেল ওখানে।

ফুটব্রিজের দিকে তাকিয়ে দমে গেল রানা। অনেক পুরনো, নড়বড়ে। দু'জন মানুষসহ একটা ঘোড়ার ওজন নিতে পারবে কি না সন্দেহ। কিন্তু আর কোনও বিকল্পও নেই, দুলকি চালে উঠে পড়ল ব্রিজে। ঘোড়ার পায়ের তলায় প্রতিবাদ করে উঠল পুরনো কাঠ। থামল না রানা, এগিয়ে চলল। অর্ধেক যেতেই ঘটল বিপত্তি। মড়মড় আওয়াজ তুলে ভেঙে পড়তে শুরু করল ব্রিজ। উপায়ান্তর না দেখে ঘোড়াসহ পানিতে ঝাঁপ দিল রানা। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল রেমি।

ঝপাস করে নদীর বুকে আছড়ে পড়ল অ্যারাবিয়ান ঘোড়া। যুঝতে শুরু করল ভেসে থাকবার জন্য।

নাকে-মুখে পানি ঢুকে গেছে দুই আরোহীর। কাশতে কাশতে রেমির উদ্দেশে রানা বলল, 'আমাকে ধরে থাকো!'

বলবার প্রয়োজন ছিল না, মাকড়সার মত ইতিমধ্যেই ওকে জাপটে ধরেছে মেয়েটা। ঘোড়ার দিকে মনোযোগ দিল রানা। স্রোতের মাঝে পড়ে দিশেহারা হয়ে গেছে প্রাণীটা। ওটাকে শান্ত করে মুখ ঘোরাল। বুঝিয়ে দিল কোন্‌দিকে সাঁতার কাটতে হবে। এরপর নজর ফেরাল নদীর ধারে।

এসে পড়েছে মায়ার জিপ। গাড়ি থেকে নেমে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, দু'পাশে তার সঙ্গীরা। ক্ষুব্ধ চেহারা, জিপ নিয়ে নদী পেরুবার উপায় নেই ওদের। একজন সঙ্গী রাইফেল উঁচু করতে গেলে বাধা দিল। ঘোড়ার গায়ে গুলি লাগবার ঝুঁকি নিতে রাজি নয় মায়া।

স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে কয়েক মিনিট পরেই নদীর অন্যপারে উঠে এল অ্যারাবিয়ান ঘোড়া। ডাঙায় পা রেখে গা ঝাড়া দিল। হাসিমুখে মায়ার উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা। তারপর ভেড়ার পালের মাঝ দিয়ে জোর কদমে ছোটাল ঘোড়া। খানিক পরেই ঢুকে গেল গাছগাছালি আর ঝোপঝাড়ের ভিতরে।

'তুমি ঠিক আছ?' দম ফেলবার ফুরসত পেয়ে রেমিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না,' কোনোমতে বলল রেমি। 'মনে হচ্ছে বমি করে ফেলব। এজন্যেই আমি ঘোড়ায় চড়তে চাই না।'

হাসল রানা। 'বিপদ কিন্তু কেটে গেছে... আর সেটা এই ঘোড়াটার কল্যাণে!' অ্যারাবিয়ানের ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিল ও।

'এখন কী করবে? নাকি ভাবছ ঘোড়ায় চড়েই লণ্ডনে ফিরবে?'

'উঁহুঁ।' বাম দিকে ইশারা করল রানা। 'আসার পথে ওদিকে একটা শহর পেরিয়ে এসেছিলাম, এখান থেকে বড়জোর মাইলখানেক। ওখানে গিয়ে দেখব, একটা গাড়ি পাওয়া যায় কি

না।'

খুব বেশি সময় লাগল না পৌঁছুতে। শহরে ঢুকতেই মুখোমুখি হলো স্থানীয় লোকজনের বিস্মিত দৃষ্টির। ভেজা শরীরে দু'জন অশ্বারোহীকে দেখে এমন প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। নির্বিকার রইল রানা। রাস্তা ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ঘোড়া। হঠাৎ শুনতে পেল ট্রেনের হুইসেল। গাড়ির চেয়েও ভাল বাহন ওটা।

দু'ব্লক যেতেই স্টেশনে পৌঁছে গেল ওরা। বাইরে বসে থাকা এক ভবঘুরের হাতে ধরিয়ে দিল ঘোড়ার লাগাম, তাকে দশ ডলার বখশিশ দিয়ে ঢুকে পড়ল স্টেশনে। টিকেট কেটে দ্রুত উঠে পড়ল প্ল্যাটফর্মের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনে। লণ্ডনের উদ্দেশে চলেছে ট্রেনটা, ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছুবে এক ঘণ্টা পর।

যাত্রীদের বিস্মিত দৃষ্টি উপেক্ষা করে সিট খুঁজে নিল রানা। বসে পড়ল রেমিকে নিয়ে। হুইসেল বাজিয়ে গতি বাড়ল ট্রেনের। সিটে হেলান দিয়ে চোখ মুদল রানা।

আটাশ

আকাশে মধ্যদুপুরের গনগনে সূর্য। নির্জন রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে টেরেন্স ম্যালকমের ট্রেইলার ট্রাক। উইণ্ডশিল্ড গলে ড্রাইভিং ক্যাবের ভিতরে ঢু•ক পড়ছে প্রখর রোদ, লোহার তৈরি পুরো কাঠামোটা তেতে উঠছে সেই রোদের আঁচে। ট্রাকের পুরনো এসি এই তীব্র উত্তাপের সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠছে না। দরদর করে ঘামছে টেরেন্স। পুরো লোড নিয়ে ভার্জিনিয়া অ্যাপালাচিয়ানের

পাহাড়ি পথে চলতে গিয়ে বিচ্ছিরি আওয়াজ করছে ইঞ্জিন, নিচু গলায় বসদের উদ্দেশে একটা গালি দিল সে।

ত্রিশ বছর ধরে গিবসন'স ফার্ম সার্ভিসে কাজ করছে টেরেন্স, কোনোদিন কোনও অভিযোগ করেনি। কিন্তু এখন তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে চলেছে। ট্রাক মেইনটেন্যান্সের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের এমন উদাসীনতা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। এই তো, গত সপ্তাহেই বিশ্রী একটা অভিজ্ঞতা হলো তার—ফার্টিলাইযার নিয়ে ব্ল্যাকস্‌বার্গ যাবার পথে ড্রাইভ অ্যাকসেলের বিয়ারিং সিজ করল, পাক্কা চার ঘণ্টা বসে থাকতে হলো তাকে জনমনিষ্যিহীন একটা জায়গায়; তারপর এল রিপেয়ার ক্রু। দিনে দিনে বাড়ছে এই ধরনের ঘটনা—ঠিকমত ট্রাকের রক্ষণাবেক্ষণ না করাতেই ঘটছে এসব।

এসি বন্ধ করে দিল টেরেন্স—ওটা চলা না চলা সমান কথা। নামিয়ে দিল জানালার কাঁচ। গরম বাতাস হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ক্যাবের ভিতর। যতটুকু স্বস্তি পাবে বলে ভেবেছিল, তার ছিটেফোঁটাও পেল না। আরও দ্রুত ঘামছে সে, বুক-পিঠের সঙ্গে সেঁটে যাচ্ছে ভেজা শার্ট। বাইরে এক দলা থুতু ফেলল টেরেন্স, তারপর হাত বাড়িয়ে অন করল রেডিয়ো—একটু গান শোনা যাক। নব ঘুরিয়ে একটাই স্টেশন ধরতে পারল; সেটায় চড়া গলায় রাজনৈতিক ভাষণ দিচ্ছে এক পাতি নেতা। ধ্যাত্তেরি বলে রেডিয়ো অফ করে দিল টেরেন্স, দিনটাই কুফা।

দশ মিনিট হলো হাইওয়ে ছেড়ে সাইড রোডে নেমে এসেছে সে, যাচ্ছে ডিয়ারফিল্ডের এক খামারে। রাস্তা একেবারে নির্জন, এ-পর্যন্ত মাত্র দুটো গাড়ির দেখা পেয়েছে—ওকে ওভারটেক করে চলে গেছে গাড়িদুটো, সাইড দেবারও সময় দেয়নি। এত তাড়াহুড়োর কী আছে বোঝে না টেরেন্স। তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই বড় বড় সড়ক-দুর্ঘটনা ঘটে, তা কি জানে না লোকে?

পিছনে হর্নের আওয়াজ শুনতে পেয়ে সাইড-মিররে চোখ

বোলাল টেরেন্স। আরেকটা গাড়ি উদয় হয়েছে—সাদা রঙের একটা ভ্যান। হেডলাইট জ্বালিয়ে-নিভিয়ে সঙ্কেত দিল তাকে। এরও তাড়া! কাঁধ ঝাঁকিয়ে ট্রাক একটু ডানে সরিয়ে আনল টেরেন্স, জানালা দিয়ে হাত বের করে ইশারা দিল। সঙ্গে সঙ্গে উল্কার বেগে ওকে পেরিয়ে গেল গাড়িটা। রাস্তার মাঝখানে আবার ট্রাককে নিয়ে এল টেরেন্স। গতি বাড়িয়ে আরেকটু বাতাস পাবার চেষ্টা করল।

মুখে আর গায়ে বাতাসের ঝাপটায় কিছুটা আরামবোধ হলো তার। আবেশে চোখ মুদতে গিয়েই সচকিত হয়ে উঠল, চট করে তাকাল সামনে। পরক্ষণে বিস্ফারিত হয়ে গেল তার দৃষ্টি। টায়ারের ঘর্ষণে সামনের সাদা ভ্যানটার পিছনে ধোঁয়া উড়ছে—আচমকা ব্রেক কষেছে ওটা। চোখের পলকে আধপাক ঘুরল, আড়াআড়িভাবে ব্লক করে ফেলল রাস্তা।

আঁতকে উঠে ব্রেক প্যাডাল চেপে ধরল টেরেন্স। অ্যাসফল্ট আর টায়ারের ঘর্ষণে বিচ্ছিরি শব্দ হলো। ঘষটাতে ঘষটাতে ভ্যানের বিশ গজ দূরে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল ট্রাক। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল ভ্যানের দরজা। আপাদমস্তক কালো পোশাকে মোড়া দু'জন মানুষ এক লাফে নেমে এল রাস্তায়। হাতে উদ্যত এম-ফোর অ্যাসল্ট রাইফেল। চেহারা দেখা গেল না, মুখ স্কি-মাস্কে ঢেকে রেখেছে লোকদুটো। অস্ত্র হাতে ছুটে এল ট্রাকের দিকে।

চমকে উঠল টেরেন্স। কাঁপতে থাকা হাত বাড়িয়ে দিল গ্লাভ কম্পার্টমেন্টের দিকে—বিপদ মোকাবেলার জন্য ওখানে একটা পয়েন্ট থারটি এইট ক্যালিবারের স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পিস্তল রেখেছে সে। কিন্তু অস্ত্রটা হাতে পাবার আগেই ঝট্ করে খুলে গেল তার পাশের দরজা। ঘাড় ফিরিয়ে অ্যাসল্ট রাইফেলের কালো ব্যারেল দেখতে পেল টেরেন্স—ঠিক ওর মাথা বরাবর তাক

হয়ে আছে ওটা।

'হ্যাণ্ডস্ আপ!' বিদেশি উচ্চারণে বলে উঠল অস্ত্রধারী।

আস্তে আস্তে দু'হাত তুলল টেরেন্স।

'নেমে এসো নীচে,' বলল লোকটা। 'এখুনি!'

সিটবেল্ট খুলে নড়তে শুরু করল টেরেন্স, কিন্তু তার শ্লথগতি পছন্দ হলো না অস্ত্রধারীর। খপ্ করে ট্রাক ড্রাইভারের শার্ট মুঠো করে ধরল সে, এক টানে বাইরে এনে ফেলল তাকে। ধড়াম করে রাস্তার উপর মুখ থুবড়ে পড়ল টেরেন্স। ককিয়ে উঠল ব্যথায়। ক্ষণিকের জন্য চলৎশক্তি হারাল।

সঙ্গীর উদ্দেশে কী যেন বলতে শুরু করল প্রথম লোকটা, তার এক বর্ণ বুঝতে পারল না টেরেন্স। তবে ভাষাটা চেনা চেনা লাগছে—আরবি বা এই জাতীয় কিছু। টিভিতে শুনেছে। কারা এরা? টেরোরিস্ট? ওর উপরে হামলা করল কেন? টেরেন্স তো স্রেফ একজন মাঝবয়েসী ট্রাক ড্রাইভার বৈ আর কিছু নয়। একেবারেই গুরুত্বহীন ছা-পোষা একজন মানুষ!

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। বুক ধুকপুক করছে ভয়ে। ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তোমরা? আমার কাছে তো...'

'চুপ করো!' গর্জে উঠল টেরোরিস্ট। রাইফেলের বাট দিয়ে সজোরে আঘাত হানল টেরেন্সের তলপেটে।

খাবি খেতে খেতে বসে পড়ল ট্রাক ড্রাইভার। চোখের সামনে জ্বলে উঠেছে লাল-নীল তারা। সেজদার ভঙ্গিতে কুঁজো হয়ে গেল।

দ্বিতীয় টেরোরিস্টকে ট্রাকের পাশে যেতে দেখল সে। হাত দিয়ে তলা থেকে খুলে আনল কী যেন। একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস—দেখামাত্র চিনল টেরেন্স, ওটা একটা ট্র্যাকার! ওকে ট্র্যাক করছিল এরা! কায়দামত নির্জন জায়গায় এসে হামলা করেছে! কিন্তু কেন?

প্রথম টেরোরিস্ট এগিয়ে এল তার দিকে। হাত ধরে হ্যাঁচকা এক টানে দাঁড় করাল। দুই হাত মুচড়ে নিয়ে গেল পিছনে, কবজিদুটো একত্র করে আটকে দিল প্লাস্টিকের জিপলাইন দিয়ে। অত্যন্ত কার্যকর জিনিস, কিছুতেই ছিঁড়বে না। এরপর ধাক্কা দিয়ে টেরেন্সকে ভ্যানের দিকে নিয়ে গেল সে, ওঠাল পিছনে। আরেকটা জিপলাইন দিয়ে এবার দুই গোড়ালি বাঁধা হলো।

কাজ শেষে রাইফেল উঁচু করল প্রথম টেরোরিস্ট। চেঁচিয়ে উঠল, *'আল্লাহু আকবার!'*

দ্বিতীয়জনও তাল মেলাল তার সঙ্গে। *'আল্লাহু আকবার!'*

এরপরেই দুই টেরোরিস্ট উঠে পড়ল দুই গাড়িতে—প্রথমজন ভ্যানে, দ্বিতীয়জন ট্রাকে। প্রায় একই সঙ্গে চালু হলো দুই বাহনের ইঞ্জিন। ভ্যান সরিয়ে জায়গা করে দিল প্রথম টেরোরিস্ট, ট্রাকটা এগিয়ে গেল। ওটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর ভ্যানকে আগে বাড়াল সে। ছুটে চলল উল্টোদিকে।

হতভম্ব হয়ে ভ্যানের মেঝেতে পড়ে আছে টেরেন্স। হাইজ্যাকিঙের শিকার হয়েছে সে... কিন্তু কেন? যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে দুই টেরোরিস্ট—ওর ট্রাকে লাগানো ট্র্যাকিং ডিভাইস, এবং ওদের ঝটিতি কার্যসমাধার কৌশল সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। অথচ এর পিছনে কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছে না টেরেন্স। ট্রাকে যদি সোনাদানা থাকত, তা হলে নাহয় একটা কথা ছিল!

হু হু করে গতি বেড়ে গেল ভ্যানের। গড়িয়ে পিছনের দেয়ালে গিয়ে পড়ল টেরেন্স। ট্রাকের ড্রাইভিং ক্যাবে ওর সেলফোন রয়ে গেছে, কাজেই কারও সাহায্য চাইতে পারছে না। কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসবার চেষ্টা করল, কিন্তু আঁকাবাঁকা পথে ঘন ঘন মোড় নিচ্ছে ভ্যান, তাল হারিয়ে বার বার মেঝের উপর আছড়ে পড়ল সে। বিশ মিনিট পেরুলে ক্লান্ত হয়ে গেল। উঠবার চেষ্টা করল না আর,

পড়ে রইল মেঝেতে। একবার শুধু জিজ্ঞেস করল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে; কিন্তু সে-প্রশ্নের কোনও জবাব দিল না টেররিস্ট।

আরও বিশ মিনিট চলবার পরে গতি কমল ভ্যানের। বাঁক নিয়ে নতুন একটা রাস্তায় নামল গাড়িটা। শুরু হলো ঝাঁকুনি। বুঝতে পারল টেরেন্স, পাকা রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নেমেছে ওরা। পথটা ঢালু, ধীরে ধীরে উপরদিকে উঠছে ভ্যান। একটু যেতেই রাস্তার অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। খানাখন্দে চাকা পড়ায় বার বার লাফিয়ে উঠছে গাড়িটা।

এভাবে আধঘণ্টা এগোবার পর ব্রেক কষল ড্রাইভার। ইঞ্জিন বন্ধ করে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পর পিছনের দরজা খুলল। তার ডান হাতে একটা নাইন মিলিমিটারের বেরেটা দেখতে পেল টেরেন্স, তাক করে রেখেছে ওর দিকে। বাম হাতে শোভা পাচ্ছে একটা ধারালো ছুরি। সাবধানে ছুরি বাড়িয়ে টেরেন্সের পায়ের বাঁধন কেটে দিল সে।

'নামো!' হুকুম এল এরপর।

রক্ত চলাচল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝিঁঝি ধরে গেল পায়ে। ভ্যান থেকে নামতেই তাল হারাল টেরেন্স। হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে এবং শরীরের একপাশে লাথি খেল।

'ওঠো বলছি!' কর্কশ গলায় বলল টেররিস্ট।

কাঁপতে কাঁপতে হাঁটুতে ভর দিয়ে নিলডাউনের ভঙ্গিতে উঠে বসল টেরেন্স। চারপাশে নজর বোলাল। গাছপালা আর ঝোপঝাড় ছাড়া আর কোনও কিছু দেখা যাচ্ছে না। জঙ্গলে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। জায়গাটা কোথায় আন্দাজ করবার চেষ্টা করল। সম্ভবত জর্জ ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ফরেস্ট।

আচমকা শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল একটা স্রোত নেমে গেল তার। এখানে কেন ওকে আনা হয়েছে, আন্দাজ করতে পারছে।

নিশ্চয়ই খুন করবার জন্য!

'উঠে দাঁড়াও!' গমগম করে উঠল টেরোরিস্টের গলা। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে মুখোশ পরা মুখটাকে।

গলা শুকিয়ে গেল টেরেন্সের, কিন্তু চেহারায় ভয়ের ছাপ ফুটতে দিল না। আর যা-ই হোক, কাপুরুষ নয় সে, একটা সন্ত্রাসীর কাছে প্রাণভিক্ষা চাইবে না। যেভাবে ছিল, সেভাবেই রইল ও। উদ্ধত গলায় বলল, 'দাঁড়াব না! যা খুশি করো!'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে পা চালাল টেরোরিস্ট, টেরেন্সের বুকের উপর পড়ল লাথি। ছিটকে পিছনের একটা গর্তে পড়ে গেল সে, গড়ান খেয়ে চলে গেল গর্তের তলায়। সোজা হবার চেষ্টা করতেই গুলি করল টেরোরিস্ট। বাম কানের উপর দিয়ে যেন আগুনের একটা হলকা বয়ে গেল, ধপাস করে পড়ে গেল টেরেন্স। টের পেল, মুখের বাম পাশটা ভিজে গেছে রক্তে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বেঁচে আছে সে! নিশ্চয়ই তাড়াহুড়োয় নিশানা মিস করেছে টেরোরিস্ট। আবার কি গুলি চালাবে? জানে না টেরেন্স। মুখ থুবড়ে মড়ার মত পড়ে রইল গর্তের তলায়। কপাল ভাল হলে দ্বিতীয়বার গুলি না করেই চলে যেতে পারে লোকটা।

তা-ই ঘটল। একটু পরেই ভ্যানের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল টেরেন্স। ইঞ্জিন চালু হলো। শুকনো মাটিতে চাকার শব্দ করে মুখ ঘোরাল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল সেই আওয়াজ।

নীরবতা নেমে আসার পরেও কয়েক মিনিট নিস্তেজ পড়ে রইল টেরেন্স। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল। নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মুখের একটা পাশ রক্তে রঞ্জিত, তবে বেঁচে গেছে সে। সম্ভবত রক্ত দেখে ওকে মৃত ভেবে নিয়েছে টেরোরিস্ট।

হামাগুড়ি দিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল সে। মাথা টনটন করছে ব্যথায়। একটু সুস্থির হবার পর উঠে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে

শার্ট ছিঁড়ে বেঁধে নিয়েছে মাথা। দুর্বল পায়ে রওনা হলো সাহায্যের আশায়।

হাঁটতে হাঁটতে একটা ব্যাপারই শুধু ঘুরপাক খেতে থাকল ওর মাথায়। টেরোরিস্টরা হাইজ্যাকিঙের জন্য ওর ট্রাকটাকেই বেছে নিল কেন? ট্রাকে রাসায়নিক সার থাকলে নাহয় একটা কথা ছিল—ওই জিনিসের সাহায্যে টেরোরিস্টরা বোমা বানাতে পারে। কিন্তু তা তো ছিল না!

বিস্ময়ের সীমা রইল না টেরেন্সের, কারণ ওর ট্রাকে ছিল স্রেফ একশো কিউবিক ফুট *সওডাস্ট*... মানে কাঠের গুঁড়ো। সেগুলো কী কাজে লাগবে ওদের?

ঊনত্রিশ

বাথরুমটা বিশাল, বাথটাব-সহ অন্যান্য আধুনিক ফিটিংসে সজ্জিত। শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে শরীর ভেজাচ্ছে রেমি। চোখ বন্ধ করে উপভোগ করছে নগ্ন ত্বক বেয়ে গড়িয়ে নামতে থাকা গরম পানির স্পর্শ। গা থেকে ধোঁয়ার মতো বাষ্প উঠছে। দেখতে দেখতে উজ্জ্বল লালচে হয়ে উঠল গায়ের চামড়া; গত কয়েক ঘণ্টার সমস্ত ক্লান্তি আর উত্তেজনা ধীরে ধীরে যেন ধুয়ে গেল, সেই সাথে ভালো লাগার একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল দেহমনে।

হিথ্রো এয়ারপোর্ট সংলগ্ন ম্যারিয়ট হোটেলে দুটো কামরা নিয়েছে ওরা—একটা সিঙ্গেল, অন্যটা ডাবল। সিঙ্গেলটা দেয়া হয়েছে ওকে, ডাবলটা শেয়ার করছে রানা ও মুরল্যাণ্ড। ভিক্টোরিয়া

স্টেশন থেকে সরাসরি এখানে চলে এসেছে ওরা। মুরল্যাণ্ড আগেই এসেছে, তবে ওর সঙ্গে এখনও কথা বলা হয়নি ওদের। কামরায় এসেই যার যার বাথরুমে ঢুকেছে রানা আর রেমি।

সময় নিয়ে গোসল করল রেমি। শরীর ঝরঝরে হয়ে গেলে বেরুল বাথরুম থেকে। মাথায় প্যাঁচানো তোয়ালে মাত্র খুলেছে, এমন সময় ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন।

'আমি,' রিসিভার তুলতেই শোনা গেল রানার কণ্ঠ। 'রেডি হয়ে চলে এসো আমাদের কামরায়। ডিনার আনতে বলেছি রুম সার্ভিসকে। খেতে খেতে কথা হবে।'

'দশ মিনিটের ভিতর আসছি,' জানাল রেমি।

সাদা রঙের একটা শার্ট আর সুতি ব্যাগি প্যান্ট পরল রেমি, উপরে চড়াল একটা সোয়েটার। মুখে হালকা মেকাপ মেখে চুল আঁচড়াল, তারপর স্যাণ্ডেল পরে বেরিয়ে পড়ল রানা ও মুরল্যাণ্ডের কামরার উদ্দেশে।

ইতিমধ্যে সার্ভ করা হয়েছে ডিনার। বড় একটা টেবিল পেতে তাতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অন্তত দশ পদের ডিশ। সেই সঙ্গে ড্রিঙ্ক তো আছেই। দেখে চক্ষু চড়কগাছ হলো রেমির। বিস্মিত গলায় বলল, 'সর্বনাশ! এ-সব কী! পুরো কিচেন তুলে নিয়ে এসেছেন নাকি?'

'অর্ডারের দায়িত্বটা ববিকে দিয়েছিলাম,' চেয়ার টেনে ওকে বসতে সাহায্য করল রানা। 'ও যে ভোজনরসিক, সে-কথা মনে ছিল না।'

'ভদ্র ভাষায় আমাকে খোঁচা মারল, দেখলেন?' গোমড়ামুখে বলল মুরল্যাণ্ড। 'পেটুক না বলে ভোজনরসিক বলল... ভাবছে আমি তফাৎটা বুঝতে পারব না।'

'ওকে দোষ দিতে পারেন?' হাসল রেমি। 'এতসব খাবার...'

'আপনিও ওকে সাপোর্ট দিচ্ছেন?' আহত গলায় বলল

মুরল্যাণ্ড। 'কেন এত খাবার এনেছি বুঝতে পারছেন না? পরীক্ষিত সত্য—পেটে খেলে পিঠে সয়। যে-ধকলটা গেছে...'

'খুব ধকল গেছে বুঝি?' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'আমাদের চেয়েও বেশি? কী ঘটেছিল, জানতে পারি?'

'আগে খাওয়া শুরু করো। সামনে খাবার রেখে কথা বলতে নেই।'

হাসিমুখে প্লেট টেনে নিল ওরা। খেতে শুরু করল। টেবিল খালি হতে সময় লাগল মাত্র বিশ মিনিট। সবশেষে ড্রিঙ্কের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে মুরল্যাণ্ড বলল, 'দেখলে তো? কোথায় এত খাবার? সবই তো শেষ।'

'নাইণ্টি পার্সেণ্ট তো আপনিই সাবাড় করলেন!' ফোড়ন কাটল রেমি।

রানা বলল, 'অসুবিধে নেই। বিলের নাইণ্টি পার্সেণ্টও ও-ই পরিশোধ করবে। আমি বলি কী... ববি... বাকি দশ পার্সেণ্ট আর আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ কী? পুরোটাই তুমি দিয়ে দাও।'

'এ ভারি অন্যায়,' বলল মুরল্যাণ্ড, 'খেলাম তিনজন, অথচ বিল দেব একা আমি?'

'ধরে নাও আমরা তোমার গেস্ট।'

আরও কয়েক মিনিট ঠাট্টা-মশকরা চলল। রুম সার্ভিসের ওয়েইটার এসে খালি বাসন-কোসন নিয়ে যাবার পর শুরু হলো আসল আলোচনা। যার যার অভিজ্ঞতা খুলে বলল ওরা। প্রথমে মুরল্যাণ্ড, তারপর রানা আর রেমি।

'আপনি ঘোড়ায় চড়তে ভয় পাচ্ছিলেন?' রেমির দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'আপনি না গ্রাম্য এক খামারে বড় হয়েছেন? ওখানে ঘোড়া ছিল না?'

'ছিল,' ইতস্তত করে বলল রেমি। 'ছোটবেলায় একবার সেই ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মাথা ফেটে গিয়েছিল আমার। তিন

সপ্তাহ হাসপাতালে পড়ে ছিলাম। সেই থেকে ঘোড়া আমার দু'চোখের বিষ!'

'ওই ঘোড়াই কিন্তু আজ প্রাণ বাঁচিয়েছে আমাদের,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'আশা করি এবার তোমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাবে।'

'উঁহুঁ। আগামীতে আবার যদি এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়ি, প্রার্থনা করব যাতে ঘোড়ার আস্তাবলের বদলে ধারেকাছে গাড়ির কোনও গ্যারাজ থাকে।'

রেমির কথা শুনে হেসে ফেলল রানা আর মুরল্যাণ্ড।

'এনিওয়ে,' প্রসঙ্গ বদলাল রেমি। 'আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী? এগোবার তো কোনও রাস্তা দেখছি না। জিয়োলেবটাও খুইয়েছি।'

'ওটা ফিরে পাওয়াই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় প্রায়োরিটি,' বলল রানা। 'ডিভাইসটা ছাড়া আর্কিমিডিসের ধাঁধা সমাধান করা যাবে না।'

'আরেকটা বানিয়ে নেয়া যায় না?'

'সম্ভব নয়। অমন জটিল ডিভাইস তৈরি করতে অনেক সময় দরকার। বানাবার ইন্সট্রাকশনও নেই আমাদের কাছে। গ্যারেটের কাছে চাইতে হবে। ও যদি শোনে, মায়া ওটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, রেগে গিয়ে কিছু একটা ঘটিয়ে বসতে পারে। কাজেই ওকে আমি এ-ব্যাপারে কিছুই জানাতে চাই না।'

'তা হলে একটাই উপায় দেখছি,' চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল মুরল্যাণ্ড। 'মায়ার এস্টেটে হানা দিয়ে ওটা চুরি করতে হবে।' চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল ওর। 'ইন্টারেস্টিং।'

'সেটাও সম্ভব না,' রানা বলল। 'আজ ও ইংল্যাণ্ড থেকে চলে যাচ্ছে। জিয়োলেবটাও নিচ্ছে সঙ্গে।'

ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড। 'সেটা তুমি কী করে জানলে?'

হাসল রানা। 'মায়া ভেবেছে আমরা ইটালিয়ান বুঝি না।

আমাদের সামনেই ওর বডিগার্ডকে বলছিল—জিয়োলেবটা ওর গাড়ির ট্রাঙ্কে রাখতে; আজ রাতে মিউনিখে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাবে।'

'মিউনিখ? মানে জার্মানি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'খারাপ খবর,' গম্ভীর হয়ে গেল মুরল্যাণ্ড। 'ওকে ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে যাবে। জিয়োলেবটাও।'

'এতটা হতাশ হবার কিছু নেই,' রানা বলল। 'মায়ার বডিগার্ডের ফোনটায় ল্যারিকে ফোন করে ওটা ওর অফিসে লুকিয়ে রেখে এসেছি আমি। ল্যারিকে বলেছি যতক্ষণ ওটা চালু থাকে, সবকিছু রেকর্ড করে রাখতে। এক ধরনের বাগিং আর কী। দেখা যাক, ওখান থেকে কিছু পাওয়া যায় কি না। বলা যায় না, মায়ার ট্র্যাভেল প্ল্যানের খবর পেয়ে যেতে পারি।'

'এটা একটা কাজের কাজ করেছ!' খুশি হয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড।

'ওখান থেকে যে-ট্যাবলেটটা চুরি করে আনলে, সেটার ব্যাপারে কী করবে?' জিজ্ঞেস করল রেমি। 'তা ছাড়া পার্থেননেও যাওয়া দরকার আমাদের...'

'ওসব পরে দেখা যাবে,' বলল রানা। 'আগে জিয়োলেব উদ্ধার করা জরুরি। ল্যারির সঙ্গে কথা বলব এখুনি। দেখা যাক ও ডিভাইসটার ট্র্যাকার সিগনাল ডিকোড করতে পেরেছে কি না।'

'তার আগে গ্যারেটের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার,' ঘড়ি দেখে বলল রেমি। 'আমাদের ডেইলি কন্ট্যাক্টের সময় হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে। তা হলে ওর সঙ্গেই আগে কথা বলছি।' সেলফোন বের করল রানা। ওর সেটটা পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। হোটেলে আসার পথে নতুন একটা সেট কিনে নিয়েছে। কপাল ভাল, সিমকার্ডের কিছু হয়নি।

'কী বলবে ওকে?' জিজ্ঞেস করল রেমি। 'মায়ার সঙ্গে দেখা হবার কথা?'

'না। সেটা ওর জানার প্রয়োজন নেই। শুধু আমরা কতটুকু এগিয়েছি, তা-ই বলব।'

গ্যারেটের নাম্বারে ডায়াল করে স্পিকার অন করল রানা। রিং হতে না হতেই কল রিসিভ করল গ্যারেট। বলল, 'বাহ্, একেবারে সময়মত রিং করেছ দেখছি, রানা। তোমাদের কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, 'র‍্যাচেল আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের খবর বলো।'

'বহাল তবিয়তে আছে ওরা। আমাদের কথা শেষ হবার পর ওদের ভিডিও পাবে। কদ্দূর এগোলে তা-ই বলো।'

মোমফলক আর পার্থেননের ব্যাপারে গ্যারেটকে সংক্ষেপে জানাল রানা। এস্টেট আর মিউজিয়ামের ঘটনা এড়িয়ে গেল। ওসব গ্যারেটের জানার প্রয়োজন নেই।

'হুমম,' বলল গ্যারেট। 'এবার কী করবে?'

'মিউনিখে যাব বলে ঠিক করেছি আমরা,' বলল রানা। 'ওখানে একটা সূত্র পাব বলে আশা করছি।'

'গুড। কাজ চালিয়ে যাও। আগামীকাল আবার কথা হবে।'

'আমাদের ভিডিও?'

'ইমেইল চেক করো।'

ল্যাপটপ খুলে ইমেইল অ্যাকাউন্টে ঢুকল রানা। দুটো ভিডিও ফাইল পেল। প্রথমটা র‍্যাচেলের। চেয়ারে বসিয়ে কোলের উপর ফেলে রাখা হয়েছে *ইউএসএ টুডে* পত্রিকার একটা সংখ্যা। তাতে আজকের তারিখ ছাপা। নার্ভাস দেখাল র‍্যাচেলকে, মুখ শুকিয়ে গেছে। তবে অক্ষত এবং সুস্থ মনে হলো।

বোনের বন্দিদশা দেখে বুক হু হু করে উঠল রেমির। উদ্গত

আবেগ চাপা দেবার জন্য কামড়ে ধরল ঠোঁট। ওর বাহুতে হাত রেখে সান্ত্বনা দিল রানা, 'শান্ত হও। ওকে উদ্ধার করব আমরা।'

এরপর দ্বিতীয় ভিডিওটা ওপেন করল ও। র‍্যাচেলের মত অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে দেখা গেল চেয়ারে বসা অবস্থায়। কোলের উপর পত্রিকা। চট্ করে *ইউএসএ টুডে*-র ওয়েবসাইট দেখে নিল রানা—নিশ্চিত হয়ে নিল পত্রিকাটা সত্যিই আজকের কি না।

হঠাৎ ভিডিওতে একটা বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ল ওর। অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে চোখ পিট পিট করছেন অ্যাডমিরাল, যেন মুখের উপর পড়া আলো সহ্য করতে পারছেন না। চোখের কোনও সমস্যা? ভাল করে দেখল ও। আচমকা টের পেল, সমস্যা নয়... ইচ্ছেকৃতভাবেই চোখ পিট পিট করছেন তিনি। মোর্স কোডের মাধ্যমে সঙ্কেত পাঠাচ্ছেন!

মুরল্যাণ্ডও খেয়াল করেছে। উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকল, 'রানা...'

'হ্যাঁ,, দেখতে পাচ্ছি,' শান্ত গলায় বলল রানা। মনোযোগ দিল সঙ্কেতটা বোঝায়।

'কীসের কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'মোর্স কোড ব্যবহার করছেন অ্যাডমিরাল,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'চোখের সাহায্যে।'

'কোনও মেসেজ দিচ্ছেন?' রেমিও উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'কী সেটা?'

কাগজে সঙ্কেতটা লিখে ফেলেছে রানা। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল লেখার দিকে। দুটো অক্ষর আর একটা সংখ্যা। অর্থহীন।

'কী বলছেন উনি?' আবার জানতে চাইল রেমি।

কাগজটা দেখাল রানা। তাতে লেখা: *এস আর ৯০।*

'মানে কী এর?' মুরল্যাণ্ডের কপালেও ভাঁজ পড়ল।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা বিরাজ করল। তারপরেই রেমি বলল,

'এস আর ৯০! মানে স্টেট রোড ৯০! আমাদেরকে ঠিকানা দিচ্ছেন ভদ্রলোক!'

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রানা। 'স্টেট রোড মানে হাইওয়ে... আর একেকটা হাইওয়ের দৈর্ঘ্য হয় কয়েকশো মাইল। এত লম্বা একটা এলাকায় কাউকে খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই অন্য কিছুর কথা বলছেন।'

'ল্যাপটপটা আমাকে দাও,' বলে হাত বাড়াল মুরল্যাণ্ড। 'দেখি গুগল থেকে কিছু পাওয়া যায় কি না।'

কম্পিউটারটা ওর দিকে ঠেলে দিল রানা। খানিক পরে মুরল্যাণ্ড বলল, 'ওরে বাবা! এ দেখি ডেঞ্জারাস ব্যাপার!'

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এস আর ৯০-এর সার্চে পাওয়া প্রথম এন্ট্রিই বলছে—ওটা স্ট্রনটিয়াম-৯০ এর সংক্ষিপ্ত রূপ।'

স্থির হয়ে গেল রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন নিজের মুক্তির ব্যাপারে কোনও সূত্র না দিয়ে স্ট্রনটিয়ামের সঙ্কেত একটা কারণেই শুধু দিতে পারেন। মুরল্যাণ্ডের চেহারাতেও মেঘ জমেছে।

'কী ব্যাপার?' ওদের পরিবর্তন লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল রেমি। 'স্ট্রনটিয়াম-৯০ মানে কী?'

'মারাত্মক রেডিও-অ্যাকটিভ একটা আইসোটোপ,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল বলতে চাইছেন, গ্যারেটের হাতে স্ট্রনটিয়াম-৯০ আছে।'

'রেডিয়ো-অ্যাকটিভ? অমন জিনিস গ্যারেট পাবে কোথায়?'

'আজকাল ব্ল্যাক মার্কেটে সবই পাওয়া যায়,' বলল মুরল্যাণ্ড। ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে ইশারা করল। 'এখানে বলছে, নিউক্লিয়ার ফিউয়েলের উচ্ছিষ্টের মাঝে থাকে স্ট্রনটিয়াম-৯০। পুরনো আমলে সোভিয়েত থারমাল জেনারেটরে জিনিসটা পাওয়ার

সোর্স হিসেবে ব্যবহার করা হতো।'

'যদি গ্যারেটের হাতে স্ট্রনটিয়াম থেকেও থাকে, সমস্যা কোথায়?'

'শখের বশে কেউ স্ট্রনটিয়াম জোগাড় করে না, রেমি,' বলল রানা। 'তখনই জোগাড় করে, যখন সে রেডিয়োলজিক্যাল ওয়েপন তৈরি করতে চায়।'

'রেডিয়োলজিক্যাল বলতে কী বোঝাচ্ছ? নিউক্লিয়ার?'

'পুরোপুরি নয়, কাছাকাছি একটা কিছু—সহজে তৈরি করা যায়। কনভেশনাল একটা বোমার মধ্যে রেডিয়োঅ্যাকটিভ আইসোটোপ মেশানো হয়। নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশনের মত ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা থাকে না ওটার, তবে ফলআউট ডাস্টের মাধ্যমে বিশাল এলাকা তেজস্ক্রিয় করে ফেলা যায়। মাঝারি আকারের একটা বোমা ফাটিয়েই বিশাল একটা শহরকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মানুষের বসবাসের অযোগ্য করে ফেলা সম্ভব।'

'অ্যাডমিরাল বলতে চাইছেন, গ্যারেটের হাতে অমন ভয়ঙ্কর একটা অস্ত্র আছে?' দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল রেমির।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'ওহ্ গড!' আঁতকে উঠল রেমি।

ত্রিশ

পিনপতন নীরবতা নেমে এসেছে হোটেল-কক্ষে। কেউ কোনও কথা বলছে না। ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে শুরু করেছে, শত্রু

হিসেবে অ্যান্থনি গ্যারেট কতখানি ভয়ঙ্কর। স্রেফ স্বর্ণলোভী ক্রিমিনাল নয় সে, বরং রেডিয়োলজিক্যাল বোমাধারী একজন টেরোরিস্ট! সে-কারণে হঠাৎ করেই পরিস্থিতি অনেক জটিল হয়ে পড়েছে। এখন স্রেফ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বা র‍্যাচেল নয়, বরং লক্ষ-কোটি মানুষের জীবন পড়েছে হুমকির মুখে—সংখ্যাটা নির্ভর করছে কোন্ শহরের উপর বোমাটা ব্যবহার করে গ্যারেট, তার উপর।

বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে গেলে মুরল্যাণ্ড বলল, 'আমার মনে হয় ব্যাপারটা এখুনি এফবিআই-কে জানিয়ে দেয়া দরকার।'

'না,' দ্বিমত প্রকাশ করল রানা। 'তাতে অযথা প্যানিক সৃষ্টি হবে। এফবিআই পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে উঠবে গ্যারেটকে অ্যারেস্ট করবার জন্য। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বা র‍্যাচেলের প্রাণের পরোয়া করবে না। তা ছাড়া... আমরা তো শিয়োর নই। স্রেফ অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলছি। এস আর ৯০-এর আরও অনেক রকম অর্থ হতে পারে। হয়তো কারও নাম বা ঠিকানা... বোমাই হতে হবে, এমন তো কোনও কথা নেই।'

'হুম, এটা অবশ্য ঠিক বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল রেমি। 'রেডিওলজিক্যাল বোমা ব্যবহারের পিছনে গ্যারেটের তো কোনও মোটিভও নেই। যদি টেরোরিজমই ওর উদ্দেশ্য হয়, তা হলে আমাদেরকে খামোকা মাইডাস চেম্বারের পিছনে ছোটাচ্ছে কেন?'

'এমন হতে পারে না, চেম্বারটা খুঁজে পাবার পর ওখানে বোমাটা ফাটাবার প্ল্যান করেছে সে?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ওই যে... জেমস বণ্ডের ভিলেন গোল্ডফিঙ্গারের মত। ফোর্ট নক্সের ভিতরে অ্যাটম বোমা ফাটিয়ে সমস্ত সোনা রেডিয়েটেড করে দিতে চেয়েছিল সে।'

'ওভাবে নিজের জমা করা সোনার দাম বাড়াতে চেয়েছিল গোল্ডফিঙ্গার,' বলল রানা। 'আমার তো মনে হয় না, ওর মত

সোনার স্টক আছে গ্যারেটের।'

'তাই বলে এত বড় একটা ব্যাপার কাউকে জানাব না আমরা?' প্রতিবাদ করল মুরল্যাণ্ড।

'তা বলছি না। জানাব তো বটেই, তবে সেটা শুধুমাত্র মি. রেডক্লিফকে। বিকল্প ব্যবস্থায় খোঁজখবর নেবার ক্ষমতা আছে তাঁর... প্যানিক সৃষ্টি না করে। সেটাই তো চাই আমরা, তাই না?'

'কিন্তু একটা বিষয় তুমি ভুলে যাচ্ছ—গ্যারেটের হাতে যদি সত্যিই স্ট্রনটিয়াম-৯০ থাকে, আর অ্যাডামিরাল হ্যামিলটন সেটা দেখে ফেলে থাকেন... ওঁকে কিছুতেই বাঁচতে দেবে না শয়তানটা। আমরা ওর কথামত যা-ই করি না কেন।'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল রেমির। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে খুন করবে গ্যারেট, অথচ র‍্যাচেলকে বাঁচিয়ে রাখবে... তা হতে পারে না!

'সবকিছুই মাথায় আছে আমার,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'তবে এখুনি হতাশ হবার কোনও কারণ দেখছি না। রণকৌশল সামান্য পাল্টাতে হবে আমাদেরকে। জিয়োলেবটা ফিরে পেলে ডিফেন্সের বদলে অফেন্সে চলে যাব।'

'অফেন্স মানে?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যাণ্ড।

'সিম্পল। এরপর যখনই গ্যারেটের সঙ্গে দেখা হবে, ওকে আটক করব আমরা। এরপর অদল-বদল হবে—গ্যারেটের বদলে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন আর র‍্যাচেল। তারপর এফবিআই-কে ডেকে এনে ওকে ধরিয়ে দেব।'

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল মুরল্যাণ্ডের। 'এতক্ষণে একটা পছন্দসই টেকনিকের কথা শোনালে, বন্ধু!'

'কী বলছ এ-সব!' আঁতকে উঠল রেমি। 'দোহাই লাগে, অমন কিছু করতে যেয়ো না। যদি ব্যর্থ হও, সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাচেলকে খুন করবে গ্যারেট। অ্যাডমিরালকেও।'

'ব্যর্থ হব না আমরা,' জোর গলায় বলল রানা। 'আঁটঘাট বেঁধেই কাজে নামব। আমাদের উপর আস্থা রাখো। এ-ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা আছে ববির ও আমার।'

পালা করে ওকে আর মুরল্যাণ্ডকে দেখল রেমি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'কিছুতেই তোমাদের ফেরানো যাবে না, তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'ব্যাটাকে এখুনি টোপ দিয়ে নিয়ে এলে কেমন হয়?' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছি বললেই তো ছুটে আসবে নেপলসে। সত্যি সত্যি সমাধানের তো প্রয়োজন নেই। অযথা খাটনি।'

'প্রয়োজন আছে,' বলল রানা। 'শুধু সমাধান করেছি শুনেই সন্তুষ্ট হবে না গ্যারেট। নানা ধরনের প্রশ্ন করবে নিশ্চিত হবার জন্য। মনগড়া জবাব দিতে গিয়ে ধরা পড়ে যেতে পারি। গ্যারেট আর যা-ই হোক, বোকা নয়।'

'কী করতে চাও তা হলে?'

'যা করছিলাম। জিয়োলেবটা উদ্ধার করব মায়ার হাত থেকে। তারপর যাব পার্থেননে।'

নুমা হেডকোয়ার্টারে ফোন করল রানা। প্রথমে জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে কথা বলে অনুসন্ধানের অগ্রগতি জানাল। স্ট্রনটিয়ামের ব্যাপারে আশঙ্কার কথাও জানাল। গোপনে খোঁজ নেবেন বলে কথা দিলেন রেডক্লিফ। এরপর ল্যারি কিং-কে রিং করল ও। ইমেইলে মায়ার বডিগার্ডের ফোন থেকে পাওয়া রেকর্ডিং ওর কাছে পাঠাতে বলল তাকে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে এসে গেল ফাইলটা। ওটা ল্যাপটপে ডাউনলোড করে নিল রানা। তারপর প্লে করল। রেকর্ডিঙের মান খুব একটা ভাল নয়, তবে পাঠাবার আগে ভয়েস ফিল্টারিঙের সফটওয়্যারের সাহায্যে বাজে শব্দগুলো সরিয়ে দিয়েছে ল্যারি।

প্রায় দেড় ঘণ্টা চলেছে রেকর্ডিং, তারপর ব্যাটারি ফুরিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে সেলফোন। এর মধ্যে মাত্র একবার রয়েছে মানুষের কণ্ঠস্বর। রানা আর রেমির পিছনে ব্যর্থ ধাওয়া শেষে অফিসে দশ মিনিটের জন্য ফিরে এসেছিল মায়া, তখন অনুচরদের সঙ্গে কথা বলেছে... তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে তার কণ্ঠে।

আলাপচারিতার অংশটা কয়েকবার শুনল রানা আর রেমি। মুরল্যাণ্ড ইটালিয়ান বোঝে না, অধৈর্য হয়ে উঠল। জানতে চাইল কী বলা হচ্ছে অডিওতে।

খাতায় মায়ার সমস্ত কথা টুকে নিয়েছে রেমি। খানিক পরে তাতে চোখ বুলিয়ে বলল, 'যদ্দূর বুঝতে পারছি, শুরুতে অনেকক্ষণ গুণ্ডাগুলোকে গালাগাল দিয়েছে মায়া—আমাকে আর রানাকে আটকাতে না পারার জন্য। ও শপথ করেছে, অফিসে ভাঙচুর, আর মোমের ট্যাবলেটটা চুরি করায় আমাদেরকে শাস্তি দিয়ে ছাড়বে। তারপর ওর এক সহকারী জানতে চেয়েছে, তা হলে কি ম্যাডাম আজ রাতে রওনা হচ্ছেন না? মায়া তখন টিকেট বদলাতে বলেছে—রাতের টিকেটের বদলে সকালের টিকেট। সাড়ে আটটায়।

'"আমার *ফেরারি* গাড়িটা আগেই পাঠিয়ে দিয়ো," বলেছে ও। "আমি ব্রাসেলসে নেমেই যেন ওটাকে রেডি অবস্থায় পাই। ডিয়েটজ্‌কে ফোন করে দাও, বলবে—*গ্রেইডেল*-এ পৌঁছুতে বিকেল চারটে বেজে যাবে আমার। মিটিংটা যেন তার পরে রাখে। আলোচনার জন্য বিশ মিনিট পেলেই আমার চলবে। ক্লিয়ার?"'

খাতা বন্ধ করে মুখ তুলল রেমি। 'কিছু বুঝতে পারলে?'

'ব্রাসেলসে যাচ্ছে মায়া,' চিন্তিত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু কেন? ওর তো মিউনিখে যাবার কথা।'

'হয়তো যাত্রাবিরতি নিচ্ছে ওখানে,' অনুমান করল রেমি।

'কেন? বিমানে চেপে একটানে মিউনিখ যাওয়া সম্ভব।'

রানার সামনে থেকে ল্যাপটপটা টেনে নিল মুরল্যাণ্ড। খটখট করে টাইপ করল কিছু। তারপর বলল, 'সকাল সাড়ে আটটায় লণ্ডন থেকে ব্রাসেলস বা মিউনিখের কোনও ফ্লাইট নেই। তবে ট্রেন আছে—*ইউরোস্টার*। হাই স্পিড চানেল ট্রেন। সেইন্ট প্যানক্রাস থেকে ছাড়ে।'

'তা হলে ওটাতে চড়েই ব্রাসেলসে যাচ্ছে ও,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'ওখান থেকে সড়কপথে মিউনিখ যাবে। এ-কারণেই গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলেছে ব্রাসেলসে। ওই গাড়ির ট্রাঙ্কে রেখেছে জিয়োলেবটা। ববি, গ্রেইডেল বা ডিয়েটজের ব্যাপারে কিছু জানা যায় কি না দেখো।'

ল্যাপটপের কি-বোর্ডে নেচে বেড়াল মুরল্যাণ্ডের আঙুল। খানিক পরে বলল, 'ডিয়েটজ্‌কে পাচ্ছি না, তবে গ্রেইডেল একটা জার্মান রিয়াল-এস্টেট ব্রোকারেজ ফার্ম। হেডকোয়ার্টার মিউনিখে। ডিয়েটজ্ হয়তো ওখানে কাজ করে।'

'খুব শীঘ্রি সেটা জানা যাবে। বোর্স্টের ব্রোকারেজ সম্পর্কে কী পাচ্ছ ইন্টারনেটে।'

'তেমন কিছু না। সবই রুটিন। ইন্টারেস্টিং তথ্য বলতে একটাই দেখতে পাচ্ছি—ওদের মিউনিখ হেডকোয়ার্টারে সম্প্রতি একটা রোবোটিক পার্কিং গ্যারাজ উদ্বোধন করা হয়েছে।'

'ওটা আবার কী জিনিস?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'রোবোটিক মেকানিজমের সাম্প্রতিকতম উৎকর্ষ বলতে পারেন। বহুতল-বিশিষ্ট স্ট্রাকচারের ভিতরে অটোমেটিক পার্কিং। গাড়ি নিয়ে স্রেফ একটা মুভেবল প্ল্যাটফর্মে রাখতে হবে আপনাকে। এরপর প্ল্যাটফর্মটা নিজেই খালি জায়গা খুঁজে নিয়ে আপনার গাড়িটা রেখে দেবে। পরে আবার বেরও করে আনবে।'

'পার্কিং গ্যারাজ?' চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল রানার।

হাসল মুরল্যাণ্ড। 'আমি যা ভাবছি, তুমিও সম্ভবত একই কথা ভাবছ। তাই না?'

'হ্যাঁ। মিটিঙে যাবে মায়া। গাড়ি থাকবে গ্যারাজে। ট্রাঙ্ক থেকে যদি জিয়োলেবটা বের করে না নিয়ে থাকে, ওখান থেকেই ওটা সরিয়ে নিতে পারি আমরা।'

'গুড আইডিয়া। কখন যেতে চাও মিউনিখে? আজ, নাকি আগামীকাল?'

'আজ অনেক ধকল গেছে আমাদের সবার উপর দিয়ে। রাতটা বিশ্রাম নেয়া যাক। আগেভাগে মিউনিখে গিয়ে বসে থাকবার কোনও প্রয়োজন নেই। কাল বিকেলের আগে ওখানে পৌঁছুচ্ছে না মায়া।' রেমির দিকে ফিরল রানা। 'ট্যাবলেটের পাঠোদ্ধারও আজ রাতে করবার দরকার নেই। এখান থেকে গিয়েই ঘুমিয়ে পড়ো। ঠিক আছে?'

উঠে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড। 'আমি তা হলে পাইলটকে বলে দিচ্ছি, ফিউয়েল নিয়ে যেন সকাল আটটায় রেডি রাখে জেট। আটটায় রওনা দিতে পারলে দশটা নাগাদ পৌঁছে যাব মিউনিখে। কারও আপত্তি আছে?'

মাথা নাড়ল রানা ও রেমি। ওরাও উঠে দাঁড়াল।

'চলো, তোমাকে রুমে পৌঁছে দিই,' রেমিকে প্রস্তাব দিল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রেমি। দু'জনে বেরিয়ে এল করিডোরে। নিঃশব্দে হাঁটতে থাকল। রেমিকে ঠোঁট কামড়ে ধরতে দেখল রানা, কান্না চাপা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

'কিচ্ছু ভেবো না,' নরম গলায় বলল রানা, 'র‍্যাচেলকে উদ্ধার করব আমি। কথা দিলাম!'

ম্লান একটু হাসল রেমি। 'কথা দিতে হবে না। আমি জানি, তুমি চেষ্টার ক্রুটি করবে না। তারপরেও... মন মানছে না। কারণ

যতই সান্ত্বনা দাও, আমি বুঝতে পারছি ওকে জীবন্ত ফিরে পাবার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'মাথায় এ-ধরনের চিন্তাকে ঠাঁই দিয়ো না। স্রেফ সাহস ধরে রাখো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'এসব তোমার জন্য নতুন নয়, রানা। তাই এমন কথা তুমি বলতে পারছ। কিন্তু আমি তো কোনোদিন এমন কোনও পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি!'

'আমিও তো কোনও একদিন প্রথমবারের মত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারব না কেন?'

'আমি সে-কথা বলছি না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। 'আসলে, র‍্যাচেলের কথা ভাবলেই... ও কেন আইন পড়ছে, জানো? অসহায় মানুষকে সাহায্য করবার জন্য... ওদেরকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেবার জন্য!'

'আশা করি ও সফল হবে।'

'আমার পয়েন্টটাই তুমি ধরতে পারোনি, রানা। অপরাধীদের ঘৃণা করে র‍্যাচেল। ওকে বাঁচাতে গিয়ে আমরা যদি গ্যারেটকে বোমা ফাটাতে দিই, নিরীহ মানুষ হত্যা করতে দিই... ও কোনোদিন আমাকে ক্ষমা করবে না। তারচেয়ে ও নিজের প্রাণ দিয়ে...'

রেমির হাতে হাত রাখল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনও একই আদর্শের মানুষ। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ওঁদেরকে বাঁচাবার চেষ্টা আমরা করব না। তা ছাড়া... এখনও ওঁদের আশা ছেড়ে দেবার মত কিছু ঘটেনি। এখনও সব কূল রক্ষা করা সম্ভব।'

একটু যেন আশান্বিত হয়ে উঠল রেমি। 'জানি না কোত্থেকে এত আত্মবিশ্বাস পাচ্ছ তুমি, তবু... ধন্যবাদ, রানা।'

কামরার সামনে পৌঁছে গেছে ওরা। ঘুরে রানাকে জড়িয়ে ধরল রেমি। রানাও পাল্টা আলিঙ্গন করল ওকে। কয়েক মুহূর্ত স্থির রইল দু'জনে, তারপর রেমির কপালে চুমো খেয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। বলল, 'যাও, ঘুমাতে যাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কামরায় ঢুকে গেল রেমি। রানাও ফিরতি পথ ধরল। কিছুদূর যেতেই বেজে উঠল পকেটে রাখা সেলফোন। নাম্বার দেখল রানা—জর্জ রেডক্লিফ।

'হ্যালো, রানা,' কল রিসিভ করতেই বলে উঠলেন তিনি। 'একটা খবর দেবার জন্য ফোন করলাম। জিয়োলেবের ভিতরে লুকানো ট্রান্সমিটারের সিগনাল ডিকোড করতে পেরেছি আমরা।'

'গ্যারেট কোথায় বসে রিসিভ করছে সিগনাল, সেটা বের করতে পেরেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উঁহুঁ। কেসটা অন্যরকম। ল্যারি আমার সঙ্গে আছে, ওর কাছেই শোনো।'

দু' সেকেণ্ড পরেই ভেসে এল ল্যারি কিঙের কণ্ঠ। 'লোকটা কোনও রিসিভার ব্যবহার করছে না, রানা। ত্রিশ সেকেণ্ড পর পর জিপিএস লোকেশন ট্রান্সমিট করে ডিভাইসটা—সেটা রিসিভ করা হয় একটা রিমোট সার্ভারে। সেখান থেকে ইন্টারনেটের একটা ওয়েবসাইটে ভেসে ওঠে লোকেশন। দুনিয়ার যে-কোনও প্রান্ত থেকে ওটা দেখে নেয়া সম্ভব। সরি, গ্যারেটকে ট্র্যাক করবার কোনও উপায় নেই। লোকটা অতি চতুর।'

'ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটা আমাকে দিতে পারো?' বলল রানা। 'জিয়োলেবটা হাতছাড়া হয়ে গেছে আমাদের। ওটা কখন-কোথায় থাকবে, সেটা জানা দরকার আমার, যাতে উদ্ধার করতে পারি।'

'ঠিক আছে, আমি ইমেইলে অ্যাড্রেসটা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ, ল্যারি।'

'মি. রেডক্লিফের সঙ্গে কথা বলো।'

'দাও।'

'রানা,' বললেন রেডক্লিফ, 'তোমার ওই মায়া লরেঞ্জোর ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছি আমি। রেযাল্ট যা পেয়েছি, তা শুনে খুশি হবে না।'

'কেন, সমস্যা কোথায়?'

'কারণ ওর ব্যাপারে সমস্ত ডিটেইলস্ আমাকে পেতে হয়েছে ইন্টারপোলের ডেটাবেজ থেকে। ওদের ধারণা, মেয়েটা *ক্যামোরা*-র উঠতি নেত্রী। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ওদের ফাইলে বেশ কিছু ছবি দেখেছি—শত্রুদেরকে কতটা নির্মমভাবে ও খতম করে, তার প্রমাণ। গা শিউরে ওঠার মত ব্যাপার। ইতিপূর্বে কয়েকজনকে ইলেকট্রিকাল গ্রাইণ্ডার মেশিন দিয়ে কিমা বানিয়ে ফেলার রেকর্ড আছে ওর। তবে... ইটালিয়ান পুলিশ ওর বিপক্ষে কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁজে পায়নি।'

মুখের ভিতরটা তেতো ঠেকল রানার। মি. রেডক্লিফ ঠিকই বলেছেন—খবরটা পছন্দ হয়নি ওর। জিজ্ঞেস করল, 'ক্যামোরা মানে কি...'

'মাফিয়া,' বললেন রেডক্লিফ। 'সিসিলিতে যেটাকে কোসা নোস্ট্রা বলে, ওটাই নেপলসে ক্যামোরা। দুঃসংবাদ, রানা। ইটালিয়ান মাফিয়ার সঙ্গে গোলমালে জড়িয়ে গেছ তুমি।'

একত্রিশ

হাই-স্পিড ট্রেন *ইউরোস্টার*-এর বিজনেস প্রিমিয়ার ক্লাসের একটা আরামদায়ক সিটে বসে আছে মায়া লরেঞ্জো। ওর সামনে, পিছনে আর পাশের সিটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে তিনজন বডিগার্ড; সতর্ক দৃষ্টি রাখছে চারদিকে। একশো ছিয়াশি মাইল বেগে ছুটছে ট্রেন, জানালার পাশ দিয়ে শাঁই শাঁই করে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ছবির মত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। এ-মুহূর্তে ফ্রান্সের সীমান্ত এলাকা পাড়ি দিচ্ছে ট্রেনটা।

বাইরে মন নেই মায়ার, সামনের টেবিলের উপর রাখা জিয়োলেবের উপর দৃষ্টি আটকে আছে তার। জিনিসটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে। প্রাচীন ডিজাইনের এই অদ্ভুত ডিভাইসটা কৌতূহলী করে তুলেছে তাকে—বোঝার চেষ্টা করছে মাইডাসের সমাধি খোঁজার কাজে ওটা কীভাবে সাহায্য করতে পারে। এখনও কোনও মাথামুণ্ডু খুঁজে পায়নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিটে হেলান দিল মায়া। খামোকা মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যে-পদ্ধতিতে গোল্ডেন চেম্বারে পৌঁছুবার পরিকল্পনা করেছে সে, তার জন্য জিয়োলেবের কোনও প্রয়োজন নেই। রানাকে যদি পরে কখনও বাগে পাওয়া যায়, তখন নাহয় জেনে নেবে ওটা কীভাবে কাজ করে। এরপর ডিভাইসটা ঠাঁই পাবে তার সংগ্রহশালায়।

বিমানে চেপেই লণ্ডন থেকে মিউনিখে যেতে পারত মায়া,

কিন্তু যায়নি স্রেফ একটা শখ পূরণের জন্য—নতুন কেনা অত্যাধুনিক গাড়ি *ফেরারি-৪৫৮*-টা চালিয়ে দেখার শখ। ওটা কিনতে অবিশ্বাস্য অঙ্কের অর্থ খরচ করতে হয়েছে ওকে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ঠিকমত চালানো হয়নি—ইংল্যাণ্ডে সেটা সম্ভবও নয়। স্পেসিফিকেশন বলছে গাড়িটার টপ স্পিড ঘণ্টায় দুই শ' দুই মাইল, ওই গতিতে ইংল্যাণ্ডের কোনও রাস্তায় পুলিশ ড্রাইভ করতে দেবে না ওকে। টপ স্পিডে ফেরারিকে ছোটাবার মত রাস্তা রয়েছে স্রেফ একটা—জার্মানির *অটোবান...* দুনিয়ার একমাত্র ফ্রিওয়ে, যেখানে স্পিড লিমিটের কোনও বিধিনিষেধ নেই।

গাড়িটা গত রাতেই ব্রাসেলসে পাঠিয়ে দিয়েছে মায়া। রানা আর রেমিকে পালাতে দেয়ায় শাস্তি হিসেবে রবার্তোর কাঁধে জুটেছে কার্গো ডিউটিটা। এতক্ষণে গন্তব্যে পৌঁছে যাবার কথা ওর। স্টেশনে অপেক্ষা করবে মায়ার জন্য। ফেরারি চালিয়ে মিউনিখে যাবে মায়া, ভাড়া করা একটা বিএমডব্লিউ সেডানে ওকে অনুসরণ করবে রবার্তো আর ট্রেনে আসা তিন বডিগার্ড... মানে, যদি ওরা ওর গতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারে আর কী। এমনিতে সড়কপথে সাত ঘণ্টা লাগে ব্রাসেলস থেকে মিউনিখে পৌঁছুতে, তবে মায়া আশা করছে ওর শখের ফেরারি চার ঘণ্টায় দূরত্বটা অতিক্রম করতে পারবে।

সামনের একটা সিট থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকা এক ব্যবসায়ীর উপর দৃষ্টি পড়ল মায়ার। সুন্দরী মেয়ে দেখে সম্ভবত পাশে এসে আলাপ জমাতে চাইছে, কিন্তু বডিগার্ডদের কারণে সাহস পাচ্ছে না। ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি ফুটল মায়ার—পালোয়ান গোছের বডিগার্ড থাকবার এই এক সুবিধে। আজেবাজে লোক এসে উত্যক্ত করতে পারে না।

ব্যাপারটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল রানার কথা।

অস্বীকার করবার উপায় নেই, দুর্ধর্ষ বাঙালি যুবকটির প্রতি অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করছে সে। সুদর্শন, একরোখা, বুদ্ধিমান! এক সঙ্গে এতসব বৈশিষ্ট্য এর আগে কোনও পুরুষের মাঝে দেখেনি মায়া। ওর লাইনে এমন মানুষের দেখা পাওয়া দুষ্কর।

ছ'বছর হলো লরেঞ্জো পরিবারের মাথা হিসেবে কাজ করছে মায়া। নেপলসের ক্যামোরার নগণ্য সদস্য থেকে নিজের পরিবারকে তুলে এনেছে শীর্ষে। ব্যাপারটা মিরাকলই বলা চলে, কারণ ইটালিয়ান মাফিয়া শুরু থেকেই পুরুষশাসিত একটা জগৎ; ওখানে কোনও মেয়ে সহজে নেতৃত্ব পায় না। তাও আবার এত অল্প বয়সে। এর জন্য যথেষ্ট ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে হয়েছে মায়াকে, মুখোমুখি হতে হয়েছে বহু লোকের বিরোধিতার। কিন্তু কূটকৌশল খাটিয়ে, এবং বাছাই করা ক্ষেত্রে চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে সব সামাল দিয়েছে ও। প্রমাণ করে দিয়েছে, ক্যামোরা চালাবার মত যোগ্যতা ওর আছে।

কোনও পরিকল্পনা ছিল না মায়ার মাফিয়া-নেত্রী হবার। সবই ঘটে গেছে ভাগ্যচক্রে। অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল ওর, বিয়ের এক বছরের মাথায় প্রতিপক্ষ মাযোরেলা পরিবারের হাতে খুন হয়েছিল ওর স্বামী—কংক্রিট সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় রেষারেষির জের ধরে। রাগের মাথায় প্রতিশোধ নেবার সিদ্ধান্ত নেয় মায়া, মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে মাযোরেলা পরিবারের প্রতিটা সদস্যের। নিখুঁত ছক সাজিয়ে ওদের সবাইকে দুনিয়া-ছাড়া করে ও, কারও লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। আবেগের বশে করা এই কাজই ওকে তুলে আনে মাফিয়া জগতের পাদপ্রদীপে। নেপলসের অপরাধীরা বশ্যতা স্বীকার করে নেয় ওর। নতুন এই ক্ষমতা আর প্রতাপ উপভোগ করতে শুরু করে মায়া, হাল ধরে নেপলসের ক্যামোরার।

দ্বিতীয়বার বিয়েশাদী করবার ইচ্ছে আর হয়নি ওর। তার বদলে ঘনিষ্ঠ ও দূর-সম্পর্কের ভাই-বোনদের বিয়ের আয়োজন

করে ধীরে ধীরে পরিবার বড় করে নিয়েছে মায়া। তাদের রুটিরুজির ব্যবস্থা করে দিয়েছে, সুবিধা-অসুবিধার দিকে কড়া নজর রেখেছে। ফলে এখন এরা সবাই ওর বিশ্বস্ত, সামান্য ইশারাতেই প্রাণ উৎসর্গ করে দেবার জন্য প্রস্তুত। কৌশলে নিজের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে মায়া—আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে নিয়েছে আলবেনিয়া, লিবিয়া, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি-সহ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় কার্টেল-বসদের সঙ্গে। ফলে নির্বিঘ্নে ড্রাগস্ আর অবৈধ অস্ত্রের রমরমা ব্যবসা করে যেতে পারছে ও। একই সঙ্গে ভিএক্সএন ইণ্ডাস্ট্রিজ খুলে বৈধ ব্যবসায় নাম লিখিয়ে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সারিতেও যোগ দিয়েছে। ওর এই সাফল্যের ধারেকাছেও পৌঁছুতে পারেনি নেপলসের প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারগুলো। মায়ার দাপটে কোণঠাসা হয়ে রয়েছে তারা।

সম্প্রতি নতুন ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে মায়া। দৃশ্যপটে উদয় হয়েছে রাশান আর চাইনিজরা। প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারগুলোকে অস্ত্র আর লোক সরবরাহ করে চলেছে তারা। ফলে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে ওকে। খুব শীঘ্রি কিছু একটা করতে না পারলে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন থাকবে না আর। সে-কারণেই মাইডাসের সমাধিটা খুঁজে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে মায়া। অতুল সে ঐশ্বর্য হাতে এসে গেলে কেউ আর ধারেকাছে পৌঁছুতে পারবে না ওর। সত্যিকার অর্থেই মাফিয়ার শীর্ষ নেত্রীতে পরিণত হবে ও।

মিউনিখে সেই লক্ষ্যেই চলেছে মায়া। গ্রেইডেল প্রপার্টিজ অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান্স ডিয়েটজ্ ওর খাস লোক। তার মাধ্যমেই পিয়াৎজা কাভোর-এর সেই বিল্ডিংটা... যেটার তলায় লুকিয়ে আছে টানেল নেটওয়ার্কে ঢোকার প্রবেশপথ... কিনে নিচ্ছে সে, জনৈক জার্মান ক্রেতার ভুয়া পরিচয়ে। নইলে কুখ্যাত একজন মাফিয়া নেত্রীর কাছে সরকারি

বিল্ডিং বিক্রি করতে রাজি হতো না স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

ডিয়েটজ্ আরও একটা কাজ করবে ওর হয়ে। মাইডাস চেম্বার খুঁজে পাবার পর সমস্ত সোনা ও-ই বিক্রি করবে মায়ার পক্ষ থেকে। কাজটা সারতে হবে অত্যন্ত দ্রুত, নইলে খবর পেয়ে চেম্বারের দখল নিতে পারে ইটালিয়ান সরকার। হাজার হোক, ওটা জাতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ।

রানা, রেমি আর ববি মুরল্যাণ্ডের কথা ভাবল মায়া। অনুসন্ধানের কাজে ভাল একটা টিমই বেছে নিয়েছে গ্যারেট, কোনও সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে ওদের ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছে মায়া, জানতে পেরেছে রানা আর মুরল্যাণ্ডের পুরনো আর্কিয়োলজিকাল অ্যাচিভমেন্টের খবর। রেমি হ্যাডলিকেও হালকা করে দেখার কোনও সুযোগ নেই। অ্যাকাডেমিক সার্কেলে ওর যথেষ্ট সুনাম আছে। এদেরকে মাইডাস চেম্বারের ট্রেইল থেকে হটাতে না পারলে সমূহ বিপদ। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মায়া—খুন করবে ওদের, যাতে অকূল পাথারে পড়ে যায় গ্যারেট; সফল হতে না পারে।

ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের পুলিশ বাহিনীতে যথেষ্ট লোক আছে মায়ার। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে রানা, রেমি আর মুরল্যাণ্ডের ব্যাপারে চোখকান খোলা রাখতে। ওদের খোঁজ পাওয়ামাত্র মায়াকে খবর দেবে তারা। না পেলেও অসুবিধে নেই, টানেলের মুখ খোলা পর্যন্ত ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেই চলে। এরপর ওখানে মোতায়েন থাকবে ওর লোক, কেউ মাইডাস চেম্বারের খোঁজে ভিতরে তল্লাশি চালাতে পারবে না। আর গ্যারেটের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ... সেটা সোনা খুঁজে পাওয়ার পরেও নেয়া যাবে। হাতে যখন অঢেল টাকা চলে আসবে, তখন দুনিয়ার কোথাও গিয়ে রেহাই পাবে না ওর আমেরিকান ভাইটি। তার মাথার জন্য অবিশ্বাস্য অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করবে মায়া।

সন্তুষ্ট হয়ে চোখ মুদল ও। সাফল্য এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

জার্মানির ফ্রানয্ জোসেফ স্ট্রস এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল অডি সেডান, এ-৯২ অটোবান ধরে ছুটল মিউনিখের দিকে। রেন্টাল এজেন্সি থেকে গাড়িটা ভাড়া করেছে রানা। দু'ঘণ্টারও কম লেগেছে লণ্ডন থেকে জার্মানিতে পৌঁছুতে, ফলে মিউনিখে গিয়ে গ্রেইডেল প্রপার্টিজের হেডকোয়ার্টার এবং তার আশপাশের এলাকা স্কাউট করে নেবার জন্য যথেষ্ট সময় পাচ্ছে ওরা।

মুরল্যাণ্ড ড্রাইভ করছে, পাশের সিটে বসে আধবোজা চোখে বিশ্রাম নিচ্ছে রানা। পিছনের সিটে বসে একগাদা প্রিন্টআউট নিয়ে ব্যস্ত রেমি, মোমফলকের গায়ে খোদাই করা সঙ্কেতগুলোর ছবি তুলে প্রিন্ট করে নিয়েছে ও। জিয়োলেবটা খুইয়ে সতর্ক হয়ে গেছে রানা, মোমফলকটা সঙ্গে আনেনি, ওটা বিমানেই পাইলটদের জিম্মায় রেখে এসেছে। কাজ চালাবার জন্য ছবি তুলতে হয়েছে রেমিকে।

'হয়ে গেছে আমার,' খানিক পরে বলে উঠল ও।

'অনুবাদ করে ফেলেছ লেখাগুলো?' সোজা হয়ে বসল রানা।

'হ্যাঁ।' নিজের নোটবুকটা ওর হাতে তুলে দিল রেমি।

'অনুমান করতে দিন,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'নিশ্চয়ই নতুন আরেকটা আইটেম খুঁজবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওতে?'

'উঁহুঁ।' হাসল রেমি।

নোটবুক খুলল রানা। পড়তে শুরু করল:

'...রাজা হেরনের এক গুপ্তচরকে পাঠানো হয়েছিল মাটির তলা দিয়ে রোমানদের দুর্গে ঢোকার পথ খুঁজে বের করবার জন্য। তা করতে গিয়ে ভাগ্যক্রমে ও খোঁজ পেয়ে যায় রাজা

মাইডাসের সমাধির। ওর ভাষ্যমতে, সমাধিটা সম্পূর্ণ সোনায় মোড়া। প্রমাণস্বরূপ ওখানে রাখা একটা স্বর্ণমূর্তির হাত কেটে আনে সে। ওটা দেখে আমরা বুঝতে পারি, কাহিনিটা মিথ্যে নয়।

'সমাধিটা কিছুতেই রোমানদের হাতে পড়তে দেয়া যাবে না। তা হলে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে যাবে ওরা, জোগাতে পারবে যুদ্ধের খরচ। শাসন কায়েম করতে পারবে পুরো পৃথিবীর উপর। তাই তিনটি সূত্রের সাহায্যে ওই গুপ্তধন পর্যন্ত পৌঁছুবার নকশা লুকিয়ে রেখে যাচ্ছি আমি—এই মোমফলক, একটি পাণ্ডুলিপি আর পার্থেনন...'

'এটা আর্কিমিডিসের ভাষ্য?' বিস্মিত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'তারমানে মাইডাসের গুপ্তধনের কাহিনিটা সত্যি?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'রোমানদের হাত থেকে ওই গুপ্তধন বাঁচাবার জন্য ধাঁধাটা বানিয়ে রেখে গেছেন তিনি। একটা ব্যাপার শুধু বুঝতে পারছি না—নিজেই ওই গুপ্তধন উদ্ধার করলেন না কেন?'

'কারণ টানা দু'বছর রোমান নৌবাহিনী অবরোধ করে রেখেছিল গ্রিক নগরী সাইরাকিউজ, এখন যেটা সিসিলি নামে পরিচিত,' ব্যাখ্যা করল রেমি। 'ওখানেই থাকতেন আর্কিমিডিস। শহরটা শেষ পর্যন্ত দখল করে নেয় রোমানরা, তাদের হামলায় মারা পড়েন আর্কিমিডিস। নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, গুপ্তধন উদ্ধার করলেও সেগুলো সাইরাকিউজ থেকে বের করতে পারবেন না; সে-কারণেই সমাধিটা যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকতে দিয়েছেন। পার্থেননে কেন সূত্র লুকিয়ে রেখেছেন—সেটাও পরিষ্কার। সে-আমলে পার্থেনন ছিল গ্রিকদের সবচেয়ে সুরক্ষিত ঘাঁটি। ওটা দখল করবার কোনও উপায় ছিল না

রোমানদের।'

'বোঝা যাচ্ছে, রোমানরা ওই সোনা খুঁজে পায়নি,' বলল রানা। 'কারণ গ্যারেট আর মায়া চেম্বারটা অক্ষত অবস্থায় দেখেছে ছোটবেলায়। আর্কিমিডিসের সূত্র অনুসরণ করলে আমরাও ওখানে পৌঁছুতে পারব।'

'বাকিটা পড়ো,' বলল রেমি। 'আমি যতটা সম্ভব সহজ ভাষায় অনুবাদ করেছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার নোটবুকের দিকে দৃষ্টি ফেরাল রানা।

'...মেগারাইডের দ্বীপের জন্য হেরাক্লিসের আসন যা, পার্থেনোপ অ্যাক্রোপোলিসের জন্য আফ্রোদিতির পা-ও তা।

'শুরুতে সবগুলো ডায়াল উর্ধ্বমুখী করে রাখতে হবে। এরপর পার্থেননের দিকে মুখ করে জিয়োলেবকে এমনভাবে শোয়াতে হবে, যাতে নবগুলো ইমারতের পেডিমেণ্টের দিকে থাকে। সূর্যের ছায়া সানডায়ালের উপর পড়তে শুরু করলে বামদিকের নব ঘুরিয়ে কাঁটার ডগা হেরাক্লিসের আসনের দিকে নিয়ে আসতে হবে। উল্টোপাশের ডায়ালটা তখন মেগারাইডের দিকনির্দেশ করবে।

'জিয়োলেবকে আগের জায়গায় রেখে এবার ডানদিকে নব ঘোরাতে হবে। কাঁটার ডগা নিয়ে আসতে হবে আফ্রোদিতির পায়ের দিকে। এতে উল্টোপাশের ডায়ালটা আক্রোপোলিসের দিকনির্দেশ করবে।

'এভাবেই... দিকগুলোর সম্মিলনে পাওয়া যাবে ভূ-গর্ভস্থ গুহায় ঢোকার কুয়ো। কর্কটের চিহ্ন দেয়া ওই গুহার ভিতরে ঢোকার পরে জিয়োলেব তোমাকে পথ দেখাবে ।'

প্রথমে দুই সঙ্গীকে শোনাবার জন্য জোরে জোরে পড়ল রানা,

এরপর পড়ল নিঃশব্দে। কপালে ভাঁজ পড়ল ওর।

রেমি বলল, 'অনুবাদে কোনও ভুল করেছি কি না জানি না। এই অংশটা হেঁয়ালির মত মনে হয়েছে আমার কাছে।'

'হেঁয়ালি না,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'এক ধরনের ট্রায়াঙ্গুলেশন প্রসেসের বর্ণনা এটা। চারটে রেফারেন্স পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে, সেখান থেকে জিয়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট লোকেশনটা খুঁজে বের করতে হবে। কী বলো, রানা?'

'হ্যাঁ,' একমত হলো রানা। 'টানেল নেটওয়ার্কে ঢোকার প্রবেশপথ খুঁজে পাওয়া যাবে এই নির্দেশনা অনুসরণ করলে।'

'তা কী করে হয়?' ভুরু কোঁচকাল রেমি। 'পার্থেননে কীভাবে নেপলসের টানেলের ঢোকার প্রবেশপথ থাকে?'

'ব্যাপারটা তা নয়,' বলল রানা। 'ট্রায়াঙ্গুলেশন প্রসেসে দুটো ত্রিকোণ পাব আমরা। ওগুলো যেখানে পরস্পরকে ওভারল্যাপ করবে, সেখানে রয়েছে প্রবেশপথ। ক্যালকুলেশনটা নেপলসের ম্যাপের উপর বসাতে হবে।'

'ক্যালকুলেশনটাই আসল?'

'হ্যাঁ। এখানে হেরাক্লিসের আসন আর আফ্রোদিতির পায়ের কথা আছে। ওগুলো তো পার্থেননের পেডিমেণ্টে ছিল, তাই না? ওই দুটো রেফারেন্স পয়েন্ট। জিয়োলেবের সাহায্যে বাকি দুটো রেফারেন্স, মানে আক্রোপোলিস আর মেগারাইড খুঁজে বের করতে হবে।'

'মেগারাইডটা আবার কী জিনিস?' দ্বিধান্বিত গলায় জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড। 'শুনে তো মনে হচ্ছে কোনও থিম পার্কের রোলার কোস্টারের নাম।'

হাসল রেমি। 'উচ্চারণটা আসলে হবে মেইগারিডে। নামটা আগেও শুনেছি আমি। দাঁড়ান, ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখি।'

'নাম যা-ই হোক, ওটা খুঁজে পাওয়া সম্ভব বলে মনে হচ্ছে

না,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে পার্থেননের পেডিমেন্টের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ওটা তো এখন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে!'

'আমার মনে হয় না তাতে খুব একটা অসুবিধে হবে,' আশ্বাস দিল রানা। 'পেডিমেন্টটার অরিজিন্যাল লোকেশন... মানে হেরাক্লিস আর আফ্রোদিতির প্রতিকৃতিদুটো অতীতে কোথায় ছিল, সেটা জেনে নেয়া সম্ভব। দাঁড়াও, এখুনি ল্যারিকে মেসেজ দিচ্ছি—পার্থেননের অরিজিন্যাল স্কেম্যাটিক্সের একটা কপি যেন পাঠিয়ে দেয় আমাদের কাছে।'

'এই তো, পাওয়া গেছে মেইগারিডে,' ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে উল্লসিত গলায় বলল রেমি। 'নিয়াপোলিসের উপকূলের একটা দ্বীপ ছিল ওটা। এখন অবশ্য আর দ্বীপ বলা চলে না—পাথর দিয়ে সেতু বানিয়ে মেইনল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। নেপলসের দর্শনীয় স্থানগুলোর একটা এখন ওটা—কাসল ডেলোভো... দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি প্রাচীন দুর্গ।'

'কিন্তু দ্বিতীয় রেফারেন্স পয়েন্ট তো অ্যাক্রোপোলিস,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ট্রায়াঙ্গুলেশনের জন্য পয়েন্ট হিসেবে যদি নেপলস আর অ্যাথেন্সকে ব্যবহার করি আমরা, প্রবেশপথের লোকেশন তো অনেক দূরে সরে আসবে! নেপলসে কিছুতেই থাকবে না ওটা।'

'বুঝতে একটু ভুল হচ্ছে আপনার,' বলল রেমি। 'এখানে বলছে পার্থেনোপ অ্যাক্রোপোলিস। গ্রিক ভাষায় অ্যাক্রোপোলিস বলতে যে-কোনও শহরের সবচেয়ে উঁচু জায়গাকে বোঝায়। প্রাচীন পার্থেনোপ... মানে আজকের নেপলস্-এ... সবচেয়ে উঁচু জায়গায় রয়েছে আরেকটা দুর্গ—কাসল সান্তেলমো। পাহাড়ি একটা ব্লাফের উপর দাঁড়িয়ে আছে ওটা, ওখান থেকে পুরো শহর দেখা যায়। যে-দুটো দুর্গের কথা বললাম, আর্কিমিডিসের আমলে ওগুলোই ছিল নিয়াপোলিসের সবচেয়ে নামকরা দুই নিদর্শন।'

'কাজেই রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবেও আদর্শ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এখন আমাদেরকে জিয়োলেবের সাহায্যে বাকি দুটো পয়েন্ট খুঁজে বের করতে হবে। আর সেজন্যে যেতে হবে পার্থেননে। হুম... ভেরি স্মার্ট!'

'কীসের কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'আর্কিমিডিসের প্রশংসা করছি। অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। পার্থেননে ধাঁধার তৃতীয় অংশ লুকিয়ে রেখে গেছেন, যাতে বাকিদুটো হাতে পেলেও রোমানদের কোনও উপকার না হয়। পুরো গ্রিক সাম্রাজ্য ধ্বংস না করে কিছুতেই পার্থেননে পৌঁছুনো সম্ভব ছিল না ওদের পক্ষে। আর ওখানে না গেলে জিয়োলেব বা আর্কিমিডিসের পাণ্ডুলিপি কোনও কাজে আসবে না।'

'কুয়োর ব্যাপারটা কী?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'নিশ্চয়ই টানেলে ঢোকার প্রবেশপথ,' বলল রেমি। 'গ্যারেটও আমাদেরকে কুয়োর কথাই বলেছে। পুরো নেপলস্ জুড়েই আছে পুরনো আমলের অসংখ্য কুয়োমুখ। ওগুলো দিয়ে প্রাচীন অ্যাকোয়াডাক্ট সিস্টেমে সহজে ঢোকা যায়। রাজা হেরনের গুপ্তচর নিশ্চয়ই অমন কোনও কুয়ো দিয়ে ঢুকেছিল মাটির তলায়। বোধহয় ওটার গায়েই কর্কট, মানে কাঁকড়া-র ছবি এঁকে চিহ্ন দিয়ে রেখেছে। খোদাই করে এঁকে থাকলে ওই ছবি এখনও পাওয়া যাবে।'

'হুম, তারমানে কুয়োটার খোঁজ পাবার জন্য পার্থেননে যেতে হবে আমাদের। জিয়োলেবের সাহায্যে ট্রায়াঙ্গুলেশনের মাধ্যমে বের করতে হবে ওটার লোকেশন। শুনতে তো জটিল কিছু বলে মনে হচ্ছে না।'

'কিন্তু এই সহজ কাজটা করবার জন্য জিয়োলেবটা মায়ার হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে,' বলল রেমি। 'ওটাই চ্যালেঞ্জ।'

রানা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেছে। সেটা লক্ষ করে মুরল্যাণ্ড বলল,

'কী হলো? তুমি এমন গুম মেরে গেলে কেন?'

'আর্কিমিডিসের ধাঁধার সমাধান এত সহজ বলে মনে হচ্ছে না আমার কাছে,' বলল রানা। 'শুধু পার্থেননে গেলেই সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব, তা কী করে হয়? রোমানদের পক্ষে পার্থেননে পৌঁছুনো কঠিন ছিল মানি, কিন্তু ধাঁধার সমাধান তো ওরা কোনও গুপ্তচর পাঠিয়েও করে নিতে পারত। আর্কিমিডিসের মাথায় কি সেটা আসেনি?'

'কী বলতে চাও?'

'এখন পর্যন্ত যতটুকু সূত্র পেয়েছি, তাতে স্রেফ টানেল নেটওয়ার্কের প্রবেশপথের কথা আছে। কিন্তু তারপর? ওই গোলকধাঁধার ভিতরে কীভাবে এগোতে হবে, সে-সংক্রান্ত কোনও রেফারেন্স তো দেখছি না! তিনটে সূত্রের কথা বলেছেন আর্কিমিডিস। পার্থেননের পর তো আর কোনও সূত্র নেই।'

'ওখানে নিশ্চয়ই কোনও ম্যাপ লুকানো আছে। গেলেই জানা যাবে।'

'সেটা কতখানি বাস্তবসম্মত? ম্যাপ তৈরি করলে সেটা রোমানদের হাতে পড়বার সম্ভাবনা থেকেই যায়। আর্কিমিডিসের মত বুদ্ধিমান মানুষ কি অমন ঝুঁকি নেবেন?'

'ম্যাপ না থাকলে গোলকধাঁধার মত ওই টানেলের ভিতরে আমরা মাইডাস চেম্বার খুঁজে পাব কী করে?'

রেমির নোটবুকের দিকে চোখ ফেরাল রানা। বিড়বিড় করে পড়ল শেষ লাইনটা।

...গুহার ভিতরে ঢোকার পরে জিয়োলেব তোমাকে পথ দেখাবে।

একটাই অর্থ এর। আলাদা কোনও ম্যাপ নেই। জিয়োলেবটাই মাইডাসের চেম্বারের ম্যাপ। ওটাই সবকিছুর চাবিকাঠি!

বত্রিশ

বন্দিদশায় দু'দিন পেরিয়ে গেছে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের, কিন্তু এখনও তিনি অবিচল। মাথায় আজেবাজে চিন্তা জেঁকে বসতে দিচ্ছেন না, তার বদলে খাটিয়ে চলেছেন মগজটাকে। ইতিমধ্যে চোখের ইশারায় রানার কাছে স্ট্রনটিয়ামের খবর পাঠিয়েছেন তিনি, আশা করছেন মেসেজটা বুঝতে পেরেছে ও। এখন তিনি ভাবছেন শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি পাবার উপায় নিয়ে। চেষ্টা করছেন এদের সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্য জোগাড় করতে। লোকগুলোর সত্যিকার পরিচয় এবং উদ্দেশ্য আঁচ করা গেলে পরিকল্পনা সাজাতে সুবিধে হবে তাঁর।

ভিডিও-তে দেখাবার জন্য প্রতিদিন যে-পত্রিকাটা আনা হয়, সেটা তাঁকে পড়তে দেবার জন্য কাটনার এবং বেনসনকে রাজি করিয়েছেন অ্যাডমিরাল। পত্রিকা থেকে দেশের দৈনন্দিন ঘটনাবলী জানতে পারছেন তিনি, তবে অন্য কোনও উপকার হচ্ছে না। *ইউএসএ টুডে* একটি বহুল-প্রচারিত দৈনিক, আমেরিকার যে-কোনও জায়গায় ওটা কিনতে পাওয়া যায়। কাজেই পত্রিকা থেকে নিজের লোকেশন সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি অ্যাডমিরাল। একই কথা খাটে খাবারের বেলাতেও। সাধারণ স্যাণ্ডউইচ, বা হ্যামবার্গার খাওয়ানো হচ্ছে তাঁকে; সেই সঙ্গে ডায়েট কোক। এসবও সবখানে পাওয়া যায়। তাই বলে হাল ছাড়ছেন না অ্যাডমিরাল। অপেক্ষায় রয়েছেন সুযোগের।

দিনে মাত্র একবার প্রকোষ্ঠ থেকে বের করা হয় তাঁকে, ভিডিও করবার জন্য। তার আগে ফোকর দিয়ে ভিতরে ফেলা হয় হ্যাণ্ডকাফ, সেটা হাতে লাগানোর পর খোলা হয় দরজা। ওই সময়টাই কাজে লাগাতে হবে—এটা বেশ ভালমতই বুঝতে পারছেন হ্যামিলটন। ভিডিও করায় ব্যস্ত দুই গুণ্ডাকে ঘায়েল করে সটকে পড়তে হবে র‍্যাচেল নামের মেয়েটিকে নিয়ে। তার জন্য মোটামুটি একটা প্ল্যানও খাড়া করেছেন তিনি। চমৎকার কিছু না, তবে ভাগ্যের সহায়তা পেলে সফল হবার ভাল সম্ভাবনা আছে।

পালাবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো হ্যাণ্ডকাফ। হাতবাঁধা অবস্থায় লড়াই করা সম্ভব নয় গুণ্ডাদের সঙ্গে। এই সমস্যার একটা সমাধান বের করেছেন অ্যাডমিরাল—হ্যাণ্ডকাফ যেহেতু তিনিই আটকান, ওটা আলগা করে রাখা কোনও ব্যাপারই না। পরে ঝটকা দিলেই খুলে পড়ে যাবে। হ্যাণ্ডকাফ পরবার সময় শত্রুরা একটু অন্যমনস্ক থাকলেই কৌশলটা খাটাতে পারেন তিনি। কথা হলো কখন প্ল্যানটাকে কাজে পরিণত করবেন। গতকালই চেষ্টা করবেন বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হন। ভিডিও করবার সময় গতকাল তিনজন উপস্থিত ছিল। এতজনকে একাকী সামলানো সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। দু'জন থাকলে নাহয় ঝুঁকি নিতেন।

ওয়্যারহাউসের দরজা খুলে যাওয়ার আওয়াজ শুনে উঠে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। দরজার কাছে গিয়ে ফোকরের ঢাকনার ফাটল দিয়ে উঁকি দিলেন বাইরে। দ্বিতীয় ভ্যানটা ঢুকছে ভিতরে। গতকাল একটা পণ্যবাহী ট্রেইলার-ট্রাক নিয়ে এসেছে লোকগুলো, সেটার পাশে এসে থামল ভ্যান। রাতের ভিতর ট্রাকের রঙ পাল্টে ফেলা হয়েছে। ধূসরের বদলে এখন ওটা গাঢ় নীল। রক্তলাল হরফে ট্রেইলারের গায়ে বড় করে লেখা হয়েছে—উইলবিক্স কনস্ট্রাকশন। ওতে কী আছে, জানেন না অ্যাডমিরাল।

ট্রাকটা আসার পর থেকেই রেনফিল্ড নামের লোকটা কী নিয়ে যেন এক নাগাড়ে খেটে মরছে। দৃষ্টিসীমার আড়ালে থাকায় বোঝা যাচ্ছে না কাজটা কী। মাঝে মাঝেই শোনা যায় লোহা কাটার কর্কশ আওয়াজ, কিংবা দেখা যায় ওয়েল্ডিং টর্চের চোখ-ধাঁধানো আলো... কিন্তু এ-থেকে কাজের গতি-প্রকৃতি আঁচ করা সম্ভব নয়। এ-ব্যাপারে কোনও রকম আলোচনাও করে না রেনফিল্ড। দু'একবার তাকে দেখতে পেয়েছেন অ্যাডমিরাল—কোমরে ঝোলানো ওয়াকম্যান, আর কানে হেডফোন লাগিয়ে আপনমনে ঘুরে বেড়ায়। কাটনার বা বেনসনের সঙ্গে তার একেবারেই খাতির নেই। প্রয়োজনের বাইরে একটা কথাও বলে না।

ট্রাকের পাশে এসে থামল ভ্যান। দরজা খুলে গ্যারেট, কাটনার আর বেনসনকে নামতে দেখলেন অ্যাডমিরাল। পিছনের দরজা খোলা হলো এরপর। হাতবাঁধা দু'জন মানুষকে নামানো হলো। কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে রাখা হয়েছে তাদের। ভুরু কুঁচকে গেল অ্যাডমিরালের। নতুন হস্টেজ? এবার আবার কাদের ধরে আনল ওরা? জবাবটা পাওয়া গেল কয়েক সেকেণ্ড পরেই। মুখের উপর থেকে কালো কাপড় সরাতেই দেখা গেল অল্পবয়েসী দুজন তরুণের চেহারা। বিশ-বাইশের বেশি নয় বয়স। আতঙ্কে শুকিয়ে গেছে মুখ। গায়ের রঙ আর চেহারা বলে দিচ্ছে—এরা মধ্যপ্রাচ্যের মানুষ।

'কে তোমরা?' আরবী উচ্চারণে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল টি-শার্ট আর জিন্স পরা এক তরুণ। 'কেন আমাদেরকে ধরে এনেছ?'

'আমরা কিছু করিনি,' ফুঁপিয়ে উঠে তার সঙ্গে যোগ করল দ্বিতীয়জন—এর পরনে সাদা শার্ট আর স্ল্যাকস্। 'এ-দেশে আমরা বৈধভাবে এসেছি।'

'তা আমি জানি,' রুক্ষ গলায় বলল গ্যারেট। 'ভালমত

খোঁজখবর নিয়েই তোমাদেরকে বাছাই করা হয়েছে।'

'কীসের জন্য বাছাই?'

'যথাসময়ে সেটা জানতে পারবে। আর কথা নয়।' দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল গ্যারেট। 'নিয়ে যাও ওদের!'

অস্ত্রের মুখে ঠেলাধাক্কা দিয়ে দুই তরুণকে বন্দিশালার দিকে নিয়ে চলল বেনসন আর কাটনার। গ্যারেট এগোল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্রকোষ্ঠের দিকে। তাড়াতাড়ি বিছানায় গিয়ে আধশোয়া হয়ে পড়লেন অ্যাডমিরাল।

খানিক পরে খুলে গেল ফোকরের ঢাকনা। হাসিমুখে গ্যারেট বলল, 'হ্যালো, অ্যাডমিরাল!'

জবাব দিলেন না হ্যামিলটন। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

'বড্ড একগুঁয়ে মানুষ আপনি,' অভিযোগের সুরে বলল গ্যারেট। 'রানার সঙ্গে যথেষ্ট মিল দেখতে পাচ্ছি আপনার। বাই দ্য ওয়ে, আমাদের এখনও পরিচয় হয়নি। আমি অ্যান্থনি গ্যারেট... এই আউটফিটের লিডার।'

মুখ ঘোরালেন না হ্যামিলটন। শান্ত গলায় বললেন, 'নাম-ধাম যেহেতু বলে দিচ্ছ, ধরে নিচ্ছি আমাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও ইচ্ছে তোমার নেই। রানা সেটা জানে?'

'অযথা শঙ্কিত হচ্ছেন,' বলল গ্যারেট। 'আপনাকে খুন করবার কোনও ইচ্ছে আমার নেই... অন্তত রানা যতক্ষণ কথা শুনছে।'

আস্তে আস্তে ওর দিকে ফিরলেন হ্যামিলটন। বললেন, 'যদি ভেবে থাকো, আমাকে আটকে রেখে রানাকে দিয়ে যা-খুশি-তাই করিয়ে নিতে পারবে, তা হলে মস্ত ভুল করছ তুমি, মিস্টার।'

'ভুল আমি নই, আপনি করছেন। হি'জ আ সেন্টিমেন্টাল ফুল, অ্যাডমিরাল। আপনাকে বাঁচাবার জন্য এরই মধ্যে রানা আমার হয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে।'

'কিংবা হয়তো তোমার চোখে ধুলো দিচ্ছে... আসলে প্রস্তুতি নিচ্ছে তোমাকে ঘায়েল করবার।'

'তেমন কিছু করতে গেলে পস্তাবে। আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ ঘায়েল করতে পারেনি, অ্যাডমিরাল। না আইন, না প্রতিপক্ষ... কেউ না।'

'সবকিছুতেই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে। তোমার বেলায় সেটা প্রথম ও শেষবার হতে চলেছে। মাসুদ রানাকে তুমি চেনো না, গ্যারেট। ওকে ফাঁদে ফেলতে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছ তুমি। তোমাদের এই নোংরা পরিকল্পনা রানা ভণ্ডুল করে দেবে... আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি!'

অ্যাডমিরালের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন কান এড়াল না গ্যারেটের। বাঁকা সুরে বলল, 'হুম! অনেক কিছুই দেখে ফেলেছেন মনে হচ্ছে! আমাদেরকে নিছক কিডন্যাপার ভাবছেন না... তা হলে কী করছি আমরা, কিছু বুঝতে পারছেন?'

'ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটাতে চলেছ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে তোমাকে দেখে টেরোরিস্ট বলে মনে হয় না, নিশ্চয়ই টাকার লোভে করছ কাজটা।'

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল গ্যারেট। 'নাহ্, প্রশংসা না করে পারছি না। আপনি সত্যিই বুদ্ধিমান মানুষ। আপনার সঙ্গ সত্যিই মিস করব আমি। এনিওয়ে, ভিডিও করবার সময় হয়েছে। চলুন।'

ফোকরের সামনে থেকে সরে গেল সে। ওখানে উদয় হলো বেনসন। হ্যাণ্ডকাফ ছুঁড়ে দিল প্রকোষ্ঠের ভিতরে। ওটা কুড়িয়ে নিলেন অ্যাডমিরাল। আজও লোক বেশি, পালানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। কিন্তু যা করবার, তা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। গতকাল লোকগুলো সোমবারের কথা বলছিল... আজ শুক্রবার। আগামী দু'দিনের মধ্যে যদি তিনি পালাতে না পারেন, তা হলে আর কোনোদিনই পারবেন না।

তেত্রিশ

রাস্তার উল্টোপাশের ক্যাফেতে বসে গ্রেইডেল প্রপার্টিজ অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেন্টের হেডকোয়ার্টারের উপর নজর রাখছে মুরল্যাণ্ড। ম্যারিয়ানপ্লাৎজের উত্তরে অবস্থিত, আধুনিক নির্মাণশৈলীর এক অপূর্ব প্রদর্শনী এই ইমারত। মূল কাঠামো ইস্পাত ও কংক্রিটের হলেও দশতলা উঁচু বিল্ডিঙের বাইরের দিক পুরোপুরি কাঁচে মোড়া—ঠিক যেন একটা কাঁচের প্রাসাদ। এ-ছাড়া মাটির তলায় রয়েছে সাতটা লেভেল-বিশিষ্ট রোবোটিক পার্কিং গ্যারাজ। গ্যারাজের এণ্ট্রান্স দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে স্রেফ একটা প্ল্যাটফর্মে রাখতে হয় ড্রাইভারকে। এরপর ওটাকে নীচে নিয়ে যায় স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড সিস্টেম। রেখে দেয় ফাঁকা স্লটে। যথাসময়ে আবার বেরও করে আনে। গ্যারাজের এণ্ট্রান্সের পাশেই রয়েছে হেডকোয়ার্টারের কাঁচে ঘেরা লবি।

গ্রেইডেল বিল্ডিঙের ঠিক পাশেই রয়েছে আরেকটা নতুন বিল্ডিং। ওটার নীচতলায় রয়েছে অভিজাত গাড়ির একটা শো-রুম। ওখান দিয়ে যাবার সময় নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়ছে মানুষ, সাগ্রহে তাকাচ্ছে ভিতরে রাখা দামি গাড়িগুলোর দিকে, তারপর দীর্ঘশ্বাস। সবার পক্ষে ওসব গাড়ি কেনা সম্ভব নয়। এ-মুহূর্তে শো-রুমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্রাক, পিছনের র‍্যাম্প খুলে নামাচ্ছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের একটা আনকোরা নতুন *ল্যাম্বোর্গিনি গ্যালার্ডো* স্পোর্টস কার।

ঘড়ি দেখল মুরল্যাণ্ড। বিকেল চারটে বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। সামনে রাখা ল্যাপটপের স্ক্রিনে চোখ বোলাল এরপর। জিয়োলেবের ভিতরে লুকানো ট্র্যাকারের রিড-আউট দেখা যাচ্ছে ওয়েবসাইটে। ওদের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে মায়া। আশা করা যায় ঠিক সময়েই গ্রেইডেল হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুবে।

মুরল্যাণ্ডের মুখোমুখি, টেবিলের উল্টোপাশে বসে কফির মগে চুমুক দিচ্ছে রেমি। চোখাচোখি হতেই বলল, 'রানা এখন কী করছে কে জানে!'

'ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না,' আশ্বাস দিল মুরল্যাণ্ড। 'সুযোগ পেয়ে নির্ঘাত এক দফা ঘুমিয়ে নিচ্ছে।'

'প্ল্যানটায় কাজ হবে তো?' শঙ্কা প্রকাশ করল রেমি।

'আলবত হবে! মায়া যদি ওর গাড়িতে জিয়োলেবটা রেখে যায়, পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে আসবে রানা। দেখবেন, কোনও ঝামেলা হবে না।'

'আর যদি জিনিসটা সঙ্গে নিয়ে যায়?'

'নেবার তো কোনও কারণ দেখছি না। গ্রেইডেল হেডকোয়ার্টারে ওটা ওর কোনও কাজে আসবে না। তারপরেও... ওটা গাড়ি থেকে বের করে নিলে জিপিএস থেকে জানতে পারব আমরা। ওসব নিয়ে একদম মাথা ঘামাবেন না। আপনি রেডি তো?'

'হ্যাঁ। মায়া আমাকে দেখে না ফেললেই হয়।'

'তেমন কোনও ভয় নেই। ও বিল্ডিঙে ঢুকে যাবার পর আপনি যাবেন।'

পুরো পরিকল্পনার একমাত্র দুর্বলতা হলো গ্যারাজের ভিতরে বসানো সিকিউরিটি ক্যামেরা। বিল্ডিঙের লবিতে বসে একজন গার্ড মনিটর করে সেই ক্যামেরার ফিড। মায়ার গাড়ি থেকে

জিয়োলেব সরিয়ে নেবে রানা, কিন্তু সেটা ধরা পড়ে যাবে গার্ডের চোখে। এই সমস্যা দূর করবার দায়িত্ব পেয়েছে রেমি। রানা যখন জিয়োল্লেবটা চুরি করবে, তখন আলাপ জমিয়ে গার্ডকে ব্যস্ত রাখবে ও। ভাল জার্মান বলতে পারে রেমি, সেইসঙ্গে অপূর্ব সুন্দরী... কাজটা ওর জন্য কঠিন কিছু নয়। তারপরেও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না মুরল্যাণ্ড। সন্দিহান চোখে তাকিয়ে আছে রেমির পোশাকের দিকে। ফুলপ্যান্ট আর ফুলহাতা ব্লাউজ পরেছে মেয়েটা, বোতাম আটকে রেখেছে একেবারে গলা পর্যন্ত। এমন ভদ্র সাজসজ্জা দেখে গার্ড ওর প্রতি আকৃষ্ট না-ও হতে পারে। কথাটা এরই মধ্যে রেমিকে জানিয়েছে সে, কিন্তু মেয়েটা তাতে কান দেয়নি।

'ওভাবে তাকাবেন না তো!' মুরল্যাণ্ডের দৃষ্টি লক্ষ করে বিরক্ত গলায় বলল রেমি। 'আমার পোশাক ঠিকই আছে।'

'আমার আইডিয়াটা কাজে লাগালে কিন্তু ভাল করতেন।'

'বুকের অর্ধেকটা বের করে রাখার আইডিয়া? নো, থ্যাঙ্কস্। অর্ধনগ্ন না হয়েও কাজটা সারতে পারব আমি।'

'তা হলে তো ভালই।'

'আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হবে কীভাবে?'

'সেলফোন হাতে রাখবেন। জিয়োলেবটা রানা হাতে পেলেই এসএমএস করব আপনাকে।'

'ঠিক আছে,' দ্রুত কফি শেষ করল রেমি। বুকের ভিতর অনুভব করল উত্তেজনা। 'এ-ধরনের সিচুয়েশন আগেও ট্যাকেল করেছেন আপনারা?'

'বহুবার।' বাইরে চোখ রেখে স্থির হয়ে গেল মুরল্যাণ্ড। 'ওই তো, এসে পড়েছে।'

মোড় ঘুরে দৃষ্টিসীমায় উদয় হয়েছে চকচকে একটা ফেরারি। ওটার ঠিক পিছনে রয়েছে আরেকটা বিএমডব্লিউ সেডান।

গ্রেইডেল হেডকোয়ার্টারের সামনে পৌঁছে গতি কমাল গাড়িদুটো, মুখ ঘুরিয়ে ঢুকে পড়ল গ্যারাজের এণ্ট্রান্স দিয়ে। দু'মিনিট পরেই কাঁচঘেরা লবিতে মায়া লরেঞ্জোকে দেখতে পেল ওরা। সঙ্গে তিনজন বডিগার্ড। ওদেরকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল গার্ড। গটমট করে এলিভেটরে ঢুকে পড়ল মায়া ও তার সঙ্গীরা।

ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে চোখ ফেরাল মুরল্যাণ্ড। জিপিএস ট্র্যাকার কোনও পজিশন দেখাচ্ছে না। আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যাওয়ায় কংক্রিটের মেঝেতে বাধা পাচ্ছে ওটার সিগনাল। মায়া যদি ওটা সঙ্গে নিয়ে ওপরতলায় উঠত, এমনটা ঘটত না।

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে,' খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে রেমিকে বলল ও। 'এবার আপনি যেতে পারেন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল রেমি। ক্যাফে থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরুল। ঢুকে পড়ল গ্রেইডেলের লবিতে। গার্ডের সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখল মুরল্যাণ্ড। সন্তুষ্ট হয়ে বের করল সেলফোন। রিং করল রানাকে। জিপিএস ট্র্যাকারের চেয়ে সেলফোনের সিগনাল শক্তিশালী, সহজেই ভেদ করতে পারছে গ্যারাজের কংক্রিটের মেঝে।

একবার রিং হতেই রানার কণ্ঠ শুনতে পেল মুরল্যাণ্ড।

'হ্যালো?'

'জেগে আছ? কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'খুব একটা না। কোনও খবর আছে?'

'হ্যাঁ। এসে গেছে মায়া। হেডকোয়ার্টারে ঢুকে পড়েছে। জিয়োলেবটা গ্যারাজে। রেমি গার্ডকে ব্যস্ত রাখছে, কাজেই এবার কাজে নামতে পারো।'

'ঠিক আছে। গাড়িটা কেমন?'

'গাড়ি আসলে একটা না, দুটো। মায়া এসেছে একটা

ফেরারি-তে। বডিগার্ডরা এনেছে আরেকটা বিএমডব্লিউ এম-ফাইভ।'

'হুম। ফেরারিতে ট্রাঙ্ক নেই। জিয়োলেবটা বিএমডব্লিউ-তে থাকবে। অসুবিধে নেই, দরকার হলে দুটোই তল্লাশি করব। লাইসেন্স নাম্বার বলো।'

নাম্বারদুটো দেখে নিয়েছিল মুরল্যাণ্ড, রানাকে জানিয়ে দিল।

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি,' বলল রানা। 'কাজ শেষে রিং করব তোমাকে।'

লাইন কেটে দিল ও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারে হেলান দিল মুরল্যাণ্ড। আপাতত অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই। গোলমাল দেখা না দিলেই হয়!

ভাড়া করা গাড়িটার ট্রাঙ্কে লুকিয়ে আছে রানা। সেলফোন পকেটে ঢুকিয়ে সাবধানে ডালা খুলল। তাকাল বাইরে। গাড়ির পিছনটা দেয়ালের সঙ্গে প্রায় লেগে আছে—মাত্র এক ফুট জায়গা পাচ্ছে ও নামবার জন্য। কসরত করে ওখানেই নামতে হলো ওকে। এতক্ষণ পা ভাঁজ করে শুয়ে থাকতে হয়েছে, সোজা হতেই টনটন করে উঠল দুই হাঁটু। ঠোঁট কামড়ে ব্যথাটা সহ্য করে চারপাশে নজর বোলাল ও। মাথায় পরল একটা জকি ক্যাপ—কার্নিশের কারণে ক্যামেরায় এখন আর ওর চেহারা দেখা যাবে না।

গ্যারাজ অন্ধকার হতে পারে ভেবে একটা ফ্ল্যাশলাইট এনেছে রানা, তবে তার কোনও প্রয়োজন পড়ল না। সাততলা স্ট্রাকচারটা উজ্জ্বলভাবে আলোকিত—সম্ভবত সিকিউরিটি ক্যামেরায় ছবি তোলার সুবিধার্থেই। ফ্ল্যাশলাইট আর জ্বালল না রানা, গুঁজে রাখল কোমরের বেল্টে।

রোবোটিক পার্কিং গ্যারাজের সবকিছুই অটোমেটেড। মূল

বিল্ডিঙের গ্রাউণ্ড ফ্লোরে দুটো প্ল্যাটফর্ম রয়েছে—ওগুলোর উপর গাড়ি রাখলেই ড্রাইভারের দায়িত্ব শেষ। অটোমেটিক কাউন্টার থেকে পার্কিং টিকেট সংগ্রহ করামাত্র গাড়ি-সহ প্ল্যাটফর্ম নেমে আসে ভূগর্ভস্থ স্ট্রাকচারে। কাঠামোটা সিলিণ্ডারের মত। চারপাশের দেয়ালে রয়েছে গাড়ি রাখার উপযোগী অসংখ্য খোপ। মাঝখানের ফাঁকা জায়গা ধরে নেমে আসে প্ল্যাটফর্ম, ফাঁকা খোপ বাছাই করে সেখানে ঢুকিয়ে রাখে গাড়িকে। গ্যারাজের সাতটা লেভেলের মেঝে কংক্রিটের তৈরি, তবে খোপের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে গার্ডার বা শেকল দিয়ে। ওগুলো টপকে এক খোপ থেকে অন্য খোপে সহজেই যাওয়া সম্ভব।

গাড়ির সামনে চলে গেল রানা, খোপের সামনের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল। ছ'নম্বর লেভেলে পার্ক করা হয়েছে ওর অডি। বিএমডব্লিউ আর ফেরারিটা কোথায় কে জানে। চঞ্চল দৃষ্টি বোলাল দৃশ্যমান সমস্ত গাড়ির উপর। আর তখুনি সামনে দিয়ে নেমে এল ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম। পাশের একটা গাড়ির সামনে গিয়ে থামল। খোপের পিছন দিকটা হাইড্রলিক মোটরের সাহায্যে একটু উঁচু হয়ে গেল, পিছলে প্ল্যাটফর্মের উপর চলে গেল গাড়িটা। ওটাকে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম আবার উঠে গেল উপরে।

তিন মিনিটের মাথায় কাঙ্ক্ষিত গাড়িদুটোর খোঁজ পেল রানা। মুরল্যাণ্ডের দেয়া লাইসেন্স নম্বর মিলে গেছে। ওর এক লেভেল নীচে রয়েছে বিএমডব্লিউ—উল্টোপাশে। ফেরারিটা রয়েছে একেবারে নীচের লেভেলে, চকচক করছে ওটার রক্তলাল শরীর।

লণ্ডনের এস্টেটে বডিগার্ড রবার্তোকে নির্দেশ দিয়েছিল মায়া—জিয়োলেবটা গাড়ির ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে রাখতে। কিন্তু ফেরারি-তে ট্রাঙ্ক নেই, হুডের তলায় রয়েছে স্রেফ একটা ছোট্ট স্টোরেজ স্পেস। ওখানে জিয়োলেব রাখা সম্ভব, তারপরও রানা অনুমান করল—ট্রাঙ্কের কথা যখন বলেছে মায়া, ওটা

বিএমডব্লিউতে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। তাই ওটাই প্রথমে তল্লাশি করবার সিদ্ধান্ত নিল। না পেলে ফেরারির ভিতর খোঁজা যাবে।

বিএমডব্লিউ-র কাছে পৌঁছুনোর জন্য মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা পেরুতে হবে ওকে। চওড়ায় ওটা বিশ ফুট, লাফ দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয়। তবে মেইনটেন্যান্স ওঅর্কের জন্য গ্যারাজের দু'পাশে অ্যাক্সেস ল্যাডার আর সরু ওয়াকওয়ে আছে। কাছাকাছি একটা ক্যাটওয়াক দেখতে পাচ্ছে রানা, খোপের সীমানা টপকে রওনা হলো ওদিকে। লবির গার্ডকে রেমি ব্যস্ত রাখতে পারছে কি না ভেবে শঙ্কিত হলো। আশপাশে আড়াল বলতে কিছু নেই, লোকটা কোনও কারণে মনিটরের দিকে তাকালেই দেখতে পাবে ওকে। টুপির কার্নিশ আরেকটু নামিয়ে দিল রানা—অন্তত চেহারাটা যেন ক্যামেরায় ধরা না পড়ে।

ক্যাটওয়াক পেরিয়ে অ্যাক্সেস ল্যাডারে পৌঁছুতে লাগল দু'মিনিট। মই বেয়ে আর মাত্র ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে পাঁচ নম্বর লেভেলে নেমে এল রানা। একের পর এক খোপ পেরিয়ে পৌঁছে গেল বিএমডব্লিউ-র পাশে। গাড়ির সবগুলো কাঁচ টিন্টেড—ভিতরে কী আছে না আছে, দেখা গেল না। তার কোনও প্রয়োজনও অবশ্য নেই। জিয়োলেবটা ট্রাঙ্কে থাকার কথা, ওদিকেই মনোযোগ দিল।

অডি-র মত বিএমডব্লিউ-র পিছনটাও একেবারে দেয়াল ঘেঁষে রয়েছে। এ-অবস্থায় ট্রাঙ্কের তালা ভাঙা মুশকিল। তাই গাড়ির দরজা খুলবে বলে ঠিক করল ও। স্টিয়ারিং হুইলের ড্যাশবোর্ডের তলায় ট্রাঙ্ক খোলার লিভার থাকে, ওটা ব্যবহার করবে। ফ্ল্যাশলাইটটা গাড়ির ছাতের উপর রেখে ড্রাইভারের দরজার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। কোটের পকেট থেকে বের করল লক-পিকিং ইকুইপমেন্টের পাউচ। সূক্ষ্ম দুটো পিক বের করে

ঢুকিয়ে দিল কি-হোলে, কয়েক সেকেণ্ড পরেই মৃদু আওয়াজ করে খুলে গেল তালা।

সন্তুষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। হ্যাণ্ডেল ধরে টান দিতেই খুলে গেল দরজা। নিচু হয়ে গাড়ির ভিতরে শরীরের ঊর্ধ্বাংশ ঢোকাল ও, এক হাতে হাতড়াতে শুরু করল ড্যাশবোর্ডের তলা। লিভারটা পেয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের ভিতর। ওটায় চাপ দিতেই ঘটাং করে খুলে গেল ট্রাঙ্কের ডালা। আর তখুনি ঘাড়ের খাটো চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল ওর। বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠল মাথার ভিতর।

গাড়িতে ও একা নয়!

আড়চোখে পিছনের সিটে একটা ছায়ামূর্তিকে নড়ে উঠতে দেখল রানা। কোনোকিছু করবার সুযোগ পেল না, তার আগে খুলির একপাশ স্পর্শ করল পিস্তলের হিমশীতল নল। জমিয়ে দিল ওকে।

'হ্যালো, সেনিয়র রানা!' কানের পাশে গমগম করে উঠল মায়ার বডিগার্ড রবার্তোর হাসিহাসি কণ্ঠ।

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

ট্রেজার হান্টার

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

এ যেন অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা!
গ্রিক পণ্ডিত আর্কিমিডিসের তৈরি করা যে-ধাঁধা
দু'হাজার বছরেও ভেদ করতে পারেনি কেউ,
সেটাই সমাধান করতে চাইছে রানা মাত্র চারদিনে!
নইলে খুন করা হবে পিতৃসম অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে।
পাগলের মত চষে বেড়াচ্ছে ও দু-দুটো মহাদেশ।
পাঠক, চলুন ওর সঙ্গে ঘোড়া ছোটাই ইংল্যাণ্ডের প্রান্তরে;
চুরি করি গ্রিসের জাতীয় জাদুঘরের অমূল্য সম্পদ;
দুইশ' মাইল বেগে গাড়ি চালাই জার্মানির ফ্রিওয়ে-তে;
অথবা হারিয়ে যাই ইটালির ভূগর্ভস্থ প্রাচীন সুড়ঙ্গে,
কিংবা আমেরিকার রাস্তায় জড়িয়ে পড়ি মরণপণ সংঘর্ষে।
নিষ্ঠুর দুই শত্রু পিছু নেবে আপনার।
পদে পদে থাকবে মৃত্যুর হাতছানি।
কিন্তু ভয়ের কিছু নেই, রানা পাশে রয়েছে আপনার।
সমস্ত বাধা-বিপত্তি ঠেলে ওর সঙ্গে একসময় ঠিকই পৌঁছুবেন
আপনি রাজা মাইডাসের সেই সোনার সমাধিতে।
লোভ হচ্ছে? তা হলে চলুন, রওনা হই!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

ট্রেজার হাণ্টার

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

পাঠক, গ্রিক উপকথার মাইডাস টাচের গল্প জানেন তো?
স্বর্ণলোভী রাজা মাইডাসকে অদ্ভুত এক বর দিয়েছিলেন দেবতারা—
শুধু স্পর্শ দিয়ে যে-কোনও জিনিসকে সোনায় রূপান্তরিত
করতে পারতেন তিনি। সেটা তাঁর জন্য হয়ে দাঁড়ায় অভিশাপ।
ভুল করে নিজের মেয়েকে সোনার মূর্তি বানিয়ে ফেলেন তিনি।
করুণ... সেইসঙ্গে সুন্দর এক কাহিনি, তাই না?
কিন্তু গল্পটা যদি গল্প না হয়? যদি ওটা সত্যি হয়ে থাকে?
এত বছর পর পাগলাটে কোনও ভিলেন যদি সেই ক্ষমতার
অধিকারী হতে চায়... খুঁজে পেতে চায় রাজা মাইডাসের সমাধি...
এবং মাসুদ রানাকে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাধ্য করতে চায়
সেই কাজ করে দিতে? কী ঘটবে তা হলে?

না, পাঠক, কল্পনার সাগরে ভেসে যাবার কোনও দরকার নেই।
এই বইয়ের ভিতরেই রয়েছে সমস্ত প্রশ্নের জবাব।
সেই সঙ্গে রয়েছে পাতায় পাতায় দমবন্ধ করা উত্তেজনা,
রক্ত গরম করা অ্যাকশন আর বুদ্ধির মারপ্যাঁচ-সহ অনেক কিছু।
তা হলে আর দেরি কেন, চলুন রানার সঙ্গে যোগ দিই
শ্বাসরুদ্ধকর আরেকটি অভিযানে। কথা দিচ্ছি, হতাশ হবেন না।

সেবা প্রকাশনী
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET